প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান

پروگان چار جائے ایران

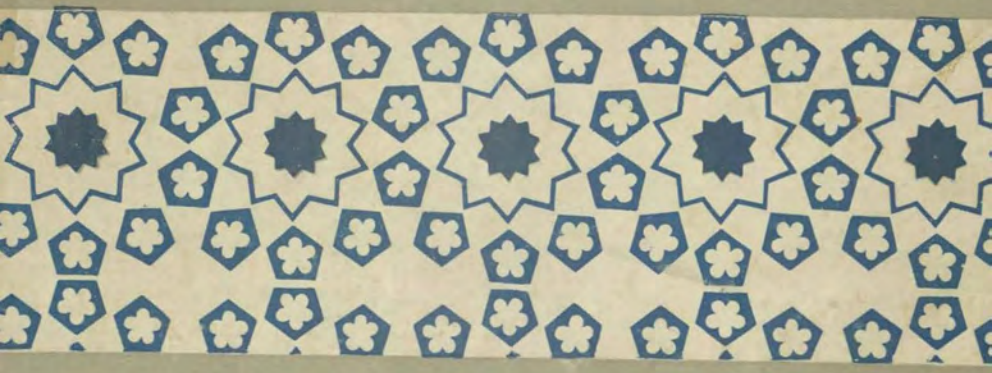

ড: মুহম্মদ ইক্‌বাল

LIBRARY
Book No. 852
KARACHI

প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান

[The Development of Metaphysics in Persia]

ডঃ মুহম্মদ ইক্‌বাল

অনুবাদক

কামালউদ্দীন খান

পূর্ব-পাকিস্তান ইক্‌বাল একাডেমী

ঢাকা

প্রকাশক
পূর্ব-পাকিস্তান ইক্‌বাল একাডেমী
৫নং পুরানা পল্টন, ঢাকা ২

Publisher
East Pak. Iqbal (A...)
5, Purana Paltan
Dacca-2

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৭২

Year of publn.
1372 = 1965

মুদ্রাকর
মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
সওগাত প্রেস
৬৬, লয়াল ষ্ট্রীট ,ঢাকা-১

Printed by
Mohd Nasiruddin
Saogat Press
66 Loyall Street
Dacca 1

মূল্য ঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

Price: Rs. 3.50/-

অনুবাদ প্রসঙ্গে

ইক্‌বালের বিশিষ্ট রচনা The Development of Metaphysics in Persia—A Contribution to the History of Muslim Philosophy – বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করা সম্ভব হলো কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ইক্‌বাল একাডেমীর অক্লান্ত কর্মী জনাব মিজানুর রহমান সাহেবের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে। এ ধরণের একটী বই বাংলায় অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। স্বভাবতঃ ভাষা অনেকখানি গুরুগম্ভীর হয়ে পড়েছে। অনেক শব্দ বানিয়ে নিতে হয়েছে। অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে ভাবধারাটী যথাযথভাবে প্রকাশ করবার।

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্‌লামী ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক ডঃ মুঈনুদ্দীন আহ্‌মদ খান অনুবাদটীর পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন। তাঁর কাছে অনুবাদক সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

অনেক ছাপার ভুল রয়ে গেছে। এ গুলোর কয়েকটী চোখে বেশ্‌ বিসদৃশ দেখালেও আশা করি পাঠকের জন্যে বক্তব্যটী ধরে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌ পরবর্তী মুস্‌লিম দার্শনিকদের হাতে নবতর রূপ নিয়ে অনেকখানি বিকাশ লাভ করেছিল। সে বর্ণনা বইটীতে রয়েছে। এ সূত্রে পাঠক সাধারণের স্বাভাবিক কৌতূহল নিবারণার্থে পরিশিষ্টে একটী সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য রচনা সন্নিবেশ করা হলো।

Discussion

প্রসঙ্গ কথা—

এ বইটি ইকবালের দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ; অতএব কিছুখানি অপক্কতা দোষের লক্ষণ এতে রয়েছে। কিন্তু যে পর্যন্ত অন্য কোনো উৎকৃষ্টতর লেখার অভ্যুদয় না ঘটে, সে পর্যন্ত প্রাচ্যের জ্ঞানচর্চা ক্ষেত্রে এর স্থান থেকে যাবে। এ বই লিখবার সময় ইকবাল সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু কয়েক বছর পরে তিনি সে মতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। এই কারণেই তিনি বইয়ের ভূমিকায় ইবনুল্ আরবীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। অন্যদিকে, সমগ্র বইয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ গুরু জালালুদ্দীন রূমীর উল্লেখ নেই বললেই চলে এবং অন্যান্য দার্শনিকদের চেয়ে তিনি সর্বেশ্বরত্বপ্রবণ সুফীতত্ত্ববাদীদের নিয়েই অত্যধিক সময় ব্যয় করেছেন। আল্ ফারাবী, ইব্নে মস্কাওয়াইহ্ এবং ইবনে সীনা সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি প্রায়শঃই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্দের মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। দর্শন চর্চায় এঁদের সুবিশাল মৌলিক দান সম্পর্কে এবং নিও-প্লেটনিস্ম্ থেকে এঁদের ভিন্ন পথ অবলম্বন ব্যাপারে তাঁর স্বীকৃতি কুণ্ঠান্বিত। তিনি পর জীবনে যদি বইটী সংশোধন করে যেতেন তবে নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে এ-র অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হতো।

যা হোক, এখন এ বইটি ইরানের দার্শনিক চিন্তাধারার সর্বপ্রথম ও একমাত্র ঐতিহাসিক দলীল এবং আরও অনেক কিছুর সাথে এ পথেও ইকবালই আমাদের অগ্রণী। তিনি ইরানের আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ—দুইই বিশেষ কৃতকার্যতার সাথে বিচার করেছেন। তাঁর শক্তিমান বিশ্লেষণে সুফীতত্ত্বের অভ্যুদয় সূচক অবস্থাবলী সম্পর্কে পূর্বেকার পণ্ডিতদের অনেক মতবাদ খণ্ডিত হয়েছে। এ শ্রেণীর একটি বই লিখতে লেখকের অন্ততঃপক্ষে প্রাচ্যের দুই প্রখ্যাত ভাষা আরবী ও ফারসী, ইউরোপীয় এক বা একাধিক ভাষা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাসে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়া চাই। ইকবালের এ সব গুণ পুরোপুরি ছিল। এ কারণে এ

কর্তব্য তিনি যথাযথরূপে পালন করতে পেরেছেন। রচনাটির অন্য একটি মূল্যবান দিক্ এই যে, স্বয়ং ইকবালের মনোবিকাশের ধারা যাঁরা লক্ষ্য করতে চান, তাঁদের জন্যেও পহেলা সবক এতে রয়েছে। এ দিক থেকেও এ বইয়ের বর্তমান প্রকাশকদের উদ্যম গুরুত্বপূর্ণ।

এম্. এম্. শরীফ

M. M. Sharif

সূচী

ভূমিকা ... ... ক—ঘ

প্রথম খণ্ড ঃ প্রাক্-ইস্‌লামী ইরানীয় দর্শন

প্রথম অধ্যায়—ইরানীয় দ্বৈতবাদ—যোরো'ষ্টার ১

মানী ও ময্‌দক ৭

পশ্চাৎ দৃষ্টি ১১

পাদটিকাবলী ১২

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ গ্রীক্ দ্বিত্ববাদ—

দ্বিতীয় অধ্যায়—ইরানের নিও প্লেটনীয় আরম্ভপন্থীগণ ... ১৮

ইব্‌নে মস্‌কাওয়াইহ্ ২১

ইব্‌নে সীনা ২৯

পাদটিকাবলী ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়—ইস্‌লামে যুক্তিবাদের উত্থান ও পতন—

যুক্তিবাদের দার্শনিক ভিত্তি ৩৫

সমকালীন চিন্তাধারার গতি প্রকৃতি ... ৪১

যুক্তিবাদ বিরোধী প্রতিক্রিয়া—

আশ্‌আরী পন্থীগণ ৪৮

পাদটিকাবলী ৫৯

চতুর্থ অধ্যায়—আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের বিতর্ক ... ৬৪

নিগূঢ় সত্তার প্রকৃতি ৬৪

জ্ঞানের প্রকৃতি ৭০

অনস্তিত্বের প্রকৃতি ৭১

পাদটিকাবলী ৭৩

পঞ্চম অধ্যায়—সূফী দর্শন—সূফী দর্শনের অভ্যুদয়
ও কুর্‌আন সমর্থিত রূপ ৭৪
সূফী প্রজ্ঞানের বিভিন্ন দিক্ ... ৮৪
সত্যের আত্ম-সচেতন ইচ্ছা রূপ ... ৮৫
সত্যের আলোক বা মনন্‌রূপ ... ৯০
সত্যের আলোক রূপ—আল্ ইশ্‌রাকী—
ইরানীয় দ্বিত্ববাদে প্রত্যাবর্তন ... ৯১
মনস্তত্ত্ব ১০৩
সত্যের চিন্তারূপ—আল্‌জি'লী ... ১১১
পাদটিকাবলী ১২৬
ষষ্ঠ অধ্যায়—পরবর্তী ইরনীয় চিন্তাধারা ১২৯
পাদটিকাবলী ১৪০
উপসংহার ... ১৪১
পরিভাষা-সংকেত (Glossary) ১৪৪
পরিশিষ্ট—নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌ ১৫১
শব্দ সংকেত (Index) ১৫৯

———

Preface

ভূমিকা

ইরানবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাদের প্রজ্ঞান চিন্তা প্রবণতা। কিন্তু আজকের দর্শনের ছাত্রেরা যদি কপিল বা কা'ণ্ট এর বেলায় যেমন সম্ভব তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুসজ্জিত দার্শনিক প্রথার খোঁজ এ-ক্ষেত্রে করতে যান, তবে তাঁদেরকে বিফল মনোরথ হতে হবে। ইরানীয় দর্শন সম্পর্কীয় সে সব পুরোনো পুঁথি-পুস্তকের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে, তাতে বুদ্ধির দীপ্তি বা চিন্তার নৈপুণ্যের পরিচয় যতই থাকুক না কেন, তা নিয়ে কোনো সামগ্রিক দর্শন পদ্ধতি গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য। আমার মনে হয় ইরানীদের মন ধৈর্যের সাথে পা বাড়াতে অনভ্যস্ত। সে জন্যে পরিদৃষ্ট জগতের ঘটনাবলীকে কতকগুলি মৌলিক নীতির আওতায় এনে এবং যথাযথ সাজিয়ে, সে পশ্চাৎভূমি থেকে বহির্বিশ্বের দিকে তাকাবার মতো যোগ্যতা সাধারণভাবে তারা রাখে না। সুক্ষ্মবুদ্ধি ব্রাহ্মণ সর্ববস্তুর মধ্যে গূঢ় ঐক্য দেখতে পান; ইরানীরাও তাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ চান মানুষের সমগ্র অনুভূতির ক্ষেত্রে এ সত্যকে দেখতে এবং বস্তুজগতে এর আন্তর্নিহিত প্রতিফলন বিভিন্নরূপে প্রমাণিত করতে। আর ইরানীরা প্রকৃতিতে একটি মোটামুটি বিশ্বজনীনতার প্রকাশ দেখেই সন্তুষ্ট; তার আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তিতে যে বিশ্ব ঐক্যের এক অবিচ্ছিন্ন সূত্র অপূর্ব বৈচিত্র্যে বিরাজ করছে, সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। ইরানী প্রজাপতিমন যেন নেশার ঘোরেই ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়ায়; সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে বাগানটিকে দেখতে চায় না। এই কারণেই তার চিন্তার ও ভাব প্রবণতার গভীরতম প্রকাশ ঘটে গয্‌ল্‌-এর খাপছাড়া পদসমষ্টিতে। এতে তার শিল্প সমৃদ্ধ অন্তরের সুক্ষ্ম অভিব্যক্তি থাকলেও, দর্শনের প্রগতি দিশাহারা। ইরানীদের ন্যায় হিন্দুরাও জ্ঞানের একটি উচ্চতর উৎসে বিশ্বাসী। কিন্তু লব্ধ জ্ঞান নিয়ে হিন্দুমন মেতে ওঠে না। প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকে যাত্রা করে সে অভিজ্ঞতা পরম্পরার দিকে ধীর ও সাবধানী পদক্ষেপে এগুতে থাকে এবং প্রত্যেকটি

অভিজ্ঞতাকে যুক্তির নির্মম অস্ত্রোপচারে বিমুক্ত করে তার অন্তর্নিহিত সাধারণ যোগসূত্র আবিষ্কার করে। প্রজ্ঞানশাস্ত্রের ধারাবাহিকতা ও সামগ্রিক রূপের ধারণা ইরানীয় মস্তিষ্কে পূর্ণায়ত্ব নয়; কিন্তু তার হিন্দু ভ্রাতার ব্যাপারে আলাদা। হিন্দুরা তাদের অবলম্বিত তত্ত্বকে একটি সুচিন্তিত ও সুমার্জিত পদ্ধতির মাধ্যমে দাঁড় করাবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষভাবে সজাগ। দু'জাতির এ মনোভাবগত তারতম্যের ফল সুপরিস্ফুট। একের কাছে আমরা পাচ্ছি একটি অপরিপক্ক চিন্তধারার বিক্ষিপ্ত অথচ বিচিত্র সমাহার; অন্যের কাছে পাচ্ছি বেদান্তের সুগভীর এবং ভীতিপ্রদ বিশালরূপ। ইসলামী মরমীবাদের দিক থেকে যাঁরা বিশ্ব ঐক্যের পূর্ণরূপ অবলোকন করতে চান, তাঁদের জন্যে আরব-স্পেনীয় দার্শনিক ইব্‌নুল আরবীর বৃহদায়তন পুস্তকাবলীর সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য। তাঁর সে কালীন দেশবাসীরা ইসলামকে যতই নীতিনিবদ্ধ ও কঠোররূপে দেখে থাকুক না কেন, তিনি ছিলেন সে ক্ষেত্রে এক বিশিষ্টতম ব্যতিক্রম।

মহান আর্য পরিবারের বিভিন্ন শাখা বিভিন্নরূপ প্রবণতা দেখিয়ে থাকলেও তাঁদের চিন্তা চর্চার ফলে আশ্চর্য সামঞ্জস্য রয়েছে। ভারতীয় আদর্শবাদের পরিণত ফল যেমন বুদ্ধ, পারস্যের তেমন ব্যক্তি হলেন বাহাউল্লাহ্ এবং পাশ্চাত্যের শপেন্‌হাওয়ার। শপেন্‌হাওয়ারের পদ্ধতিকে হেগেলীয় ভাষায় বলা হয়েছেঃ মুক্ত স্বাধীন প্রাচ্য দেশীয় বিশ্বজনীনতার সাথে প্রতিচ্যের সীমাসীনতার পরিণয়।

কিন্তু ইরানের চিন্তাধারার ইতিহাসের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ সেমিতীয় প্রভাবের ফলেই, ইরানের দার্শনিক চিন্তাধারা ধর্মের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে পড়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা নোতুন পথের পথিকৃৎ, তাঁদের প্রায় সর্বসময়েই দেখা যাচ্ছে নোতুন ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবর্তকরূপে। আরব বিজয়ের পরে অবশ্য মুসলিম নিও প্লেটনীয় আরস্ত অনুসারীরা বিশুদ্ধ দর্শনকে ধর্মের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। কিন্তু এ ছিল একটি সাময়িক ব্যাপার। গ্রীক্ দর্শন আদতে পারস্য দেশের জন্যে বিজাতীয় হয়ে থাকলেও কালে তা ইরানীয় দর্শনের সাথে একাকার

হয়ে যায়। পরেকার ইরানীয় চিন্তানেতা ও সমালোচকেরা আরস্ত (Aristotle) এবং আফলাতুন (Plato)-এর দার্শনিক ভাষাতেই নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে থাকেন এবং পূর্বপোষিত ধর্মীয় ধারণাদ্বারা প্রভাবিত হয়ে দার্শনিক সিদ্ধান্তাবলী বিবৃত করেন। ইসলাম-পরবর্তী ইরানীয় চিন্তাধারাকে যথাযথ ভাবে বুঝতে হলে এ ব্যাপারটী আগে থেকে মনে রাখা প্রয়োজন।

পাঠক স্বতঃই বুঝতে পারবেন যে বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে ইরানীয় প্রজ্ঞান চর্চার ইতিহাস রচনার ভিত্তিপত্তন প্রয়াস। এ প্রচেষ্টা নিছক ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ; অতএব এতে কোনো মৌলিক চিন্তার অবকাশ নেই। তবুও নিম্নোক্ত দুইটী বিষয়ের প্রতি পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ঃ—

প্রথমতঃ, ইরানীয় চিন্তাধারাকে আমি একটি যুক্তিগ্রাহ্য ধারাবাহিকতায় গ্রথিত করতে চেয়েছি এবং আধুনিক দর্শনের ভাষায় তার অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করেছি। যতখানি আমার জানা আছে, এ প্রচেষ্টা পূর্বে হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ, সুফীতত্ত্বকে আমি বৈজ্ঞানিক পন্থায় বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি; এবং যে মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর জন্ম হয়েছিল, তাকে পাঠকের গোচরে আনবার প্রয়াস পেয়েছি। অতএব সাধারণ ভাবে গৃহীত মনোভাবের বিরুদ্ধে যেয়ে আমি প্রমাণ করতে চেয়েছি যে কালের বক্ষে মানসিক ও নৈতিক চিন্তা-পরম্পরার ঘাত প্রতিঘাতে মানব মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তাতে মানুষের স্তিমিত আত্মা সজাগ হয়ে ওঠে এবং উন্নততর জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। এ হতেই হবে। সুফীবাদের অভ্যুদয়ও এর ব্যতিক্রম নয়।

'যেন্দ'-এর ভাষা আমার অজ্ঞাত; সুতরাং যোরো'ষ্টার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য দ্বিতীয় পর্যায়ের দলিল নির্ভর। এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে যা আলোচনা করেছি, সে সম্পর্কে আরবী ও ফারসী মূল পাণ্ডুলিপিগুলি দেখে নেবার সুযোগ আমার হয়েছে। তা-ছাড়া, এ বিষয়ে প্রকাশিত অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থের সহায়তাও আমি পেয়েছি। যে সব আরবী ফার্সী পাণ্ডুলিপির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ—

(১) তা'রীখে হুকুমা—আল্ বায়হাকী, বার্লিন রয়াল লাইব্রেরী।
(২) শরহি-আন্ওয়ারিয়াহ্ (মূল সহ)—মুহম্মদ শরীফ (হিরাট) ঐ
(৩) হিকমতুল অয়েন—আল্ কা'তিবী ঐ
(৪) হিকতুল আয়েন-এর ভাষ্য—
—মুহম্মদ ইবনে মুবারক আল্বুখারী—ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী।
(৫) হিকমতুন আয়েন-এর ভাষ্য—আল্ হুসায়নী— ঐ
(৬) আওয়ারিফ আল্-মুআরিফ—শাহাবুদ্দীন ঐ
(৭) মিশ্কাতুল আনওয়ার—আল্ গায্যালী ঐ
(৮) কশ্ফুল মাহজুব—আলী হাজবরী ঐ
(৯) রিসালাহ্ই নফস (আরম্ভ থেকে অনুবাদ)
—আফযাল কা'শী ঐ
(১০) রিসালাহ্ই মীর সৈয়দ শরীফ ঐ
(১১) খাতিমা—সৈয়দ মুহম্মদ গিসুদরাজ ঐ
(১২) মনাযিলস্ সা'রীন—আবদুল্লাহ্ ইসমাইল (হিরাট) ঐ
(১৩) জাভিদন নামাহ্—আফযাল কা'শী ঐ
(১৪) তা'রীখুল হুকমা—শাহিযুরী— বৃটিশ মিউযিয়াম লাইব্রেরী।
(১৫) Collected Works of Avicenna ঐ
(১৬) রিসালাহ্ ফিল্ ওজুদ—মীর জুরজানী ঐ
(১৭) জাবিদানে কবীর— কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী।
(১৮) জামি জাহান নুমা ঐ
(১৯) মজ্মুআ-ই-ফারসী রিসালাহ্—আন্ নসফী
প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা— ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরী।

Chapter 1

প্রথম খণ্ড

প্রাক্-ইস্‌লামী ইরানীয় দর্শন

প্রথম অধ্যায়

ইরানীয় দ্বৈতবাদ

(১) যোরো'ষ্টার (যরথুস্ত্র)

মধ্য-এশীয় সমভূমি-সমূহে তখনও বৈদিক স্তোত্রবাণী রচনা চলছে; ইরানীয় আর্যরাও অনবরতঃ ভ্রাম্যমান জীবনে ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমভূমি অঞ্চলে কৃষিজীবন অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছে। ঋষি যোরো'ষ্টারের অভ্যুদয় এই সময়ে। তিনি একাধারে ইরানী জাতির গার্হস্থ-জীবনের অগ্রনায়ক এবং ইরানী চিন্তাধারার ইতিহাসে প্রধানতম আলোক স্তম্ভ। ইরানীদের এ নোতুন জীবন যাত্রা এনে দেয় তাদের সমাজ-জীবনে স্থিতি-শীলতা এবং সাথে সাথে ব্যক্তি-সম্পদের প্রতি-মমতা। এ থেকে আরব্ধ হয় সমাজ-ব্যবস্থাপনার আয়োজন। সভ্যতার পথে যদিও এ একধাপ এগিয়ে চলার শামিল, কিন্তু অন্যান্য আর্যরা যাযাবর জীবনকেই তখন পর্যন্ত অধিকতর শ্রদ্ধেয় মনে করে এদের সাথে অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকে এবং সময়-সুযোগমতো এদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনে স্ফূর্তি বোধ করে। এভাবে এ দু'ধরণের জীবন-পদ্ধতির মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তা থেকে দু'সম্প্রদায়ের পূজ্য দেবতা গোষ্টিও আলাদা হয়ে পড়ে। একের দেবতাদল

P/1

অন্যের কাছে অসুর আখ্যা লাভ করে। এ দ্বন্দ স্বভাবতঃই বহুকাল ধরে চল্‌তে থাকে এবং শেষতক্‌ ইরানীরা বৃহত্তর আর্যগোষ্টিসমূহ থেকে আলাদা হয়ে একটী আলাদা মন, চাল্‌চলন ও সমাজ বিশিষ্ট জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যোরো'ষ্টারই হলেন এদের ধর্মশৃঙ্খলার প্রথম উদ্‌গাতা। তিনি সলন্‌ (Solon) ও থেলিস্‌ (Thales)-এর সমসাময়িক। প্রাচ্য-সভ্যতার আধুনিক গবেষকেরা অসীম শ্রমস্বীকার করে কিছুটা জানতে পেরেছেন যে যোরো'ষ্টারের অভ্যুদয়কালে ইরানীরা সামাজিক ক্ষেত্রে দু'টী যুধ্যমান দলে বিভক্ত ছিলঃ একদল ছিল মঙ্গলবাহী শক্তি সমূহের পূজারী (Partisans of the Powers of Good), আর অন্যদল অমঙ্গলবাহী শক্তি-সমূহের পূজারী (Partisans of the Powers of Evil)। এদের মধ্যে ম্যাজীয় (Magian) যাজক সম্প্রদায় প্রবল প্রতাপে অগণন ক্রিয়াক সংযোগে চরে বেড়াতেন। এমতাবস্থায় যোরো'ষ্টার জাতিকে এক ধর্ম পন্থায় একত্রিত করতে আত্মনিয়োগ করেন এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধর্মপ্রাণতা ও জাতিহিতৈষণা গুণে জীবনে কৃতকার্যতা অর্জন করেন। তাঁর তীব্র প্রতিবন্ধকতায় সমাজ থেকে অপদেবতার পূজা ও অসহনীয় আচার বহুল ম্যাজীয় যাজক প্রভাব বিদূরিত হয়।[১]

অবশ্য যোরো'ষ্টারের ধর্মীয় বিধি বিধানের জন্ম ও বিকাশ আলোচনা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় বস্তু নয়। এখানে আমরা দেখতে যাচ্ছি তাঁর আনীত মতবাদের প্রাজ্ঞানিক দিক্‌টী মাত্র। অতএব যোরো'ষ্ট্রীয় ধর্মে দর্শনের 'পবিত্র ত্রয়ী' ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতির স্থান নিরূপণই আমাদের উপস্থিত কর্তব্য।

গাইগার (Geiger) তাঁর Civilisation of Eastern Iranians in Ancient Times-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে যোরো'ষ্টার তাঁর আর্য পূর্ব-পুরুষদের থেকে দু'টী মৌলিক নীতি গ্রহণ করেছেন। যথাঃ—

(১) প্রকৃতিতে নিয়ম বর্তমান
(২) প্রকৃতিতে বিরোধ বর্তমান।

জগত ও জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে এই নিয়ম ও বিরোধের দ্বন্দ জনিত ঘাত প্রতিঘাত অবলোকনেই তাঁর দর্শনের গোড়াপত্তন। তাঁর প্রথমতম সমস্যা হলো ঃ বিশ্ববিধাতার অনন্ত মঙ্গলময়তার সাথে কি করে অমঙ্গলের সহ অবস্থিতি সম্ভব হ'তে পারে? তাঁর পূর্বসূরীরা মঙ্গলের বিভিন্ন আধাররূপে বহুদেবতার পূজা করতেন; কিন্তু তিনি সর্বমঙ্গলের আধার বলে মাত্র এক ঈশ্বর আহুরামযদা (Ahuramazda) র আসন প্রতিষ্ঠিত করেন। সাথে সাথে তিনি অমঙ্গলের সমাহাররূপে একজন অপদেবতার কল্পনা করেন; তিনি হলেন দ্রুজ আহরিমন (Druj Ahariman)। এভাবে সৎ ও অসৎ কে কেন্দ্রীভূত করে তিনি দুইটী মৌলিক নীতি স্বীকার করে নেন্। হাউগ্ (Haug) প্রমাণ করেছেন যে যোরো'ষ্টার এদু'টী নীতিকে কার্যতঃ পরস্পর-বিরোধী মনে করতেন না; বরং তাঁর মতে এদু'টী হলো একই প্রাথমিক সত্বার দুই অংশ বা দুই দিক্। এ থেকে ডঃ হাউগ্ মনে করেন যে ইরানীয় ঋষি ধর্মতঃ ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং দর্শনের ক্ষেত্রে ছিলেন দ্বিত্ববাদী।[২] কিন্তু এভাবে সত্য ও অসত্যের স্রষ্টারূপ একটী 'জোড় দেবতা'র কল্পনা করা হ'লে এবং তার সাথে যদি এ ও মনে করা হয় যে এই দু'জনই একই আদি সত্বায় মিলিতভাবে অবস্থান করছে, তবে বলতেই হবে যে অসৎ নীতিও স্বয়ং বিধাতারই প্রকৃতির অন্তর্গত।[৩] তা হ'লে এই যে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ, এ দাঁড়ায় ঈশ্বরের নিজেরই সাথে নিজের দ্বন্দের রূপে। অতএব তাঁর এই ধর্মীয় একত্ববাদের সাথে দার্শনিক দ্বিত্ববাদের সামঞ্জস্য বিধান চেষ্টায় একটী আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা রয়ে গেল। এর ফলে যোরো'ষ্টারের অনুগামীদের মধ্যে দেখা দিল আলাদা-আলাদা দলের অভ্যুদয়। ডঃ হাউগ্ যিন্দিকদের[৪] অপধর্মসেবী আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাদের বিরুদ্ধ-বাদীদের চেয়ে তারাই ছিল যোরো'ষ্টারের শিক্ষার নিকটতর অনুসারী। দু'টী প্রাথমিক নীতিকে তারা পরস্পর নিরপেক্ষ মনে করতো; কিন্তু ম্যাজীয়রা মনে করতো দু'টী আসলে এক। যিন্দিক্দেরকে তর্কে পরাস্ত করবার জন্যে বিরোধীয়দলের চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু যেভাবে তারা এক একবার এক এক ভাষায় এবং ভাষার মার প্যাঁচ দিয়ে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছে,

তা'তে বরং এইই প্রমাণিত হয় যে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রচারিত ধারণার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করতো না। বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে যিন্‌দিক-দের মতের দৃঢ়তাই সমগ্র তর্কবিতর্ক থেকে প্রকট হয়ে ওঠে। শাহারিস্তানী ম্যাজীয় মতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়েছেন।[৫] যরওয়া-নীয়ারা (Zarwanians) আলোক এবং অন্ধকারকে অন্তহীন কালের দুই সন্তান বলে মনে করেন। কিয়ুমর্‌সিয়া (Kiyumarthiyya) সম্প্রদায় মনে করেন যে আদি-নীতি ছিল আলোক; কিন্তু অভ্যুদয়ের পর তার মনে বিরোধী-শক্তির প্রতি ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয় মিশ্রিত বিরোধী অস্তিত্বের চিন্তা থেকেই জন্ম হয় অন্ধকারের। যর্‌ওয়ানীয়াদের অন্য এক সম্প্রদায় মনে করেন যে আদি-নীতির মনে সংশয়ের উদ্রেক থেকেই আহরিমন্‌-এর জন্ম। ইব্‌নে হাযম[৬] আরও একটী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, অন্ধকারের নীতির অভ্যুদয় হ'লো আদি-নীতি আলোকেরই আংশিক আচ্ছন্নতা থেকে।

অবশ্য যোরো'ষ্টারের দার্শনিক দ্বিত্ববাদকে ধর্মীয় একেশ্বরবাদের সাথে সামঞ্জস্যে আনা যায় কিনা—সে প্রশ্ন বাদ দিলেও, এ কথা বিতর্কাতীত যে সত্যের আদি প্রকৃতি বিচারে তাঁর প্রাজ্ঞানিক অবদান অসাধারণ। এ ক্ষেত্রে তিনি যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তার প্রভাব থেকে, মনে হয়, পুরাতন গ্রীক্‌ দর্শন[৭] এবং প্রাথমিক খৃষ্টীয় জ্ঞানবাদী চিন্তাধারার কোনো-টাই মুক্ত নয়। এভাবে প্রাথমিক খৃষ্টীয় চিন্তাধারার উপর তাঁর যে প্রভাব পড়েছে তা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সাথেও জড়িত।[৮] এক জন চিন্তানেতা হিসেবে তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। এর কারণ শুধু এই নয় যে তিনি জাগতিক গুণ বৈচিত্র্য সমস্যাকে দার্শনিক পন্থায় যাচাই করতে চেয়েছেন; তার সাথে আমাদের এ কথাও স্মরণীয় যে তিনি প্রাজ্ঞানিক দ্বিত্ববাদকে স্বীকার করেও তাঁর এই প্রাথমিক দ্বৈতঃ-কে উন্নততর একত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। জার্মানীর মরমীপন্থী পাদুকা নির্মাতার বহুকাল পূর্বেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রকৃতিতেই কোনোরূপ দ্বিধাত্মক বা আত্মবিরোধাত্মক বৃত্তি আরোপ না করলে বিশ্ব

প্রকৃতির পরস্পর বিরোধ মূলক বৈচিত্র্যাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য তাঁর সরাসরি অনুসারীরা এই গভীর তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তী ইরানীয় ভাবুকদের চিন্তা-ধারায় যোরো'ষ্টারের মতবাদ যে গভীরতর আধ্যাত্মিক রূপলাভ করেছে, তা ই ক্রমশঃ আমাদের প্রণিধান যোগ্য।

যোরো'ষ্টার প্রবর্তিত সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়, এই দ্বিত্ববাদের অনুসরণ করে তিনি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে যেন দুইটি আলাদা বিভাগে বিভক্ত করে দেখেছেন। এক হলো ঃ—সদ্‌বৃত্তিথেকে উৎসরিত সর্ব সৃষ্টির সমাহার—এক কথায় সত্য (Reality) ; অন্য হলো ঃ—বিরোধীবৃত্তির সৃষ্টি সমাহার—অসত্য (Non-reality)।[৯] এই দুই সৃজনীবৃত্তির চিরন্তন দ্বন্দ প্রকৃতির পরস্পর-বিরোধী শক্তি সমূহে প্রকট। অতএব মনে রাখতে হবে যে এই আদিম বৃত্তিদ্বয় এবং তাদের পারস্পরিক সৃষ্টির মধ্যে কোন মধ্যস্থ নেই। কোনো বস্তু, চিন্তা বা বৃত্তি ভাল বা মন্দ হয়, কেননা তার সৃষ্টিই সৎ বা অসৎ উৎস থেকে লব্ধ ; নিজ নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা মোটেই সজাগ নয়। প্লেটো এবং শপেনহাওয়ার-এর মতে অজাগতিক এবং জাগতিক ধরণার উপর সত্যোপলব্ধির বিভিন্ন পরিমাপের প্রভাবেই প্রকৃত রূপ ও দৃষ্ট রূপের ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ উপলব্ধিকে তাঁরা কতকটা সত্য ও অসত্যের মধ্যস্থরূপে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু যোরো'ষ্টারের ধারণা মূলতঃই ভিন্ন। তাঁর মতে সৃষ্টির মূলে ও বিকাশে দুইটিমাত্র ভিন্ন বৃত্তি রয়েছে ; এবং বিশ্বজগতের ইতিহাস এ দুইটি বৃত্তির আলাদা আলাদা আওতাভুক্ত শক্তি সমূহের দ্বন্দের ক্রমপ্রকাশমান ধারা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান্যের মতো আমরাও এই দ্বন্দের অংশিদার। একদিন আলোকের শক্তিসমূহ অন্ধকারের শক্তিসমূহের উপর বিজয়ী হয়ে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবেই। অতএব আমাদের কর্তব্য হলো এখনই আলোকের সেনাদলের পক্ষে এসে দাঁড়ানো এবং এ দলেই দৃঢ়পদে অবস্থিতি। অবশ্য শেষতক্ যোরো'ষ্টারের প্রজ্ঞান প্রগতিও প্লেটোর অনুকরণে নীতিশাস্ত্রের পর্যায়ে এসে পড়েছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁর

নীতিশাস্ত্রীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য থেকেই তাঁর সামাজিক পরিবেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।

আত্মার নিয়তি সম্বন্ধে যোরো'ষ্টারের মতাবলী অতি সরল। মিথ্ [১০] পন্থীরা পরবর্তীকালে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আত্মা ঈশ্বরেরই অংশ; কিন্তু যোরো'ষ্টারের মতে আত্মা একটি সৃষ্ট বস্তু, পরমেশ্বরের অংশ নয়। এর জন্ম কালের গর্ভে; কিন্তু এ কালজয়ী হতে পারে, অর্থাৎ অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে যদি পার্থিব কর্মক্ষেত্রে অসৎ এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থেকে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেবার ক্ষমতা রাখে এবং তাতে কৃতকার্য হয়। সৎ এবং অসৎ—এই দুইটি মাত্র কর্ম পন্থার যে কোনোটি সে নির্বাচন করতে পারে এবং এই নির্বাচনের স্বাধীনতার সাথে সাথে সে আলোক-দেবতাথেকে নিম্নোক্ত গুণাবলীও লাভ করেছে ঃ—

(১) বিবেক [১১]

(২) জীবনী শক্তি

(৩) মন—আত্মার প্রতিফলন

(৪) জ্ঞান (reason)—চৈতণ্যের প্রতিফলন (Spirit)

(৫) ফরাওয়াশী [১২]—এক ধরণের আধ্যাত্মিক অভিভাবক রূপ শক্তি, যা—মানুষের ঈশ্বরোদ্দেশে অভিযাত্রার এবং তাঁর সন্নিধানে পৌঁছার দীর্ঘ ও পরীক্ষাকীর্ণ পথে রক্ষক রূপে অবস্থান করে।

এই গুণাবলীর শেষোক্ত তিনটি [১৩] জীবের মৃত্যুর পরে একাত্রিত হয়ে যায় এবং একটি অবিচ্ছেদ্য সামগ্রীক রূপ গ্রহণ করে। পুণ্যবান আত্মা তার পার্থিব গৃহ (মানবদেহ) ত্যাগ করে উচ্চতর আবাসাদির দিকে প্রয়াণ করে; তাকে অতিক্রম করে চলতে হয় অস্তিত্বের নিম্নোক্ত স্তরগুলি ঃ—

(১) সৎ চিন্তার অবস্থান ভূমি

(২) সদ্‌বাক্যের অবস্থান ভূমি

(৩) সৎকর্মের অবস্থান ভূমি

(৪) চিরন্তন গৌরবের অবস্থান ভূমি [১৪]—এখানে ব্যক্তি আত্মা নিজ ব্যক্তিত্ব না হারিয়ে আলোকের নীতির সাথে মিলিত হয়।

(২) মানী [১৫] ও মযদক্ [১৬]

বিশ্ব বৈচিত্রের কারণ স্বরূপ যোরো'ষ্টার যে সমাধান দিয়েছেন তা আলোচিত হলো। কিভাবে এ ধর্মীয় মতবাদ ক্রমশঃ দার্শনিকরূপ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং ফলে যোরো'ষ্ট্রীয় ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের উদ্ভব হয় তা-ও আমরা অনুধাবন করেছি। মানীকে খৃষ্টিয়ানরা পরবর্তীকালে "নাস্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা" আখ্যা দিয়েছেন। যোরো'-ষ্টার শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা গুরুর মতবাদ আক্ষরিকভাবে পালন করতেন, তাঁদের সাথে মানী একমত ছিলেন। যোরো'ষ্টারের দর্শনকেও তিনি যাচাই করেছেন পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাঁর পিতা আদতে ছিলেন ইরানী। তিনি হামাদান থেকে ব্যাবিলোনিয়ায় যেয়ে বসতিস্থাপন করেন; সেখানে ২১৫ কি ২১৬ খৃষ্টাব্দে মানীর জন্ম হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ প্রচারকেরা নির্বানের মন্ত্র নিয়ে ভারত থেকে ইরান অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। মানীর সর্বধর্ম সমন্বয় মূলক পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে উর্বর ভূমির সহায়তা লাভ করলো। তা ছাড়া তিনি প্রচার করলেন যে বিশ্বপ্রকৃতি মূলতঃ অসৎ। সাথে সাথে খৃষ্টীয় মোক্ষ (যিশুর জীবনোৎসর্গের বিনিময়ে মানবের পাপমুক্তি) বাদকেও তিনি আরও ফলাও করে দাঁড় করালেন। এতে যে শুধু সংসার বৈরাগ্যের একটি বলিষ্ঠ যুক্তি পাওয়া গেল—আর পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের খৃষ্টীয় মতবাদের [১৭] উপর তাঁর প্রভাব পড়ল—তা নয়; সাথে সাথে ইরানীয় প্রাজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশেও তাঁর মতবাদের অস্পষ্ট ছায়াপাত হলো। মানীর ধর্মীয় মতবাদের মূল কোথায় সে প্রশ্ন প্রাচ্যবিদ্‌দের বিচার্য।[১৮] আমাদের জন্যে উপস্থিত বিবেচ্য হলো: এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর মতবাদের দার্শনিক গুরুত্ব।

আর্ডম্যান্ (Erdmann) বলেন: এই পৌত্তলিকতা-প্রবণ জ্ঞানবাদী প্রচার করেছেন যে বস্তুর বৈচিত্র্য আলোক এবং অন্ধকার—এই দুইটি চিরন্তন নীতির মিশ্রণ থেকে রূপ লাভ করেছে। এই দুই নীতির অভিব্যক্তি দশ প্রকার; যথা: ভদ্রত্ব, বিদ্যা, বোধ শক্তি, রহস্য, অন্তর্দৃষ্টি,

প্রেম, প্রতীতি, বিশ্বাস, সদাশয়তা ও জ্ঞান। অন্ধকারের অভিব্যক্তিও পাঁচটি চিরন্তন রূপে আত্ম প্রকাশ করে; যথাঃ অস্বচ্ছতা, তাপ, অগ্নি, বিষ এবং তমসা। এই মৌলিক নীতির সাথে মানী আরও দুইটি পরস্পর সংবদ্ধ চিরন্তন-এর উল্লেখ করেছেন। তা হলো অন্তরীক্ষ আর পৃথিবী। এদের অভিব্যক্তিও রয়েছে বিষ্ঠা, জ্ঞান, রহস্য, অন্তর্দৃষ্টি, শ্বাস, বায়ু, জল, আলো ও অগ্নিতে। প্রকৃতির স্ত্রী-ত্ব ব্যঞ্জক নীতিরূপ অন্ধকারে অসৎ-এর সত্বাবলী গোপন ছিল; কালক্রমে এসব সত্বা একীভূত হয়ে কদর্যবপু বিভেদ-দানবের সৃষ্টি হয়। অন্ধকারের প্রতপ্ত গর্ভের এই প্রথম দানব-সন্তান আলোকের রাজ্যে হানা দেয় এবং আলোক-রাজ এর আক্রমণ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন আদিম মানবকে। দুই প্রাণীর মধ্যে কঠোর সংগ্রামে আদিম মানুষ সম্পুর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়। ফলে দানব শক্তি পাঁচটী আলোক-সত্বার সাথে পাঁচটী অন্ধকার সত্বা মিশিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে যায়। অতঃপর এই সব বন্দী আলোক-কণিকাকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে আলোক মণ্ডলের রাজা স্বর্গদূতদের আদেশ দিলেন এই মিশ্রিত পদার্থের সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করতে। এখন বিবেচ্য ঃ অন্ধকার কেন আলোককে অগ্রে আক্রমণ করলো? কারণ, তা না হলে, যদি আলোক অন্ধকারকে অগ্রে আক্রমণ করে পরাস্ত করতো, তবুও সে আলোক-কণিকার সাথে অন্ধকার কণিকা মিশ্রিত করতে পারতো না; কেননা, তা করতে গেলেও আলোকের নিজেরই ক্ষতি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে হেগেলীয় সৃষ্টিতত্বের খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের সাথে যে সম্পর্ক, মানীর সৃষ্টিতত্বেরও খৃষ্টীয় মুক্তিবাদের সাথে সেই একই সম্পর্ক। তাঁর মতে মোক্ষ (redemption) একটি দৈহিক ব্যাপার এবং সর্বপ্রকার জন্মদানই বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্য বিরোধী। কেননা, তাতে আলোক-কণিকার বন্দীদশার মেয়াদ বাড়তে থাকে। বন্দী আলোক-কণিকাসমূহ অন্ধকার থেকে অনবরতঃই মুক্তিলাভ করে চলেছে; আর অন্ধকার নিক্ষিপ্ত হচ্ছে বিশ্বজগতের চতুষ্পার্শের অতল গহ্বরে। কিন্তু মুক্ত আলোক-সত্বাগুলি সূর্য ও চন্দ্রে চলে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে স্বর্গদূতেরা তাদের নিয়ে যাচ্ছে চিরন্তন আলোকের রাজ্যে। সে স্থান হলো স্বর্গের

রাজা 'পিদ্-ই-বযর্গি' (মহত্বের পিতা)-র কালজয়ী নিবাস।

এ হলো মানীর অদ্ভুত সৃষ্টিতত্বের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।[১৯] বাস্তব জগতের এই বিপরীতমুখিতা বিচারে যোরো'ষ্টারপন্থীরা যে সৃষ্টিধর্মী মধ্যস্থ-রাজীর অস্তিত্ব কল্পনা করতেন, মানী সে সব অস্বীকার করেন। এ প্রশ্নে একটি পুরোপুরি বস্তুবাদী মনোভাব নিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে এই দৃশ্যমান বিশ্বজগত দুইটি স্বাধীন চিরন্তন নীতির মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত। এ দুই নীতির অপকৃষ্টটি (অর্থাৎ অন্ধকার) ও শুধু বিশ্ব উপাদান (Universe stuff) এর অংশমাত্র নয়, বরং এর মধ্যেও কর্মোদ্যম ঝিমন্ত অবস্থায় বিদ্যমান এবং যে মুহূর্তে সুযোগ আসে তখনই তা সজাগ ও সৃষ্টিতৎপর হয়ে উঠে। এ-থেকে দেখা যাচ্ছে যে মানী-উদ্ভাবিত সৃষ্টিতত্ব অনেকদিক দিয়ে প্রসিদ্ধ হিন্দু দার্শনিক কপিলের সৃষ্টিতত্বের সাথে মিলে যায়। এঁর মতে, প্রকৃতির সৃষ্টি কার্যের মূলে রয়েছে তিনটি গুণ—যথা ঃ সত্বঃ (মঙ্গল), তমঃ (অন্ধকার) এবং রজস্ (গতি বা আবেগ)। এ তিনের মিশ্রণে যখন আদিম প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, তখনই হয় সৃষ্টির সূত্রপাত। বেদান্তপন্থীরা বলেন, মায়ার চিররহস্যাবৃত ক্ষমতার প্রতিফলনই দৃষ্ট হচ্ছে এ সৃষ্টি বৈচিত্রে। লাইব্নিয্ (Leibniz) অবশ্য বহুকাল পরে তাঁর Identity of Indiscernibles—তত্ব প্রচার করে সে মতেই সায় দিয়েছেন। যা হোক্, এ সম্পর্কে মানী কিছুখানি অপরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকলেও দার্শনিক চিন্তার বিকাশ-ইতিহাসে তাঁর স্থান অবহেলাযোগ্য নয়।[২০] তাঁর সমাধানের দার্শনিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর হতে পারে ; কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকে যাঁরা অসৎ (শয়তান)-এর ক্রিয়াকর্ম এবং তজ্জনিত আদতেই দুষ্ট বলে মনে করেন, (আমার মনে হয়, এ মনোভাবের পরিণতিতেই রয়েছে বৈরাগ্যকে জীবনের আদর্শনীতি হিসেবে গ্রহণ ও প্রচার করবার প্রবৃত্তির একমাত্র নীতিগত সমর্থন।)—মানী তাঁদের পুরোধা। আমাদের একালে শপেনহাওয়ারও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ; যদিও মানীর সাথে তাঁর এই গরমিল রয়েছে যে বাস্তবায়ন বা ব্যক্তিত্বায়ননীতি—যা জীবন-প্রবণতা (will to life)-র একটি পাপস্পৃষ্ট বাঁক স্বরূপ—

তাঁর মতে, আদিম ইচ্ছাশক্তির প্রকৃতিগত গুণ এবং তার উপর নির্ভরশীলতা থেকে বিমুক্ত নয়।

প্রাচীন ইরানীয় বিশিষ্ট সমাজবাদী মযদকের অভ্যুদয় হয় 'ন্যায়বীর' আনুশিরওয়ান (৫৩১—৫৭৮ খৃষ্টাব্দ) এর রাজত্বকালে। তাঁর প্রবণতা ছিল বিশেষভাবে সাম্যবাদের দিকে। তিনি প্রচলিত যরওয়ানীয় মতবাদের [২১] বিরুদ্ধে আর এক প্রকার দ্বিত্ববাদী নীতির জন্মদান করেন। মানীর ন্যায় তিনিও প্রচার করেন যে বিশ্বজগতের বৃত্তি বা বস্তুসমূহের পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর সৃষ্টি হয়েছে দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ চিরন্তন নীতি থকে। তিনি এ দুই নীতির নাম দেন 'শিদ্' (আলোক) ও 'তার' (অন্ধকার)। কিন্তু তাঁর মতে এই দুই নীতির মিশ্রণ ছিল একটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার। মানীর পূর্বকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত মিশ্রণবাদের তিনি বিরোধী। আবার শেষ পরিণতিতে এ দুই নীতি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তা-ও হবে একটি আকস্মিক বা অ ইচ্ছিত ব্যাপার। মযদকের ঈশ্বর অনুভূতিশীল; তাঁর চিরকালীন অস্তিত্বের সাথে জড়িত রয়েছে চারিটি বিশিষ্ট বৃত্তি; যথা ঃ বিচার ক্ষমতা (power of discrimination), স্মৃতি (memory), বুদ্ধি (understanding) এবং প্রশান্তি (bliss)। এ চার বৃত্তির চারিটি ব্যক্তিত্বায়িত রূপ রয়েছেন এবং এঁরা অন্য চারিজন ব্যক্তির সহায়তায় বিশ্বজগতের ক্রিয়াকর্ম-তদারক করেন। মানুষ ও বস্তু নিচয়ের বিভিন্নতা বা বৈচিত্র মৌলিক নীতিসমূহের মধ্যে পরস্পর মিশ্রণের কম বেশী তৌলের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু মযদকীয় শিক্ষার বিশিষ্টতম দিক্ হলো এর অন্তর্নিহিত সাম্যবাদ; অবশ্য মানীয় দর্শনের বিশ্বজনীন ভাবধারার প্রভাব এ ক্ষেত্রে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মযদক দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে সকল মানুষ সমপর্যায়ভুক্ত; এবং মানবশত্রু দৈত্যেরা ঈশ্বরের উদার বিশ্বকে অন্তহীন দুর্দশায় আপতিত করবার জন্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা প্রবর্তন করেছে। মযদকের শিক্ষার এই বিশিষ্ট দিক্ই যোরো'ষ্টারপন্থীদের বিবেকে তীব্রতম আঘাত হানে। পরিণামে এর প্রতিক্রিয়াতেই মযদকের বিরাটাকার অনু-

সারীদলে ভাঙ্গন ধরে, এবং শেষ পর্যন্ত অলৌকিক ক্ষমতাবলে অগ্নিদেবকে দিয়ে কথা বলানো ও তাঁর মতবাদের সত্যতার সমর্থন ইত্যাদি কাহিনী প্রচার সত্বেও মযদকপন্থীদের বিলোপ সাধিত হয়।

(৩) পশ্চাৎ দৃষ্টি

এতক্ষণ প্রাক্ ইস্লামী ইরানীয় চিন্তাধারার কোনো কোনো দিক্ আলোচিত হলো। অবশ্য এ চিন্তা প্রগতির ধারাবাহিকতা আমরা পুরোপুরি গড়ে তুলতে পারিনি; সাসানীয় যুগের মনোভাবের প্রতি আমাদের অজ্ঞতা এবং বিশেষ করে এ চিন্তাসূত্রের পেছনে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা বিরাজ করছিল, তার সাম্যক্ পরিচিতির অভাবই এর কারণ। কোনো জাতির ক্ষেত্রে বলুন বা ব্যক্তির ক্ষেত্রেই বলুন, তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ধারাবিকাশ আরব্ধ হয় একটি উদ্দেশ্যের অভিমুখে। যদিও যোরো'ষ্ট্রিয় স্বষ্টিতত্ব এই ইরানী ঋষির নীতিপ্রবণতার প্রভাবে কিছুটা আধ্যাত্মিক রূপ লাভ করেছে, কিন্তু আসলে এ যুগের ইরানীয় ভাবধারার শেষ দৌড় বস্তুতান্ত্রিক দ্বিত্ববাদের অধিক এগোয়নি। সর্ব অস্তিত্বের দার্শনিক ভিত্তিভূমি যে একত্বের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—এ মনোভাব তখন পর্যন্ত ইরানে মাত্র অস্পষ্টভাবে অনুভূত হতে আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য যোরো'ষ্টার শিষ্যদের বিভিন্ন বিষয়ে তর্কাতর্কির ধরণ ধারণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এতে বিশ্বজগতের একত্বমূলক ধারণা মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাক্ ইস্লামী ইরানীয় চিন্তাধারায় সর্বেশ্বরত্ববাদের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কিছু বলার মতো মাল মশলা আমাদের হাতে নেই। অবশ্য আমাদের জানা আছে যে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের নিপীড়ন থেকে বাঁচবার জন্যে ডায়োজিনিস, সিমপ্লিসিয়াস এবং অন্যান্য নিও প্লেটনীয় ভাবুকেরা উদারহৃদয় আনুশিরওয়ানের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই মহান নরপতি সংস্কৃত ও গ্রীকভাষা থেকে নিজ ব্যবহারের জন্যে কতকগুলি বই অনুবাদও করিয়েছিলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইরানীয়

চিন্তাধারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে প্রমাণিত করবার মতো ঐতিহাসিক দলীল আমাদের হাতে নেই। এর পরবর্তী পর্যায় হলো ইরানে ইস্‌লামের অভ্যুদয়। ইস্‌লাম এখানে এসে পূর্ববর্তী চিন্তা-ধারাকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে দেয় এবং চিন্তাশীল মানুষের সম্মুখে এমন একটি অভিনব আপোষহীন একেশ্বরবাদ এবং নোতুনরূপে আল্লাহ্‌ (স্রষ্টা) ও বস্তু (সৃষ্টি) সম্পর্কীয় গ্রীক দ্বিত্ববাদ উপস্থাপিত করে—যা ঈশ্বর (দেবতা) ও দানব (অপদেবতা)- সম্পর্কীয় ইরানীয় দ্বিত্ববাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

পাদটীকাবলী

(১) কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে, যোরো'ষ্টার একজন পৌরানিক ব্যক্তি মাত্র। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক জ্যাক্‌সনের বিশিষ্ট গ্রন্থ Life of Zoroaster প্রকাশিত হবার পর আধুনিক গবেষকেরা এই ইরানী মহাপুরুষকে বাস্তব স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবেন।

(২) Essays, P. 303.

(৩) "আরম্ভে ছিল একটি জোড়—দু'টি প্রবৃত্তির সমাহার ; তাদের কাজ ছিল ভিন্ন বৈশিষ্ট্যবাহী।" Yas. XXX—1.

"আমার অপেক্ষাকৃত উপকারপ্রবণ চিৎ বৃত্তিসমূহ বাক্যে ব্যক্ত হয়ে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সৃষ্টির অভ্যুদয় ঘটিয়েছে।" Yas XIX—9.

(৪) বূদাহিশ্‌ - প্রথম অধ্যায় থেকে যিন্‌দিক্‌ মতবাদের যা আভাস পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

"এবং তাদের (মঙ্গল-অমঙ্গল—দুই নীতির) মধ্যে ছিল বিস্তীর্ণ শূন্যতা—যাকে বলা হয় 'বায়ু' ; এখন এটি তাদের মিলন ভূমি।"

(৫) Shaharistani : ed. Cureton, London,1846, PP. 182-185.

(৬) ইব্‌নে হাযম্‌—কিতাব আল্‌-মিলাল ওয়ান্‌-নিহাল—কায়রো, ২য় খণ্ড, ৩৪ পৃঃ।

(৭) পুরাতন গ্রীক্ চিন্তাধারার উপর যোরো'ষ্ট্রীয় ধারণাবলীর প্রভাব বিবেচনায় আর্ডম্যান (Erdmann) এর নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। (অবশ্য লরেন্স মিল্—American Journal of Philology, Vol. 22তে এ সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন)—"হেরাক্লিটাস্ যে শক্তিকে সব ঘটনা ও সব পদ্ধতি পরিমাপের অঙ্কুর বলে মনে করেন, তার কার্যকরী বৃত্তিসমূহের বাক্‌শক্তি (tongues) বলে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবতঃ ইরানীয় ম্যাজিপন্থীদের কথঞ্চিৎ প্রভাবের ফল। অপরপক্ষে তিনি স্বদেশের পৌরাণিক রীতির সাথেও যোগ রেখেছেন। অবশ্য আদিম অগ্নিরূপ যিউস্ এর পাশে তাঁর প্রকৃতির দুই দিককার পরিচিতিস্বরূপ অ্যাপলো ও ডায়োনিসাস্‌কে স্থাপন করতে যেয়ে তিনি যে প্রচলিত ভাষ্যের কিছুটা ব্যতিক্রম করেছেন তা-ও অস্বীকার্য নয়।"—History of Philosophy, Vol. 1, P. 50.

লা'সাল (Lassalle) সম্ভবতঃ হেরাক্লিটাস্-এর উপর যোরো'ষ্টারের এই সম্ভাব্য প্রভাবের দরুনই মনে করেছেন যে, যোরো'ষ্টার হেগেল্-এর পূর্বসূরী। (Paul Janet-এর History of the Problems of Philosophy, Vol. II, P. 147 দ্রষ্টব্য।)

পিথাগোরাস্-এর উপর যোরো'ষ্টারের প্রভাব সম্বন্ধে আর্ডম্যান্ (Erdmann) বলেন ঃ "গ্ল্যাডিশ্ পিথাগোরীয় ও চৈনিক সিদ্ধান্তের তুলনা-কালে বিজোড় সংখ্যাকে জোড়সংখ্যার পুরোভাগে স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অধিকন্তু বিরোধী বস্তু ও বৃত্তিসমূহের মধ্যে যে আলোক-অন্ধকার, সৎ-অসৎ ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে, তাতে অতীতে ও বর্তমানে অনেক পণ্ডিতব্যক্তি মনে করেছেন যে, এ-সব যোরো'ষ্ট্রীয় মতবাদ থেকে ধার করা।" Vol. 1. P. 33.

(৮) আধুনিক ইংরেজ চিন্তানেতাদের মধ্যে মিঃ ব্র্যাডলী'র মতবাদ যোরো'ষ্টারের অনুরূপ। ব্র্যাডলী'র দর্শনের নীতিগত তাৎপর্য আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সোর্‌লী (Prof. Sorley) বলেন, "গ্রীন-এর মতোই মিঃ ব্র্যাডলী'ও বিশ্বাস করেন যে, সনাতন সত্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ; এবং এ-সত্য

যেহেতু জড়রূপ নয়, অতএব তা আধ্যাত্মিক। গ্রীন্ মনে করেন যে, মানুষের নৈতিক জ্ঞান ও কর্ম এই সনাতন সত্যেরই পুনরাবির্ভাব। ব্র্যাড্‌লী'র মতও তাই—তাঁর ভাষার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই সাধারণ মিলের পেছনে দু'জনার মধ্যে বিশ্বব্যাপী গরমিল রয়েছে। ব্র্যাড্‌লী' আত্মসচেতনতা গুণের উল্লেখ করে তাঁর স্বয়ম্ভুকে মানব-ব্যক্তিত্ব থেকে আলাদা করে দেখেছেন; ফলে গ্রীন্-এর প্রচ্ছন্নতা কাটিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের জীবনে এবং বিশ্বজগতে সৎ এর সাথে সাথে অসৎও সমভাবেই স্বয়ম্ভুর প্রতিচ্ছবি বই নয়।" (Recent Tendencies in Ethics, PP. 100—101.)

(৯) প্লেটোর অনস্তিত্ব (non-being) আর এই অসত্য (non-reality) এক নয়। যোরো'ষ্টারের বিবেচনায় অন্ধকারের শক্তিবলে সৃষ্ট সবকিছুই অসত্য অর্থাৎ অস্থায়ী অস্তিত্বের অধিকারী মাত্র; কেননা, পরিণতিতে আলোকের জয় অবশ্যম্ভাবী।

(১০) মিথ্রীয়বাদ যোরো'ষ্ট্রীয়বাদেরই এক বিশেষ রূপ। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমীয় সাম্রাজ্যে এ মতবাদ প্রসার লাভ করে। মিথ্রীয়রা সূর্যকে আলোকের প্রধানতম উদ্‌গাতা জ্ঞানে পূজা করতো। তারা মনে করতো যে, মানব-আত্মা ঈশ্বরের অংশ এবং কতকগুলি গোপন রহস্যাশ্রয়ী ক্রিয়া-কলাপ অবলম্বনে আত্মা আবার ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারে। আত্মা সম্বন্ধে তাদের মতবাদ—দেহকে নিপীড়নের মাধ্যমে আত্মার ক্রমশঃ ঈশ্বরমুখীন প্রগতি ও পর্যায়ক্রমে 'ইথার' স্তর ইত্যাদি অতিক্রম করে খাঁটি অগ্নিতে পরিণতি ইত্যাদি কল্পনা ইরানীয় সূফীবাদী কোনো কোনো সম্প্রদায়ের সাথে মিলে।

(১১) গাইগার (Geiger)-কৃত Civilisation of Eastern Iranians, Vol. 1, P. 124.

(১২) ডঃ হাউগ্ (Essays, P. 205) এই 'অধিদেবতা'দের প্লেটোর 'ধারণা'র সাথে তুলনা করেছেন। এদেরকে অবশ্য বস্তুর বাহ্যিক রূপলাভের মডেল হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তাছাড়া, প্লেটোর ধারণাবলী হলো চিরন্তন, অ-বাহ্যিক ও স্থিতিনিবদ্ধতার অতীত। আলোকের সৃজনীশক্তি

থেকে যা কিছুই জন্মগ্রহণ করে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে কিছুটা ছোটোদরের অন্যান্য দৈবশক্তি সমূহও রয়েছে বলে যে মতবাদ, তা প্লেটোর বিস্তৃত মতবাদ (অর্থাৎ ঃ প্রত্যেকটি জীব এক একটি ইন্দ্রিয়াতীত ও ত্রুটিবর্জিত মডেল-এর অনুসারী)-থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(১৩) সুফীদের ধারণায়ও আত্মা ত্রি বৃত্তির সমাহার। তাঁদের মতে, আত্মা হলো মন, হৃদয় ও চৈতণ্য (নফ্স্, ক্বল্ব্ ও রূহ্)—এ তিনের মিলিত রূপ। হৃদয় একাধারে বস্তুজাতীয় ও বস্তুধর্মিতার অতীত। অন্য কথায়, বরঞ্চ এ বস্তু বা অবস্তু—একটিও নয়; এর স্থান হলো 'মন' ও 'চৈতণ্যে'র মাঝামাঝিতে। এর কাজ 'উচ্চতর জ্ঞানে'র প্রতিনিধিত্ব। সম্ভবতঃ ডঃ শেক্কেল্-এর ব্যবহৃত 'বিবেক' (conscience)-কথাটি সুফীদের 'হৃদয় (ক্বল্ব্ ঃ heart)-এর সম-অর্থজ্ঞাপক।

(১৪) Geiger, Vol. 1. p. 104 দ্রষ্টব্য। সুফী-সৃষ্টিতত্ত্বেও আত্মার এই ঊর্ধমুখী-প্রয়াণের পথে বিভিন্ন অস্তিত্ব ও অবস্থিতি সম্বন্ধে এই একই ধরণের মতবাদ রয়েছে। সুফীদের মতে, এ পথে নিম্নোক্ত পাঁচটি স্তর রয়েছে ঃ—

(১) দেহের জগত (না'সূত)
(২) অনাবিল বুদ্ধির জগত (মলকুত)
(৩) শক্তির জগত (জব্রূত)
(৪) নিষেধ (negation)-এর জগত (লা'হূত), এবং
(৫) পূর্ণ নীরবতার জগত (হা'হূত)।

সুফীদের এ মতবাদ সম্ভবতঃ ভারতীয় যোগীদের থেকে নেওয়া। এঁদের বিস্তৃত সাত স্তরের উল্লেখ এনী বেসান্ত্ (Annie Besant)-এর পুস্তক Re-incarnation (P. 30)-এ নিম্নরূপ ঃ—

(১) স্থূল দেহের স্তর
(২) ভৌম জোড় (Etherial Double)-এর স্তর
(৩) জীবনীশক্তি (Vitality) র স্তর
(৪) অনুভূতিধর্মী প্রকৃতি (Emotional Nature)-র স্তর

(৫) চিন্তার স্তর

(৬) আধ্যাত্মবৃত্তি (Spiritual Soul)-র –আত্মা বা জ্ঞানের স্তর, এবং

(৭) বিমল চৈতন্যে (Pure Spirit)-র স্তর।

(১৫) আলোচিত গ্রন্থাবলী ঃ—

১। Flugel সম্পাদিত Muhammed ibn Ishaque, PP. 52-56

২। Al-Yaqubi : ed. Houtsma, 1883, Vol. I, pp. 188-192.

৩। ইব্‌নে হাযম ঃ কিতাব আল্‌ মিলাল ওয়ান্‌ নিহাল, ed. Cairo, Vol. II, p. 36.

৪। শাহারিস্তানী, ed. Cureton, London, 1846.

৫। Encyclopaedia Britannica

৬। Salemann

৭। F. W. K. Muller.

(১৬) আলোচ্য গ্রন্থাবলী ঃ—

১। সিয়াসৎনামা নিযামুল্‌ মুল্‌ক্‌, ed, Charles Schefer, Paris, 1897, pp. 168-181,

২। শাহারিস্তানী

৩। Al-Yaqubi

৪। আল্‌-বিরুনী ঃ Chronology of Ancient Nations, Tr. E. Sachair, London, 1879, p. 192.

(১৭) হার্‌নাক্‌ (Harnack)-কৃত History of Christian Dogma (Vol. V, p. 56)-গ্রন্থে আছে ঃ "আমার মত যদি সঠিক হয়, তবে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ চালু ছিল। প্রথম হলো মানীয় মতবাদ—এর জন্ম অন্ধকারে হয়ে থাকলেও খৃষ্টীয় ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্যে পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তারলাভ করেছিল।" উক্ত বইয়ের ১২০ পৃষ্ঠায় আছে "মানীবিরোধী বিতর্ক থেকেই হঠাৎ দেখা দেয় ঈশ্বরের সর্বগুণকেই এক মনে করবার প্রয়াস, অর্থাৎ—ঈশ্বরকে অবিভাজ্য মনে করবার প্রচেষ্টা।"

(১৮) অধ্যাপক বিভান (A. A. Bevan) তাঁর Introduction to the Hymn of the Soul-গ্রন্থে বলেছেন যে Eplorain Syrus প্রমুখ প্রাচ্যদেশীয়

মানীয় দর্শনের বিশেষজ্ঞদের মতে, তিনি ছিলেন সীরিয় গ্নোস্‌টিক্ (Gnostic : খৃষ্টীয় জ্ঞানপন্থী যাজক) Bardessanes-এর শিষ্য। অবশ্য আল্‌-ফিহ্‌রিশত্‌-এর সুপণ্ডিত প্রণেতা সীরিয় Gnostic-দের প্রতিবাদে লেখা মানীর নিজের রচিত কতকগুলি পুস্তকের উল্লেখ করেছেন। Burkitt তাঁর Lectures on Early Eastern Christianity-তে Bardessanes-কৃত De Fato থেকে কতকগুলি উদ্ধৃতি দিয়েছেন; সেগুলি নাকি পুরোপুরি খৃষ্টীয় মতবাদের সমর্থক এবং মানীর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইব্‌নে হাযম্‌ অবশ্য তাঁর কিতাব-আল মিলাল ওয়ান্‌ নিহাল-গ্রন্থে বলেছেন "দুজনের অন্যান্য বিষয়ে মিল ছিল; কিন্তু মানী বিশ্বাস করতেন যে অন্ধকার একটা জীবন্ত নীতি।"

(১৯) মানীর প্রকৃতি দর্শনের সাথে চীনা সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। চীনা মতে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর উৎস হলো 'য়িন্‌' (Yin) ও 'ইয়াং' (Yang)-এর মিলন। কিন্তু চীনারা এই দুই নীতিকে একটা উন্নততর একত্বের রূপভেদ বলে মনে করতো; তা হলো 'তাই কেইহ্‌' (Tai keih)। মানীর মতে, এরকম একত্ব সম্ভবপর নয়; কেননা, একই নীতি থেকে পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হ'তে পারে বলে তিনি মনে করতেন না।

(২০) টমাস্‌ এ্যাকুইনাস্‌ মানীর আলোক-অন্ধকার দ্বন্দ (Contrariety of Primal Agents)-নীতির সমালোচনায় নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন:—

(ক) সকলের যা কাম্য, অন্যায়ের নীতিরও তা কাম্য;
কিন্তু প্রত্যেকে চায় আত্মরক্ষা করতে।
অতএব অন্যায় নীতিরও কাম্য আত্মরক্ষা।

(খ) সকলের যা কাম্য, তা হলো মঙ্গল;
কিন্তু সকলে চায় আত্মরক্ষা করতে।
অতএব আত্মরক্ষা করতে চাওয়া মঙ্গলকর।

এখন অন্যায় নীতিও আত্মরক্ষা করতে চায়; অতএব স্বীকার্য যে অন্যায়ের নীতিও কিছুটা মঙ্গলকামী। মানে, অন্যায় নীতি হলো আত্ম বিরোধী। কিন্তু তা-কি করে হয়?

—God—His Creatuers. Book II. P. 105. Rickaby's Tr.

(২১) ইরানে যর্‌ওয়ানীয় মতবাদের প্রসার হয় খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। Z. D. M. G., Vol. LVII, P. 562.-দ্রষ্টব্য।

———

(১৪)

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রীক্ দ্বিত্ববাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইরানের নিও প্লেটনীয় আরস্তু-পন্থীগণ

আরব বিজয় থেকে ইরানীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে একটি নোতুন যুগের সূচনা হয়। কিন্তু নাহাওয়ান্দ এ আরবের দুর্ধর্ষ মরুসন্তানদের সমর-স্পৃহার হাতে ইরানের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়ে থাকলেও, তাতে এই সুপ্রাচীন জাতির মনোজগতে বিশেষ রেখাপাত ঘটেনি। উপরে বিপর্যয়ের ঝড়ে তাদের মনোগতি ভিন্নমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বটে; কিন্তু ভিতরে যোরো'ষ্ট্রীয় ঐতিহ্যে লালিত বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতা তাদের অক্ষতই রয়ে গেছে।

বস্তুতঃ আরব বিজয় থেকে ইরানীদের জীবনে যে রাজনৈতিক বিপ্লব আরম্ভ হয়, তার ফলেই সূত্রপাত হলো মুসলিম দর্শন জগতের আর্য ও সেমিতীয় চিন্তাধারার সংঘাতের এবং ক্রমশঃ বোঝাপাড়ার। বাহ্য-দৃষ্টিতে দেখা গেল যে ইরানী জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো, অর্থাৎ ইসলামের খোলসের নীচে আত্মগোপন করলো; কিন্তু আসলে এ হলো ইসলামকেই মনোবিকাশের ক্ষেত্রে চুপেচাপে আর্য চিন্তাধারায় রূপান্তরণের নামান্তর। প্রতীচ্যেও ইতিপূর্বে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে খাঁটি সেমিতীয় খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যাদাতার আসন ক্রমশঃ মানসিক ধৈর্য ও ঐশ্বর্যবলে হেলেনীয় ভাবুকদের দলে চলে যায়। এ দু'ক্ষেত্রেই ফল ফলেছিল আশ্চর্যজনকভাবে একই রকম। এ দু'ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যাদাতার

বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজিত হয়েছিল একই উদ্দেশ্যে ঃ ব্যক্তিমনের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া অবিসংবাদিত কানুনাদির কঠোরতাকে একটু একটু করে সহনযোগ্য করে দাঁড় করানো। এক কথায়, এ হলো বাহ্যিককে আন্তরিক করে তোলা। একদিকে অবশ্য বলা যায় যে গ্রীক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার পর ইরানীদের নিজস্ব বিশিষ্ট মনোবিকাশের পথ নিজ সচ্ছন্দগতি হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু অন্যপক্ষে এ ও স্বীকার করতে হবে যে এই গ্রীক্ চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার পর থেকেই ইরানীয়রা বিজেতা আরবদের আরোপিত জীবন পদ্ধতিকে নবরত রূপে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এখান থেকেই সূত্রপাত হয় ইরানীয়দের প্রাক্ ইসলামী বিষয়-নিবিষ্ট দর্শনচিন্তার বদলে বিষয়ীগত বা প্রত্যক্ চিন্তারীতির—যা পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করতে থাকে। আমার মনে হয়, বিশেষ করে এই বৈদেশিক চিন্তার প্রভাবেই অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এদের পুরোণো অদ্বৈতবাদের যখন পুনরাবির্ভাব ঘটে, তখন তা আসে নবলব্ধ আধ্যাত্মিকতার আলোকে অনেকখানি বিশোধিত হয়ে। এই অদ্বৈতবাদই ক্রমবিকাশের ফলে ইরানীয়দের আলোক-অন্ধকার সমন্বিত দ্বিত্ববাদের পুনরুজ্জীবন ঘটায় এবং তাকে নবতর আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। আমরা বলেছি যে গ্রীক্ চিন্তাধারা ইরানের সুনিপুণ বুদ্ধিবৃত্তিকে নোতুনভাবে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়; ইরানীয় দর্শন প্রগতির মূলে ইন্ধন যোগাবার পথে তা দেহে মনে এ ধারার মধ্যে শেষতক্ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। অতএব কিছু খানি পুনরাবৃত্তিদোষ স্বীকার করেও এবং খাঁটি ইরানী চিন্তাধারার ইতিহাসে প্রসঙ্গটি অপরিহার্য না হয়ে থাকলেও ইরানীয় 'নিও প্লেটনীয়'দের মতবাদের কথঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে গ্রীক্ জ্ঞানধারা মুসলিম প্রাচ্যের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল হারান ও সীরিয়া হয়ে। সীরিয়াবাসীরাই গ্রীক্-দের সর্বাধুনিক দর্শন পদ্ধতি 'নিও-প্লেটনিসম্' প্রথমে আয়ত্ব করে তৎকালীন মুসলিম জগতের দিকে চালিয়ে দেয়। তারা অবশ্য এ পদ্ধতিকেই বিশ্বাস

করতো প্রকৃত আরস্ত (Aristotle)-দর্শন বলে। এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার যে আরবী ও ইরানী মুসলিম দার্শনিকেরা অনেক দিন ধরেই আরস্ত ও আফলাতুন (Plato)-এর খাঁটি দর্শন পদ্ধতি কি—তা নিয়ে তীব্র তর্ক ও বাদানুবাদে সময়ক্ষেপ করেন, কিন্তু তাঁদের কেউই চিন্তা করে দেখেন নি যে এক্ষেত্রে খাঁটি জিনিষের সন্ধান পেতে হলে এবং তার বিশদ বিবরণ জানতে হলে তাঁদের জন্যে বিশেষ দরকার ছিল গ্রীক ভাষার সাথে পরিচিত হবার। এ ব্যাপারে তাঁদের অজ্ঞতা এমন প্রকাণ্ড ছিল যে প্লটিনাস-কৃত Enneads-এর একটা সংক্ষিপ্ত অনুবাদকে তাঁরা আরস্তর 'ধর্মতত্ব' বলে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রীক-দর্শনের দুই দিকপাল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণায় আসতে তাঁদের শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গিয়েছিল। তবুও সন্দেহ হয় যে শেষ তক্ তাঁরা এঁদেরকে এবং এঁদের মতবাদকে আলাদা ভাবে চিনে নিতে পুরোপুরি সক্ষম হন নি। ইবনে সীনা (Avicenna) অবশ্য আল্ ফারাবী ও ইবনে মস্কাওয়াইহ্ থেকে স্বচ্ছতর জ্ঞান রাখতেন এবং মৌলিক চিন্তার দিক দিয়েও তিনি অগ্রণী ছিলেন। আন্দালুসীয় আবু রুশদ (Averroes) তাঁর পূর্ব-সূরীদের চেয়ে অধিকতর আরস্ত অনুসারী ছিলেন বটে; কিন্তু তবুও তিনি আরস্ত দর্শনের পুরোপুরি অনুধাবনে সক্ষম হন নি। অবশ্য হীন অনুকরণ প্রবৃত্তি দোষ তাঁদের দেওয়া যায় না। অনুবাদকদের কল্যাণে গ্রীকদর্শন যে ভাবে অদ্ভুত ও অসঙ্গতিপূর্ণ রূপ নিয়ে তাঁদের সামনে প্রতিভাত হয়েছিল, তার মধ্য থেকে এর সঙ্গত ও মার্জিত রূপ আবিষ্কার করবার অন্তহীন প্রয়াসেই তাঁদের সাধনাময় জীবন কেটে যায়। বলতে গেলে, আরস্ত ও আফলাতুন এর প্রতিষ্ঠিত তথ্যাবলী তাঁদেরকে পুনরাবিষ্কার করতে হয়েছিল। তাঁদের ভাষ্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে এ সব ব্যাখ্যার চেয়ে বরং নোতুন আবিষ্কৃতির পর্যায়ে পড়ে। যে দুরবস্থায় তাঁরা পড়েছিলেন, তাতে তাঁদের পক্ষে নোতুন ভাবে চিন্তা করে জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবার অবকাশ ছিল না। তাঁদের বিচক্ষণ মনোবৃত্তির পক্ষে এ একটি ভাগ্যের পরিহাস বই আর কিছু নয়। কিন্তু এই পর্বত প্রমাণ আগাছা ও জঞ্জাল ঘেঁটেও আজীবন ধৈর্য ও সাধনার বলে

তাঁরা সত্যকে পুনরাবিষ্কার করতে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেছেন—এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ক'টি কথা বলে, এখন আমরা গ্রীক্ দর্শনের ইরানীয় অনুসারীদের কয়েকজনের বিষয় উল্লেখ করবো।

(১) ইবনে মসকাওয়াইহ্ (মৃত্যু ঃ ১০৩০ খৃষ্টাব্দ)

প্রসঙ্গতঃ সারাখ্‌সী, ফারাবী এবং চিকিৎসাবিদ রাযী র নাম এসে পড়ে।[১] সারাখ্‌সী (মৃত্যু ঃ ৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) আরবীয় দার্শনিক আল্‌কিন্দীর শিষ্য ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর কোনো পুস্তক আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। ফারাবী ছিলেন তুর্কবংশ সম্ভূত। তাঁর দর্শনতত্ত্ব এখানে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। রাযী (মৃত্যু ঃ ৯৩২ খৃষ্টাব্দ) র চিন্তাধারা ছিল খাঁটি ইরানীয়। তিনি আলোককেই মনে করতেন প্রথম সৃষ্টবস্তু বলে এবং বস্তু, স্থিতি ও কালকে মনে করতেন চিরন্তন বলে। এর পর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আবু আলী মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে ইয়াকুব এর প্রসঙ্গে আসা যায়। সাধারণতঃ তিনি পরিচিত ছিলেন ইবনে মস্‌কাওয়াইহ্ নামে। তিনি বুওয়াইহী সুলতান আদাদুদ্দৌলার খাজাঞ্চী ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন তখনকার দিনের একজন প্রসিদ্ধতম আস্তিক্যবাদী চিন্তানেতা, চিকিৎসক এবং নীতিবাগীশ। ইরানের ইতিহাসপ্রণেতা হিসেবেও তিনি যশস্বী ছিলেন। তাঁর বৈরুৎ-এ প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ফৌযুল আসঘর' অবলম্বনে তাঁর দর্শন পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো।

(ক) আদিকারণ (Ultimate Principle)-এর অস্তিত্ব

ইবনে মস্‌কাওয়াইহ্ এ ক্ষেত্রে আরস্তর অনুসারী; আরস্তর 'বস্তুর গতিশীলতা'—যুক্তি থেকেই তিনি আরম্ভ করেছেন। বস্তুর সর্বপ্রকার পরিবর্তন সূচিত হয় তার গতিশীলতা থেকে। এ গতিশীলতা-ধর্ম থেকে বস্তুকে পৃথক করে দেখা যায় না; কিন্তু এ ধর্ম বস্তুর অন্তর্নিহিত নয়। অতএব গতি হলো বাইরে থেকে আরোপিত একটা কারসাজি। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে যে বস্তুর অন্তঃপ্রকৃতির বাইরে কোনো একটি শক্তি আছে, যা তাকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কর্মনিরত রাখে। অন্য

কথায়—এ হলো আদিকারণ। গতিকে বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম বলে মনে করা যায় না; কেন না, তা বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মানুষের যথেচ্ছ চলা ফেরার স্বাধীনতা রয়েছে; কিন্তু এ ধারণা থেকে মনে করা চলে না যে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যথেচ্ছ চলাফেরার ক্ষমতা অব্যাহত থাকবে। অতএব যে কারণে বস্তু গতিশীলতা লাভ করে, সে কারণের পরিবর্তনের সাথে সাথে বস্তুর গতিশীলতাও থেমে যাবে বা পরিবর্তিত হবে। এই কারণের মূল হলো আদি কারণঃ যে নিজে অনড় থেকে অন্য সব বস্তুতে গতি দেয়। আদি কারণের এই নিশ্চলতা অপরিহার্য; কেন না, আদি কারণে গতিশীলতা কল্পনা করা হলে গতির আরম্ভ সম্পর্কীয় প্রশ্নের মীমাংসায় আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এতে কারণ পরম্পরার অন্তহীনভাবে পশ্চাদ্ধাবনের প্রশ্ন (question of infinite regress) উঠে, যা কল্পনাতীত।

এই স্থিতিশীল গতিদাতা যদি একাধিক হয়ে থাকে, তবে তাদের মধ্যে এমন কোনো প্রকৃতিগত মিল থাকা চাই, যাতে তাদেরকে এক শ্রেণীতে দাঁড় করানো যায়। আবার তাদের মধ্যে এমন কিছু পারস্পরিক বৈচিত্র্য-ও থাকা চাই, যাতে তাদের এককে অন্যের থেকে পৃথক ভাবে চিন্‌তে পারা যায়। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন আদি কারণ সমূহের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর মধ্যে উপরিউক্ত আংশিক মিল ও আংশিক গরমিল সমূহের সংমিশ্রণ। কিন্তু তা হতে পারে না, যেহেতু এই সংযোগও হলো গতিশীলতারই একটী রূপ এবং গতিশীলতা আদি কারণে অন্তর্নিহিত নয়।

আবার আদি কারণ হলো চিরন্তন ও নিরবয়ব। যেহেতু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা গতিশীলতারই অন্যতম রূপ এবং যেহেতু বস্তু সব সময়ই গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অতএব যা কিছুই নশ্বর এবং যে কোনো প্রকারেই হোক বস্তুর সাথে সম্পর্কিত—তাকে গতিমান থাকতেই হবে।

(খ) পরমতমের পরিচিতি

সর্বপ্রকার মানবীয় জ্ঞানের আরম্ভ হলো অনুভূতি থেকে। এই অনুভূতি ক্রমশঃ উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করে জ্ঞানকে

দৃঢ়তর করে তোলে। বুদ্ধিবৃত্তির প্রাথমিক বিকাশ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেঃ বাহ্যিক দৃশ্যাবলীর উপর। কিন্তু জ্ঞানের বিকাশের অর্থ হলো ক্রমশ বস্তুকে অতিক্রম করে চিন্তা করবার ক্ষমতা অর্জন। চিন্তার আরম্ভ বস্তু থেকে; কিন্তু তার উদ্দেশ্য হলো এই প্রাথমিক অবস্থা থেকে নিজেকে পর্যায়ক্রমে মুক্ত করে নেওয়া। চিন্তার উচ্চতর স্তরে তা হলে এমন একটী অবস্থার কল্পনা করা যায় যখন কোনো বস্তুর বাহ্যিক অভিব্যক্তি বা অস্তিত্বের সাথে সম্পর্ক না রেখেও সেই বস্তুটীকে মনে মনে ধারণা করা যেতে পারে। এভাবে চিন্তাশক্তির আরও উচ্চগ্রামে মনের শক্তি জন্মে বস্তুজগত থেকে ধারণা বা প্রতীতিতে উপনীত হওয়ার। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে এ প্রতীতি যেসব উপলব্ধির যোগ বিয়োগ ও পর্যালোচনার ফল, সে সবেরও মূলে রয়েছে কতকগুলি প্রাথমিক অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা—যার মূলে আবার রয়েছে বস্তুর অস্তিত্ব। অতএব কিছুই সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে না। কিন্তু প্রতীতি যদিও উপলব্ধি থেকে আসে, তবু এ দু'য়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য কখনো ভুলবার মতো নয়। ব্যক্তি (অনুভূতি) প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের অধীন; তা'তে অনুভূতি সঞ্জাত জ্ঞানের মূলও অনবরতঃ কম্পমান। অতএব ব্যক্তিগত জ্ঞানে চিরন্তনতা আরোপ করা চলে না। অন্যপক্ষে বিশ্বজনীনতা (প্রতীতি)-র উপর পরিবর্তনশীলতার আইন অপ্রযোজ্য। ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল; বিশ্বজনীনত্ব অপরিবর্তনীয়। বস্তুর ধর্মই হলো পরিবর্তনের কাছে আত্মসমর্পন; যে যত বেশী বস্তু বন্ধন থেকে মুক্ত, সে তত বেশী পরিবর্তনের আওতার অতীত। আল্লাহ্ বস্তুবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; অতএব তিনি সম্পূর্ণরূপে চিরন্তন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই পরিপূর্ণ বস্তুবন্ধন-নিরপেক্ষতার জন্যেই তাঁকে প্রতীতিতে আনা আমাদের জন্যে কঠিন, এমন কি, অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বপ্রকার দার্শনিক চিন্তার উদ্দেশ্য হলো, মনকে এমন ভাবে গড়ে তোলা যা তে সে বাহ্যিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতীতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং উত্তরোত্তর সাধনায় একদিন সম্পূর্ণ বস্তুবন্ধন নিরপেক্ষ আদি প্রতীতির ধারণা করতেও সক্ষম হয়।

(গ) এক থেকে বহু

এ প্রসঙ্গে ইব্‌নে মস্‌কাওয়াইহ্‌-এর সিদ্ধান্ত ভাল করে বুঝতে হলে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ—তাঁর মতে আদিকরণ বা আদিস্রষ্টা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন কোনো উপাদান ব্যতিরেকে (out of nothing)।

তিনি বলেন, বস্তুবাদীরা মনে করে যে বস্তু অবিনশ্বর এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম আকার-মূলক। একথা অবশ্য স্বীকৃত যে বস্তু যখন এক আকার থেকে অন্য আকারে রূপান্তরিত হয়, তখন তার পূর্বেকার আকারের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কেননা এই পূর্বেকার আকার যদি অন্তর্হিত না হয়, তবে তা নিশ্চয়ই অন্য কোনো বস্তুতে চলে যায় বা সে বস্তুতেই থেকে যায়। প্রথম ধারণা প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার বিপরীত। একটি মোমের গোলককে যদি একটি বর্গাকার বস্তুতে রূপান্তরিত করা হয়, তা হলে আপনি বলতে পারেন না যে তার পূর্বেকার গোলকাকৃতি অন্য কোনো বস্তুতে চলে গেছে। দ্বিতীয় ধারণাটীও অসম্ভাব্য। কেন না, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে একই বস্তু একাধারে বৃত্তাকার ও যদর্ঘ্যাকার—যা অসম্ভব। অতএব স্বীকার করতে হবে যে কোনো বস্তু যখন অন্য বস্তুতে পরিণত হয়, তখন তার পূর্ব অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। এ সূত্র থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য যে আকার, বর্ণ ইত্যাদি রূপগুণের আবির্ভাব হয় সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব (pure nothing) থেকে। এখন বস্তুও যে এ সব গুণাবলীর মতো নশ্বর, তা বুঝতে হলে নিম্নের দুইটী সূত্র অনুধাবন করতে হবে ঃ—

(অ) বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা কয়েকটী মৌলিক পদার্থের সমাবেশ। কিন্তু এসব মৌলিক পদার্থের বৈচিত্র্য একটীই সরল পদার্থের বিভিন্নরূপ মাত্র।

(আ) আকার এবং বস্তু অবিচ্ছেদ্য; কিন্তু বস্তুর পরিবর্তনের দ্বারা আকারের বিলুপ্তিকরণ সম্ভব নয়।

এই দুই সূত্র থেকে ইব্‌নে মস্‌কাওয়াইহ্‌ সিদ্ধান্ত করেন যে বস্তুর আরম্ভ হয় কালের গর্ভে। বস্তু এবং আকার দুইই কোনো এক সময় থেকে আবির্ভূত হয়; কেন না, বস্তুকে অবিনশ্বর মনে করলে আকারকে তাই মনে করতে হয়। কিন্তু আমরা দেখলাম যে তা নয়।

দ্বিতীয়তঃ—সৃষ্টিপর্যায়ের কথা।

বিশ্ব প্রকৃতিতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এই সীমাহীন বৈচিত্র্যের কারণ কি? একক স্রষ্টার সৃষ্টি এত বিভিন্ন কেন? তাঁর মতে, একই কারণ যখন বিভিন্ন ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন নিম্নবর্ণিত কোনো-না-কোনো সূত্রের উপর এসব ক্রিয়ার বৈচিত্র্য নির্ভর করছে ঃ—

(অ) কারণের শক্তি বিভিন্ন হতে পারে।

উদাহরণতঃ, মানুষকে মনে করা যেতে পারে বিভিন্ন উপাদান ও শক্তির সমাবেশরূপে। অতএব এক মানুষ নানারূপ ক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম।

(আ) একই কারণ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে বিভিন্ন ক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

(ই) একই কারণ বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করতে পারে।

আদি-কারণ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে এ সব যুক্তির কোনোটিই খাটে না। তিনি যে বিভিন্ন পৃথক পৃথক ক্ষমতার অধিকারী, তা হতে পারে না; কেন না, তাঁর প্রকৃতি যৌগিক নয়। যদি মনে করা হয় যে তিনি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে এ সব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন, তবে প্রশ্ন উঠে ঃ এ সব বিভিন্ন উপায়ের সৃষ্টিকর্তা কে? তৃতীয় সূত্রটীও সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে টেকে না। এক কারণের আধার থেকে বা তাঁর ধর্ম থেকে নানারূপ ফল দেখা দিতে পারে না। অতএব এখন আমাদের সামনে একটী মাত্র পথ খোলা রইলো—যে, আদিকারণ মাত্র একটী বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তার থেকে অন্যটীর সৃষ্টি হয়েছে। ইবনে মস্‌কাওয়াইহ্‌ এখানে 'নিও-প্লেটনীয়' নির্গমন তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌ একটি মাত্র প্রাক্‌-আদিম বাষ্পীয় বস্তু (emanation) সৃষ্টি করে ছিলেন, যা ক্রমশঃ ঘন হতে হতে আদিম বস্তু (primordial element)-র

রূপ পরিগ্রহ করে, এবং তার বিভিন্ন পরিমাণ ও রূপের পরস্পর সংযোগে বিশ্ব প্রকৃতির অন্যান্য উন্নততর বস্তু ও প্রাণীর অভ্যুদয় ঘটে। শিবলী[২] নিম্নলিখিতরূপে ইবনে মস্‌কাওয়াইহ্‌র ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"আদিম বস্তুসমূহের মিশ্রণে প্রথমে খনিজ জগতের সৃষ্টি হয়। এইটিই জীবনের নিম্নতম স্তর। উদ্ভিদ্‌ জগত হলো ক্রমবিকাশের পথে এর উন্নততর স্তর। প্রথমে আপনা থেকে দেখা দিল তৃণাদি, তারপর লতাগুল্ম ও নানা-প্রকার বৃক্ষাদি। এদের কেউ কেউ প্রাণীজগতের নিকট-প্রতিবেশী। এদের কোনো কোনো হালচাল প্রাণীজগতের স্বভাবের অনুরূপ। উদ্ভিদ্‌জগত ও প্রাণীজগতের মধ্যে আর এক প্রকার জীবনের অভিব্যক্তি আছে—যা প্রাণীও নয় উদ্ভিদও নয়, অথচ দুজনারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যবাহী ; যেমন প্রবাল। জীবনের এই মাধ্যমিক পর্যায়ের অব্যবহিত পরেই যারা রয়েছে, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীলতা এবং স্পর্শবোধ—যা দেখা যায় পৃথিবীপৃষ্ঠের আদিম শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার কীট জগতে। এই স্পর্শবোধ থেকে এরা বিভিন্ন বস্তুর পার্থক্য বুঝতে পারে এবং ক্রমশঃ অন্যান্যরূপ বোধ শক্তি আয়ত্ব করে। তারপর থেকে বুদ্ধি বৃত্তির প্রথম উন্মেষ শুরু হয়। এর পর থেকে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ উৎকর্ষের পথে চলতে থাকে। মানুষের সাদৃশ্য রয়েছে লাঙ্গুলহীন বানরের সাথে ; এরা ক্রমশঃ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখলো এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে প্রায় মানুষের পর্যায়ে এলো। এখানে পশুত্বের ইতি এবং মনুষ্যত্বের আরম্ভ।"

(ঘ) আত্মা

আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে কিনা—সে প্রশ্নের মীমাংসায় আসবার আগে আমাদের মানবীয় জ্ঞানবত্তার প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে। বস্তুর অপরিহার্য ধর্ম এই যে, সে একটি সময়ে দু'রকম আকার ধারণ করতে পারে না। একটি রূপার চামচকে রূপার গ্লাস-এ পরিণত করতে হলে তার চামচাকৃতিকে বিনষ্ট করতে হবেই। এ কানুন সব বস্তুর জন্যেই সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য ; কোনো বস্তুকে যদি এ কানুন না পালন করতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে

যে তা আদতে বস্তুই নয়। এখন উপলব্ধির প্রকৃতি কি? এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে মানুষ একই সাথে একাধিক বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ, মানুষের উপলব্ধিরূপ বৃত্তি একই সাথে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। অতএব যেহেতু এ বৃত্তিতে বস্তুর মৌলিকগুণের অভাব, এ বৃত্তি বস্তু হতে পারে না। একই মুহূর্তে নানারূপ বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার উপলব্ধি আত্মার অন্তর্নিহিত গুণ বা ক্ষমতার আওতাভুক্ত। অবশ্য এ কথা বলা যায় যে আত্মারূপ বৃত্তি বাস্তব মূল থেকে উৎসারিত কিম্বা বস্তুরই একটি প্রতিফলিত রূপ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বস্তু ও আত্মা যে এ ভাবে সম্পর্ক-যুক্ত নয়, তা নিম্নোদ্ধৃত যুক্তি থেকে বোঝা যাবে ঃ—

(অ) যে বস্তু বিভিন্ন আকার ও অবস্থা অবলম্বন করতে পারে, তা সে সব আকার বা অবস্থার কোনো একটি হতে পারে না। কোনো জিনিস যদি নানারূপ রং ধারণ করতে পারে, তবে তাকে মনে করতে হবে আদতে বর্ণ-হীন। আত্মা সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে যে, বিভিন্ন বস্তুর উপলব্ধিস্থলে তা বিভিন্ন আকার ও অবস্থা অবলম্বন করে; অতএব আত্মাকে সে সব আকারের একটি বলে মনে করা চলে না। সমকালীন Faculty Psychology-তত্ত্বকে ইবনে মস্‌কাওয়াইহ্‌ স্বীকৃতি দেননি; মনের বিভিন্ন অবস্থাকে তিনি আত্মারই রূপান্তরণের বিভিন্ন অবস্থা বলে মনে করেছেন।

(আ) গুণাবলী অনবরতঃ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার অতীতে এমন কোনো অপরিবর্তনশীল মৌলিক উপস্তর (Sub-stratum) রয়েছে যার উপর ব্যক্তি পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত।

এ ভাবে আত্মাকে বস্তু নিরপেক্ষ প্রমাণ করবার পর ইবনে মস্‌কাওয়াইহ্‌ সংক্ষেপতঃ নিম্নোক্ত যুক্তিরাজীবলে আত্মাকে অবস্তু মূলক বলে ঘোষণা করেছেন ঃ—

(অ) মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর ইন্দ্রিয়াবলী কোনো একটি বৃহত্তর উত্তেজনার সংস্পর্শে আসবার পর কিছু কালের জন্যে ক্ষুদ্রতর উত্তেজনাদি উপ-লব্ধি করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মানসিক বৃত্তি বা উপলব্ধির ব্যাপারে একথা খাটে না।

(আ) কোনো জটিল বা দুর্জ্ঞেয় বিষয় নিয়ে আমরা যখন ভাবতে আরম্ভ করি, তখন আমাদের চারপাশের বস্তুজগত থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেবার প্রয়াস পাই; কেন না, এ সবকে আমরা তখন আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার প্রতিবন্ধক বলে মনে করি। আত্মা যদি বস্তুমূলক হয়ে থাকতো, তবে নিজ উৎকর্ষ সাধনের পথে তাকে বস্তুজগত থেকে বিচ্ছিন্ন করবার প্রয়োজন দেখা দিতো না।

(ই) প্রবল উত্তেজনা ইন্দ্রিয়কে দুর্বল করে; এমন কি, কখনো কখনো তার ক্ষতি সাধনও করে। কিন্তু জাগতিক ধারণাবলী ও জ্ঞান সম্বন্ধে বিদ্যা বাড়বার সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

(ঈ) বার্দ্ধক্য জনিত দৈহিক দুর্বলতার ফলে মানসিক শক্তির ক্ষতি হয় না।

(উ) আত্মার পক্ষে এমন কতকগুলি ব্যাপার ধারণায় আনা সম্ভব, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীত। উদাহরণতঃ, দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার যে একই সময়ে বিরাজ করতে পারে, এ অনুভূতি ইন্দ্রিয়াদির অতীত।

(ঊ) আমাদের মধ্যে এমন একটি শক্তি বিরাজ করছে যা আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকে পরিচালিত করে, আমাদের ইন্দ্রিয়রাজির ভুল চুক্ শোধরায় এবং আমাদের জ্ঞান ও ক্ষমতাবলীর সামঞ্জস্য বিধান করে। এই সামঞ্জস্য-ধর্মী নীতি বা মিলনায়ন নীতি—যা ইন্দ্রিয়াদির মারফত আনীত জ্ঞান ও তথ্যাবলীর পর্যালোচনা করে, ইন্দ্রিয়াবলীর সাক্ষ্য বিচার করে এবং তাদের পরস্পর বিরোধী যুক্তি সমূহের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—তাকে নিশ্চয়ই বস্তুবন্ধনের উপরে অবস্থান করতে হবে।

ইব্নের মসকাওয়াইহ্ এর মতে, এসব যুক্তির একত্র সমাহারে নিঃসন্দেহে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে আত্মা মূলতঃ অ বস্তুমূলক। এই বস্তুবন্ধনমুক্ততা গুণেই আত্মা অমর; কেননা, মৃত্যুশীলতা বস্তুমূলকতারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(২) ইব্‌নে সীনা (Avicenna) (মৃত্যু ১০৩৭ খৃষ্টাব্দ)

ইরানের প্রাথমিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র আবু আলী ইব্‌নে সীনা ই একটি নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'প্রাচ্য দর্শন' এখনও রয়েছে। তা ছাড়া বিশ্ব প্রকৃতিতে প্রেমের শক্তির সার্বজনীন প্রভাব ও কার্যকারিতার সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ বর্ণনার অংশ বিশেষও আমাদের হস্তগত হয়েছে।[৩] অবশ্য এ প্রবন্ধে তাঁর মতবাদের একটি মোটামুটি পরিচিতি মাত্র রয়েছে। খুব সম্ভব, পরবর্তীকালে তিনি এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকবেন; কিন্তু তা আমাদের জানা নেই।

ইব্‌নে সীনা প্রেমের অর্থ করেছেন বিশ্বরূপের উপলব্ধি (appreciation of Beauty) বলে এবং প্রেমের এই অর্থ বা সংজ্ঞার দিক থেকে বিবেচনা করে জীব জগতকে তিনটি শ্রেণী (category)-তে বিভক্ত করেছেন। যথা :—

(ক) যে সব অস্তিত্ব পূর্ণতম বিকাশ লাভ করেছে।

(খ) যে সব অস্তিত্ব বিকাশের নিম্নতম স্তরে রয়েছে।

(গ) যে সব অস্তিত্ব এই দুই মেরুর মধ্যে রয়েছে।

কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীর কোনো বাস্তব স্থিতি (বা অস্তিত্ব) নেই; কেন না অনেক অস্তিত্ব ইতিমধ্যে পূর্ণতম বিকাশ লাভ করে ফেলেছে এবং অন্যান্যগুলি সে পথে চলমান রয়েছে। ইব্‌নে সীনার মতে, আদর্শের দিকে এই অভিযাত্রা প্রেমের সুন্দরের প্রতি প্রগতিরই নামান্তর এবং তা ও পরিপূর্ণতার শামিল। আমরা বাহ্যদৃষ্টিতে সাকারের যে ক্রমবিকাশ দেখি, তার মূলে রয়েছে প্রেমেরই প্রেরণা এবং তা থেকেই সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা, গতি ও উন্নতি সূচিত হয়। অস্তিত্বের জন্মগত প্রবণতা হলো অনস্তিত্ব থেকে মুক্তিলাভ ও বিভিন্ন আকারের মাধ্যমে নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস। চিত্তবিকাশের পূর্বেকার অবস্থায় বস্তুর অস্তিত মৃত সদৃশ; তা যখন প্রেমের অন্তর্নিহিত শক্তিবলে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে বা তাতে বিভিন্ন আকার আরোপিত হয়, তখন তাতে আমরা

দেখতে পাই সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতি। বস্তুজগতে এই মৌলিকতম শক্তির ক্রিয়াকর্ম নিম্নলিখিত রূপে প্রতিভাত ঃ—

(ক) অচেতন পদার্থে রয়েছে আকার, বস্তু ও গুণের সমাবেশ। প্রেমের রহস্যময় কর্মশক্তির ফলে গুণ্যংশ পদার্থের সামগ্রিক সত্বার সাথে মিশে থাকে এবং আকার বস্তুর মৌলিক সত্বাকে অবলম্বন করে একের পর এক উন্নততর রূপে প্রতিভাত হয়।

(খ) প্রেমরূপ শক্তির প্রবণতা হলো নিজেকে কেন্দ্রীভূত করা। উদ্ভিদ জগতে এ একটি উচ্চতর একত্ব বা কেন্দ্রায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এখানে আত্মার অভিব্যক্তির অনেক কিছু বাকী থেকে যায়, যা লভ্য হয় পরে। উদ্ভিদ আত্মার পর্যায়াবলী নিম্নরূপ ঃ—

(অ) আত্মস্থকরণ (Assimilation)

(আ) উন্নয়ন (Growth)

(ই) পুনরুৎপাদন (Reproduction)।

এ সব পর্যায় কিন্তু আসলে প্রেমের অভিব্যক্তির বিভিন্ন দিক ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মস্থকরণ আকর্ষণের এবং বাহ্যিককে আন্তরিকে রূপান্তরিত করণের নিদর্শন। উন্নয়ন হলো অস্তিত্বের বিভিন্নদিক বা অংশকে উত্তরোত্তর সামঞ্জস্যে আনয়নের কার্যক্রম। পুনরুৎপাদনে রয়েছে বংশকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা—এও প্রেমেরই এক বিশিষ্ট প্রকাশ।

(গ) জীবজগতে প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রিয়া পদ্ধতির শক্তি আরও সুপ্রকট। উদ্ভিদ জগতের বিভিন্নমুখী আত্মপ্রকাশ ক্ষমতা এর মধ্যে সমগ্র ভাবেই রক্ষিত; তদুপরি এতে হয়েছে মানস প্রকৃতির আবির্ভাব। এ হলো উন্নয়ন বা সামঞ্জস্যের পথে আর একধাপ অগ্রগতি। মানুষের বেলায় উন্নয়নের এ পর্যায়ের প্রকাশ হলো আত্মচেতনায়। এই প্রকৃতিগত বা সৃষ্টিগত প্রেম (natural or constitutional love)-রূপ শক্তি মানুষের চেয়ে উন্নততর জীবের মধ্যেও কার্যকরী। সব অস্তিত্বই প্রথমতম প্রেমাস্পদের বা চিরন্তন বিশ্বরূপ (the First Beloved—the Eternal Beauty) -এর পথে অভিসারী। এই চরমতম লক্ষ্যের নৈকট্য বা দূরত্বের পরিমাপ

থেকেই যে কোনো অস্তিত্বের প্রকৃত কদর বা নৈকট্য নিরূপিত হয়।

একজন বিচক্ষণ চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবেও ইব্‌নে সীনা আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে কুতুহলী ছিলেন। তাঁর সময়ে জীবাত্মার দেহান্তর গ্রহণ বা পুনর্জন্ম (metempsychosis)-বাদ প্রসার লাভ করছিল। স্বভাবতঃই সাধারণ মানুষের কাছে এ তত্ব দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইব্‌নে সীনা আত্মার প্রকৃতিসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে এ তত্বের অসারতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, আত্মাকে একটী সংজ্ঞার মধ্যে আনা খুব কঠিন কাজ ; কেন না, অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে এর ক্ষমতা ও প্রবণতা বিভিন্ন রূপ। আত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ নিম্নে দেখানো হলো ঃ

১। অচেতন কর্ম সূত্রে অভিব্যক্তি

(ক) উদ্ভিদ আত্মা ঃ—
- (১) আত্মস্থকরণ
- (২) উন্নয়ন
- (৩) পুনরুৎপাদন

(খ) একমুখী ক্রিয়াকর্ম এবং বিভিন্ন কর্মপ্রেরণাকে এক পর্যায়ে বা এক নীতির আওতায় আনয়ন—মনোবিকাশ বা চিন্তার স্ফূরণ ও বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ।

২। চৈতন্যমূলক কর্মের অভিব্যক্তি

(ক) একাধিক বিষয়-বস্তু লক্ষ্যে

জীব আত্মা

ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে	মানুষের ক্ষেত্রে
(অ) উপলব্ধিমূলক ক্ষমতা	(অ) উপলব্ধিমূলক ক্ষমতা
(আ) প্রেরণামূলক ক্ষমতা (যথা, আনন্দলাভ এবং বেদনা পরিহারের ইচ্ছা)	(i) পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়
	(ii) পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয়
	(১) ইন্দ্রিয় জ্ঞানকেন্দ্র বা মস্তিষ্ক (sensorium)

(২) প্রতিবিম্ব ধারণ
(৩) প্রতীতি
(৪) কল্পনা
(৫) স্মৃতি

আত্মার এই পাঁচটী অন্তরেন্দ্রিয় মানুষের বেলায় দেখা দেয় যুক্তি-বৃত্তির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ; এর ফলে মানবীয় যুক্তি ক্রমশঃ ফেরেশ্‌তা সুলভ এবং পয়গম্বর সুলভ যুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

(আ) গতিধর্মিতা—আকাঙ্ক্ষা

(খ) এক বিষয়বস্তু লক্ষ্যে—একই নিয়মে আনীত গতিসম্পন্ন অস্তিত্বরাজীর আত্মা।

ইব্‌নে সীনা তাঁর 'নফ্‌স্' (আত্মা)-সম্বন্ধে লিখিত নিবন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে আত্মার জন্যে বস্তুর সহযোগিতা আবশ্যক নয়। আত্মাকে কোনোরূপ ধারণায় বা কল্পনায় আনতে বস্তুর বা বস্তু-সঞ্জাত কোনো শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় না ; কেননা, অন্য একটি ব্যাপার ধারণা করতে যদি আত্মাকে নিজ দেহ বলে কোনো কিছুর উপর নির্ভর করতে হতো, তবে এই নিজ দেহের ধারণার বেলায়ও তাকে নিশ্চয়ই প্রথমতঃ ভিন্ন আর একটি দেহের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল ;—কিন্তু তা হলে তো এ যুক্তির আর শেষ থাকে না। অধিকন্তু আত্মা হলো আত্মচেতনাশীল অর্থাৎ নিজের মাধ্যমেই নিজের সম্বন্ধে সজাগ। অতএব নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে আত্মা মূলতঃ বস্তুর সহযোগিতা বা বস্তুর উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত। আত্মার পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব থেকে আবার আমাদের ব্যক্তিগত পূর্বজন্মে বিশ্বাস করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু আত্মা যদি দেহের অস্তিত্বের পূর্বথেকে বিরাজমান থেকে থাকে, তবে তা হয়তো এক ছিল, না হয় বহু ছিল। দেহের বহুত্ব বস্তুর আকারের বহুত্বের ফল—

এথেকে আত্মার বহুত্ব প্রমাণিত হয় না। অন্যথায়, যদি আত্মা একক-হিসেবে বিরাজ করতো, তবে তার ফল হতো এই যে ক-এর জ্ঞান বা অজ্ঞান আর খ-এর জ্ঞান বা অজ্ঞানকে বলতে হতো একই; যেহেতু ক এবং খ-এর একই আত্মা। স্পষ্টতঃ এধরণের যুক্তি আত্মার ক্ষেত্রে অচল। ইব্‌নে সীনার মতে, প্রকৃত পক্ষে দেহ ও আত্মা পরস্পর লগ্ন প্রতিবেশীর মতো; কিন্তু মূলতঃ তারা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। দেহের ধ্বংসের ফলে আত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী নয়। বিনাশ অথবা ক্ষয় যৌগিক পদার্থের ধর্ম; কিন্তু মৌলিক, অবিভাজ্য এবং আদর্শ পদার্থের বেলায় এ হতে পারে না। এ যুক্তি থেকে ইব্‌নে সীনা পূর্বজন্মবাদকে অস্বীকার করেন এবং কবরের অতীতে দেহবন্ধন মুক্ত, চেতনাযুক্ত জীবন সম্ভাবনা প্রমাণ করতে প্রয়াস পান।

উপরে ইরানীয় নিও প্লেটনীয় দার্শনিকদের সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো, এতে দেখা যাচ্ছে যে এঁদের মধ্যে একমাত্র ইব্‌নে সীনাই একটী নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালীন অগণিত শিষ্যদের মধ্যে বাহ্‌মন্‌ ইয়ার, আবুল মামুন ইস্‌পাহানী, মা'সুমী, আবুল আব্বাস, ইব্‌নে তাহির—প্রমুখের নাম করা যায়; কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে আলাদা করে কিছু বলবার নেই। ইব্‌নে সীনার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত প্রগাঢ় ও সর্বগ্রাসী ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর অনেককাল পরে পর্যন্ত কোনো পরবর্তী দার্শনিক কোনো নোতুন কথা বলতে পারেন নি। তাঁরা যা ই বলেছেন, তা ইব্‌নে সীনার কথা দিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে; তার বেশী বা কম কোনোদিকে যাওয়া তখনকার জন্যে অমার্জনীয় অপরাধের শামিল ছিল। আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ-মূলক পুরাতন ইরানীয় মতবাদ এখানকার নিও প্লেটনীয় দলের উপর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বলতে গেলে, তাঁরা কিছুদিনের জন্যে গ্রীক্‌ দর্শন থেকে ঋণ-স্বরূপ একটী জীবন কালের পত্তন করেন; কিন্তু সে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় স্বাভাবিক গতিতে এবং এ বিশিষ্ট ধারাও যথাকালে সাধারণ ইরানীয় কল্পনা প্রবাহের প্রশান্ত ধারায় মিশে পড়ে। অতএব যোরো'প্রীয়

আমলের প্রথম দিকে যে অদ্বৈতবাদের অভ্যুদয় হয়েছিল, তার সাথে এই নিও প্লেটনীয় ভাবধারারার সংযোগে ইরানীয় নিজস্ব দর্শন পদ্ধতির যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, এই বহিরাগত আন্দোলনের – তা-ই –এক্ষেত্রের বিশিষ্ট অবদান। তারপর ইস্‌লামের ধর্মীয় বাদানুবাদের ফলে এ ধারা কিছু-কালের জন্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকলেও, একে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীকালে এর প্রভাব ইরানের সমগ্র অতীত চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে বহুগুণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

পাদটীকাবলী

(১) Dr. Boer তাঁর Philosophy of Islam—গ্রন্থে আল্ ফারাবী ও ইবনে সীনার দর্শন পদ্ধতির একটী পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু ইব্‌নে মস্‌কাওয়াইহ্‌-এর সম্পর্কে তাঁর আলোচনা মাত্র উক্ত দার্শনিকের নীতিশাস্ত্রীয় তত্ত্বালোচনায় সীমাবদ্ধ। তাঁর প্রজ্ঞানশাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সন্নিবেশ নিঃসন্দেহে আল্ ফারাবীর পদ্ধতির চেয়ে উন্নততর। ইব্‌নে সীনার নিও-প্লেটনীয় পদ্ধতির পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। নিজ দেশীয় দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী উল্লেখ অন্যত্র করেছি।

(২) মওলানা শিব্‌লী কৃত ইল্‌মুল কালাম, ১৪১ পৃঃ (হায়দরাবাদ)।

(৩) বৃটিশ্ মিউযিয়ম্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত N. A. F. Mehren-সম্পাদিত The Collective Works of Avicenna (Leiden 1894)-য় এ অধ্যায় রয়েছে।

— —

তৃতীয় অধ্যায়

ইস্‌লামে যুক্তিবাদের উত্থান ও পতন

(১) যুক্তিবাদের দার্শনিক ভিত্তি—বস্তুবাদ

নোতুন রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার পর ইরানীয় মন আবার নিজের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে অধিক বিলম্ব করে নি। এর ফলে দেখা দেয় বিষয় নিবিষ্ট জগত থেকে তার ক্রম অন্তর্ধান এবং মানসিক যাত্রাপথে লব্ধ ঐশ্বর্যের চর্চায় আত্ম-নিয়োগ। গ্রীক চিন্তাধারার সাথে গভীর পরিচয়ের ফলে বাস্তব সম্বন্ধে একান্ত সঙ্কুচিত গূঢ় চেতনা আবার বলিয়ান হয়ে দেখা দেয়। এখন এই অন্তর্চেতনাই চিন্তার ক্ষেত্রে এবং সত্য নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রধান বক্তার আসন গ্রহণ করলো। স্বানুভব দৃষ্টিভঙ্গি এখন ক্রমশঃ শক্তিমান হয়ে বাহ্যিক শাসন ব্যবস্থাকে অস্বীকার ও পদচ্যুত করবার প্রয়াস পেলো। জাতীয় মনো-বিকাশের ইতিহাস এহেন অধ্যায়ে যখন উপনীত হয়, তখনই দেখা দেয় যুক্তিবাদ, সংশয়বাদ, মরমীবাদ, পাষণ্ডমতবাদ (ঐতিহ্যাতীত চিন্তাপ্রগতি) ইত্যাদি। মানব মন এ সময়ে অন্তর ঐশ্বর্যের প্ররোচনায় সত্য পরিমাপের বহিরারোপিত তুলাদণ্ড দূরে নিক্ষেপ করে স্বমহিমায় কথা বলতে শুরু করে। আমাদের বক্ষ্যমান অধ্যায়ে এরই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

উম্মীয় শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যে যে নোতুন ভাবধারা ও কর্ম প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়, তার সাথে সামঞ্জস্য সাধনেই চিন্তানেতাদের প্রায় সমগ্র শক্তি ও আয়ুকাল ব্যয়িত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আব্বাসীয় যুগের প্রারম্ভ থেকেই গ্রীক দর্শন চর্চার সাথে সাথে আবার ইরানীয় চিন্তাধারা সর্ববাধা উল্লঙ্ঘন

করে নববলে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ইরানীয় মস্তিষ্কের এই নবতর স্ফূরণ চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনারূপে দেখা দেয়। গভীর চিন্তা ও পরিশ্রমের সাথে গ্রীক দর্শন আত্মস্থ করে এখন সে ইসলামী একেশ্বরবাদকে তীক্ষ্ণ কষ্টিপাথরে যাচাই করতে লেগে গেল। এই প্রবাহে যুক্তির ধীরমন্থর ও নির্জনতাভিসারী পায়ের তলা থেকে মাটি ভেসে গেল; এ অপূর্ব উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মতত্ত্ব দর্শনের ভাষায় কথা বলতে লাগলো। প্রবল বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে এই ধর্মঘেঁষা দর্শন শাস্ত্রই আত্মনিয়োগ করলো জগত ও জীবনের অস্তিত্ব ও প্রগতি সম্পর্কে নানারূপ তত্ত্ব খাড়া করতে এবং অবশেষে সে সব তত্ত্বের মধ্যে মিল আনতে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রসিদ্ধ ধর্মবিদ্ হাসান আল্‌বস্‌রীর খ্যাতনামা ইরানী শিষ্য ওয়াসিল ইব্‌নে আতা মু'তাযিলা মতবাদের প্রবর্তন করেন। ইসলামী যুক্তিবাদের এইই প্রথম বলিষ্ঠ ধাপ। এই অত্যাশ্চর্য মতবাদ ইরানের বিশিষ্টতম চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেককে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করে এবং শেষ পর্যন্ত বাগদাদ ও বসরার সুবিস্তীর্ণ প্রাজ্ঞানিক তর্কবিতর্কের বুকে নিঃশেষিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ বসরা নগরী প্রথমতঃ তার বাণিজ্যিক কর্মোদ্যমের ফলেই তৎকালীন সংস্কৃতিশীল বিশ্বের বিভিন্ন চিন্তাধারার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে গ্রীকদর্শন, সংশয়বাদ, খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধ মতাবলী, মানীয় পন্থা (Manichaeism)[১]— সব রকম মতবাদই সর্বত্র চর্চিত হতে থাকে এবং এ ভাবে বস্‌রা একদিকে তৎকালীন সন্ধানী মনের তীর্থক্ষেত্রে এবং অন্যদিকে মুস্‌লিম যুক্তিবাদের মূল উৎসে পরিণত হয়। স্পিটা (Spitta)-বর্ণিত 'মুসলিম সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সীরিয় অধ্যায়'এ প্রাজ্ঞানিক চর্চার অধিক গুরুত্ব দেখা দেয়নি। কিন্তু ইরানীয় যুগের আরম্ভ থেকে গ্রীক দর্শনের মুসলিম ছাত্রদল নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে এবং মু'তাযিলা চিন্তাবিদেরা[২] ধীরে ধীরে প্রজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা এ প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মু'তাযিলা কালাম-শাস্ত্রের ইতিহাস অনুধাবন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইস্‌লাম আশ্রিত মু'তাযিলাবাদের

প্রাজ্ঞানিক তাৎপর্যের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। অতএব এই অভিনব যুক্তিবাদের আলোকে আল্লাহ্ এবং বস্তুর অস্তিত্ব ও ধরণ-ধারণ সম্পর্কে আলোচনাই আমাদের কাম্য।

সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘব্যাপী তর্কসূত্র অনুসরণ করে মু'তাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে যে বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তাতেই তাঁদের সাথে গোঁড়া শাস্ত্রানুসারী মুসলিমদের মৌলিক মতভেদ রয়েছে। এ ছাড়াও দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষাতীত মতভেদ আরও অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে। মু'তাযিলা মতে, আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁতে অন্তর্নিহিতভাবে অবস্থিত বলা চলে না; বরঞ্চ তাঁর গুণাবলী তাঁর প্রকৃতিরই মৌলিক উপাদান স্বরূপ। অতএব মু'তাযিলারা ঐশী গুণাবলীর আলাদা বাস্তবতা অস্বীকার করেন এবং এ সবকে নিরালম্ব ঐশী নীতি (Abstract Divine Principle)-র সাথে অনন্য অস্তিত্বশীল বলে ঘোষণা করেন। আবুল হুযায়ল বলেন 'যেহেতু আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং জীবন্ত, সেহেতু তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা ও সজীবতা মূলগত,—অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য (যা'তিয়াহ্)[৩]। আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ একত্ব ব্যাখ্যা করতে যেয়ে জোসেফ্ আল্‌বসীর[৪] নিম্নোক্ত পাঁচটি সূত্র লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ-

(১) পরমাণু ও দৈবের যোগাযোগের আবশ্যকতা

(২) একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের আবশ্যকতা

(৩) আল্লাহ্র বিভিন্ন অবস্থা (আহ্ওয়াল)-র অস্তিত্বের আবশ্যকতা

(৪) যে সব গুণাবলী (বা অবস্থাবলী) আল্লাহ্র অযোগ্য, সে গুলিকে পরিত্যাগ করা, এবং

(৫) আল্লাহ্র গুণাবলীর বিভিন্নতা সত্বেও তাঁর একত্ব।

আল্লাহ্র একত্বের এই ধারণা পরে পরে নানা ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মু'আম্মর ও আবু হাশিম এর হাতে তা এমন রূপ লাভ করে যে তখন তাকে একটি বাস্তব অবলম্বন বর্জিত সম্ভাবনার পর্যায়ে ফেলা চলে এবং তার উপর নির্ভর করে অধিক এগিয়ে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মু'আম্মর-এর মতে, আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করে আমরা দাঁড়াতে

পারি না ; [৫] কেন না, তাঁর জ্ঞান তাঁরই ভিতরকার কোনো ব্যাপার। প্রথম দৃষ্টিতে বিষয় এবং বিষয়ীকে অভিন্ন মনে করতে হয়—যা অসম্ভব। আবার অন্য দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র প্রকৃতিতে দ্বিত্ব দেখা দেয়—তাও হতে পারে না। অবশ্য নায্‌যাম-এর শিষ্য আহমদ ও ফয্‌ল্‌ [৬] স্রষ্টিকর্তার এই দ্বিত্বরূপ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের মতে মূলতঃ স্রষ্টিকর্তা দু'জনঃ এক—চিরন্তন নীতি (Eternal Principle) রূপ আল্লাহ ; দুই—আল্লাহ্‌ এবং সৃষ্ট জগতের মধ্যস্থ নৈমিত্তিক নীতি (Contingent Principle) রূপ যিশুখৃষ্ট। কিন্তু আমরা পরে দেখতে পাব যে মু'আম্মর-এর দ্বিতীয় বিকল্প সূত্রে যে সত্যের আভাস রয়েছে, তা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছেন পরবর্তী ইরানীয় সুফীগণ। অতএব এ'টি পরিষ্কাররূপে দেখা যাচ্ছে যে এই যুক্তিবাদীদের কেউ কেউ নিজেদের প্রায় অজ্ঞাতসারেই পরবর্তীকালীন সর্বেশ্বরবাদ তত্ত্বের অতি কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে তাঁদের সংজ্ঞা দিয়ে শুধু নয়, বরং ঐশ্বরিক অন্য নিরপেক্ষ কানুনের কঠোর বাহ্যিকতাকে সমবেত প্রয়াসে অন্তর্মুখী মোড় দিয়েও,—তাঁরা, বলতে গেলে, সর্বেশ্বরবাদের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ প্রাজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে মু'তাযিলা পন্থীদের সবচেয়ে বড় দান হলো তাঁদের বস্তু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা—যা পরে তাঁদের প্রতিদ্বন্দী আশ্‌-আরীয়রা আল্লাহ্‌র প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজেদের ধারণার সাথে খাপ খাওয়াবার জন্যে পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন। নায্‌যাম-এর বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছিল প্রকৃতির নিয়মায়িত গতিকে সর্বপ্রকার স্থৈরবৃত্তি থেকে মুক্ত করে দেখার। [৭] আল্‌জাহিয-ও প্রকৃতিবাদের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করেই ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকৃতিমূলক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। [৮] যুক্তিবাদীরা যদিও ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির ধারণা পরিত্যাগ করতে চান নি, তবুও বিশিষ্ট প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর স্বাধীন স্ফূর্তির ক্ষেত্রে তাঁরা গভীরতর অর্থ আরোপের চেষ্টা করেছিলেন এবং এর হদিস তাঁরা প্রকৃতির মধ্যেই আবিষ্কার করেছিলেন। নায্‌যাম-এর মতে বস্তু হলো অন্তহীনভাবে বিভাজ্য ; এ-থেকে পদার্থ এবং

দৈবযোগের পার্থক্য লোপ পায়।[৯] পরমাণু বস্তু আকারে পূর্বথেকেই বিদ্যমান ছিল ; অস্তিত্ব হলো এই বস্তুর উপর ঈশ্বর আরোপিত অবস্থাবিশেষ, যার অভাবে এ ছিল উপলব্ধির অতীত। ইব্নে হাযম বলেন, অন্যতম মু'তাযিলা শয়খ্ মুহম্মদ ইব্নে উসমানের মতেঃ অনস্তিত্ব (প্রাক্-অস্তিত্বে অবস্থিত পরমাণু) এই অবস্থার নাম ; এই প্রাক্-অস্তিত্বকালে তা (পরমাণু) গতিশীলও নয়, স্থিতিশীলও নয় ; তাকে সৃষ্ট হয়েছে বলেও স্বীকার করা চলে না।[১০] তা হলে, পদার্থ হলো কতকগুলি গুণের সমষ্টি—যেমনঃ স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ—কিন্তু এ সব গুণ আসলে বস্তু সম্ভাবনার অতিরিক্ত কিছু নয়। আত্মাও একটী সুক্ষ্মতর বস্তু এবং জ্ঞানের পর্যায়াবলী মনের গতিশীলতারই অভিব্যক্তি।[১১] কোনো বস্তুর স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ "বস্তুটীর যে বিশেষ অবস্থাকে নিরিখ করা চলে" তা বস্তুটীর সম্বন্ধে ধারণার মূলকথা নয়। বস্তুরাজির সমাহাররূপ বিশ্বজগত হলো বাস্তবের একটী বাহ্যিক বা অনুভূতিগ্রাহ্য রূপ ; সর্ব প্রকার উপলব্ধির অতীতেও তা অস্তিত্বশীল থাকতে পারতো বলা চলে। অবশ্য ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়েই এ সব প্রাজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করা হয়েছিল। মু'তাযিলাপন্থীর মতে আল্লাহ্ হলেন পরম একত্বে বিরাজমান ; তাঁর মধ্যে বহুত্ব কোনো ক্রমেই আরোপিত হতে পারে না এবং বিশ্বজগতরূপ উপলব্ধিযোগ্য বহুত্বকে অবলম্বন না করেও তাঁর অস্তিত্ব বিরাজিত থাকতে পারতো।

অতএব আল্লাহ্র একমাত্র কর্তব্য হলো পরমাণুকে উপলব্ধির আওতায় আনা। পরমাণুর গুণাগুণ তার প্রকৃতিতেই রয়েছে। একটি প্রস্তরখণ্ড উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে তা যে নীচে নেমে আসে, এ গুণ পাথরের মধ্যেই রয়েছে।[১২] আল্ আত্তার বস্রী এবং বিশ্র ইব্নুল মু'তামির বলেন যে আল্লাহ্ বর্ণ, দৈর্ঘ, প্রস্থ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি সৃষ্টি করেন নি ; এ সব বিভিন্ন বস্তুরই ক্রিয়া বিশেষ।[১৩] এমন কি, বিশ্বজগতে বিরাজমান বস্তুর সংখ্যাও আল্লাহ্র জানা নেই।[১৪] বিশ্র ইব্নুল্ মু'তামির বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁর 'তাওয়াল্লুদ' বা বস্তুরাজির

পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-তত্ত্বের সাহায্যে আরও খোলাসা বর্ণনা দিয়েছেন। [১৫] এ থেকে পরিকাররূপে বুঝা যাচ্ছে যে মু'তাযিলাপন্থীরা দর্শনের দিক্ থেকে বস্তুবাদী এবং ধর্মীয় দিক্ থেকে দ্বিত্ববাদী ছিলেন।

তাঁদের দৃষ্টিতে পদার্থ এবং পরামাণু একই বস্তু। পদার্থের সংজ্ঞাস্বরূপ তাঁরা এই বলেন যে, এ একটী স্থান দখলকারী (space filling) পরমাণু, যা এই স্থান দখলকরণ-গুণ ছাড়াও, তাকে বাস্তবায়িত করবার মৌলিকগুণ-স্বরূপ দিক, শক্তি এবং অস্তিত্ব লাভ করেছে। আকারে এ চতুর্ভূজের মতো ; কেন না, বৃত্তাকার হলে এক পরমাণুর সাথে অন্য পরমাণুর সংযোগ ঘটতে পারতো না। [১৬] অবশ্য পরমাণুর প্রকৃতি নিয়ে এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সুতীব্র মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। এঁদের কারো কারো মতে সব পরমাণুই একপ্রকার, ; কিন্তু আবুল কাসিম বল্‌খী মনে করেন যে, কোনো কোনো পরমাণু এক প্রকার, আবার কোনো কোনোগুলি ভিন্ন প্রকার। আমরা যখন বলি যে কোনো একটি জিনিষ অন্য একটি জিনিষের মতো, তখন অবশ্য এ কথা বোঝানো হয় না যে এ দু'টি বস্তুর সর্ব গুণাগুণই অবশ্যই এক প্রকার। আবুল কাসিম পরমাণুর চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধেও নয্‌যাম থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পরমাণুর কালগর্ভে জন্ম হয়েছে সত্য ; কিন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যায় না। তাঁর মতে, 'বক্কা' বা অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা প্রকৃতপক্ষে বস্তুকে অস্তিত্বাতীত কোনো গুণে ভূষিত করে না ; অন্য কথায়, অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা বা নিরবচ্ছিন্নতা কোনো একটি অতিরিক্ত গুণ বা অবস্থা মোটেই নয়। ঐশীকর্ম পরমাণু সৃষ্টি করেন এবং তা করবার সাথে সাথেই তাকে নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব দান করেন। আবুল কাসিম অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, কোনো কোনো পরমাণু নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের জন্যে সৃষ্ট হয়নি। তিনি বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে ফাঁকা জায়গার অবস্থিতিও অস্বীকার করেন এবং তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে যেয়ে এ মত প্রকাশ করেন যে, পরমাণুর মৌলিকসত্বা (মা'হিয়াত্) অনস্তিত্বের অবস্থায় মৌলিক সত্বারূপে থাকতে পারতো না।

অন্যথায় যুক্তির পরস্পর বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মৌলিক-সত্বা—যা কিনা অস্তিত্বশীল বলেই মৌলিকসত্বা বটে—অস্তিত্বহীন অবস্থায়ও মৌলিকসত্বারূপে বিরাজ করতে পারে, এ কথা বললে বলতে হয় যে, একটি অস্তিত্বশীল বস্তু অস্তিত্বহীন অবস্থাতেই অস্তিত্বশীল থাকলো। স্পষ্টতঃ, আবুল কাসিম এখানে আশ্‌আরীর জ্ঞানতত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, যা পরবর্তীকালে মু'তাযিলাপন্থীদের বস্তুতত্বের উপর প্রচণ্ডতম আঘাত হানে।

(২) সমকালীন চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি

এ যুগে ইসলামী ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারা বিশালাকার ধারণ করেছিল। মু'তাযিলাবাদের চরমতম উন্নতি সাধনের সাথে সাথে ইসলামী চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি স্পষ্টরূপ লাভ করে চলেছিল। এ সবের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক ঃ—

(ক) সংশয়বাদ—বিশুদ্ধ যুক্তিতর্কের পথে জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিথেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাবার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ দেখা দেয় সংশয়বাদ-প্রবণতা। ইবনে আস্‌রাস ও আল্‌জাহিয্‌-প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিরা বাহ্যত মু'তাযিলাবাদী দলভুক্ত থাকলেও আসলে ছিলেন সংশয়বাদী। আল্‌-জাহিয্‌-এর ঝোঁক ছিল আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত অস্তিত্বে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করেও প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের প্রতি মোটামুটি অবিশ্বাস এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে ঐশীশক্তির আরোপ ;[১৭] তাঁকে পেশাগত ধর্মব্যাখ্যাতা মনে না করে বরং সেকালের একজন সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ মনে করে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসহ। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের চুলচেরা প্রাজ্ঞানিক বিতর্কের প্রতিও বিরক্তিভাব দেখাতেন ; বরং তিনি মনে করতেন যে, যে সব অজ্ঞ জনসাধারণ ধর্মের মূল কাঠামোর অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটনে অক্ষম, তাদের জন্যে প্রয়োজন প্রচলিত ধর্মের আওতাকে প্রসারিত করে তাতে তাদের নিশ্চিন্ত অবস্থানের ব্যবস্থা করা।

(খ) মরমীবাদ বা সূফিবাদ—এর মর্মকথা হলো ঃ সত্য মানবীয় অপরিপক্ক জ্ঞান বা বিতর্কের অতীত। তাকে পেতে হয় উচ্চতর জ্ঞানের

আধার থেকে অনুভূতির মাধ্যমে। সুফিবাদ প্রথমে সুগ্রথিত করে দাঁড় করান যুন্নূন। আশ্‌আরীয়দের নিরেট তত্ত্বকঠোর বাহ্যিকতার পথে না যেয়ে এ ক্রমশঃ মনের গভীরতর স্তরে পৌঁছাতে থাকে এবং পাণ্ডিত্যবিরোধী রূপ নিতে থাকে। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে সুফিতত্ব সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(গ) ইসমাইলীয়াবাদ বা কর্তৃত্বের পুনরাবির্ভাব—এ আন্দোলন ইরানীয় বৈশিষ্ট্যের একটি খাঁটি প্রতিফলন। অন্যান্য পদ্ধতির মতো এ স্বাধীন চিন্তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে বরং তার সাথে বোঝাপাড়ায় আসবার চেষ্টা করেছে। তখনকার দিনের ধর্মীয় বিতর্কজালের মধ্যে একে আপাত-দৃষ্টিতে জড়িয়ে পড়তে না দেখা গেলেও, স্বাধীন বা মুক্ত চিন্তাপন্থার সাথে এর যোগাযোগ মৌলিক। 'ইখ্‌ওয়ানুস্‌সফা' বা পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ বলে একটী প্রচারমূলক প্রতিষ্ঠানও তখন বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যরত ছিল। ইস্‌মাইলীয়াদের এদের সাথে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ছিল না; কিন্তু দু'সংঘের কার্য প্রণালীর মধ্যে সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে, মনে হয়, এদের মধ্যে কোনো গোপনীয় যোগসূত্র থেকে থাকবে। ইস্‌মাইলীয়া আন্দোলন যাঁরা শুরু করেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন, এর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হবে। এ সময়কার অবারিত বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা ও বিকাশের ফলে দার্শনিক ও ধর্মীয় জগতে যে বহুমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তার সমক্ষে আবার এই ধর্মীয় বিচারে বিপদ্‌জনক আন্দোলনের মুক্ত বিকাশ অনেকের রোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে ফিক্‌টে (Fichte) বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সংসয়বাদী পন্থায় চিন্তাভাবনা আরম্ভ করে পরে শেষ সিদ্ধান্ত স্বরূপ সর্বেশ্বর-বাদতত্বে এসে পৌঁছান। শ্লেয়ারমেকার (Schleiermacher) বলেন যুক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পন করতে। জেকোবি ঘোষণা করেন যে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস যুক্তির অতীত এবং কোঁতে (Comte) সমগ্র

প্রাজ্ঞানিক বিতর্ককেই নাকচ করে দিয়ে বলেন যে জ্ঞান মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। অন্যপক্ষে দ্য-মেইস্তার (De Maistre) এবং শ্লেগেল (Schlegel) বলেন যে একজন ভ্রম-প্রমাদের অতীত পোপ-এর কর্তৃত্বে আত্মসমর্পনই মুক্তির শ্রেষ্ঠতম পন্থা। ইস্‌মাইলীয়া ইমামত অনুসারীদের চিন্তাধারাও দ্য-মেইস্তারের যুক্তির অনুরূপ। কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয় যে একদিকে তাদের ধর্মাদর্শ পূরোপূরি ইমামের হাতে তুলে দিয়েও, ইস্‌মাইলীয়ারা সর্বক্ষেত্রে মুক্তচিন্তার অবাধ ক্রীড়ায় লিপ্ত হয়েছে।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইস্‌লামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শের সাথে মুক্তবুদ্ধি অভিসারী ইরানীয়রা যে চিরন্তন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে—এ সংগ্রাম বেশীর ভাগ আভ্যন্তরীণ—ইস্‌মাইলিয়া আন্দোলন তারই একটা দিক।[১৮] ইস্‌মাইলীয়া সম্প্রদায় প্রথমে শিয়া ধর্মাবলম্বীদেরই একটা শাখা রূপে দেখা দেয়। কিন্তু মিসরের ফাতেমীয় খলিফাদের সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ আবদুল্লাহ্‌ আল্‌ মায়মূন-এর হাতে এ সম্প্রদায় একটা সার্বজনীন রূপ লাভ করে। তাঁর মৃত্যু হয় মুক্তবুদ্ধি দের কঠোরতম শত্রু আল্‌ আশ্‌-আরীর জন্মের কাছাকাছি সময়ে। এই অদ্ভুত ব্যক্তি এমন একটা বিশালকায় ধর্মপদ্ধতির পরিকল্পনা করেন যে ইরানীয় বিশিষ্ট মনোভাবের কাছে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এতে বর্ণ বৈচিত্র্য এবং অর্থ ও কথন-সাদৃশ্য দিয়ে ইরানীয় মন যা চায় তার সবকিছুই সুকৌশলে গ্রথিত করা হয়েছিল; এর মারফত ফিরে এলো প্রাচীন ইরানীয় রহস্যাশ্রয়ী মতবাদাবলী এবং পিথাগোরাস্‌-পন্থী কুয়াসাচ্ছন্ন দার্শনিক তত্বাবলী। এক শক্তিমান ইন্দ্রজাল স্পর্শে যেন এ সব বিভিন্ন তত্বাদির মধ্যেকার বিরোধাবলী লোপ পেয়ে গেল। পবিত্র ভ্রাতৃ-সংঘের অনুসরণে ইব্‌নে মায়মূন ইমামত (কর্তৃত্ব)-বাদের পুণ্য-আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ আবৃত করে তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ দার্শনিক তত্বাবলীর সামঞ্জস্য বিধানে লেগে গেলেন। তাঁর প্রশস্ত ইসমাইলীয় শামিয়ানার তলায় এসে জুটলো গ্রীক দর্শন, খৃষ্টীয় দর্শন, যুক্তিবাদ, মরমীবাদ, মানীয়বাদ, ইরানী পাষণ্ড মতাবলী এবং সর্বোপরি অবতারবাদ সম্পর্কীয়

ধারণাবলীর বলিষ্ঠ প্রকাশ। এরা একের সাথে অন্যে এমনভাবে মিশে পড়লো যে আলাদাভাবে এদের চিনতে পারা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ালো। অবশ্য এরা যথাসময়ে যার যার পাঠ সে সে অভিনয় করে যাবে; কিন্তু এখন এক ইসমাইলীয়া মণ্ডপে সকলেই একগোত্র এবং পরস্পর বিতর্ক-মুক্ত। ইমাম বা নেতা হলেন অনন্তকাল ধরে নব নব জীবনে বিকাশমান বিশ্বকারণের প্রতিরূপ। স্বভাবতঃই তিনি সর্বজ্ঞানের আধার। কালে কালে তিনি ধরায় অবতীর্ণ হবেন কালোপযোগী জ্ঞান বিতরণের জন্যে এবং শিষ্য যখন ইমাম-নির্দেশিত পথে অগ্রসর হতে থাকবে, তখন তিনি সময় ও যোগ্যতা বুঝে তাকে পর্যায়ক্রমে জ্ঞান বিতরণ করে চলবেন। অতএব আপাতঃ দৃষ্টিতে যদিও উপরিউক্ত তত্ত্বাবলীর সমাহারে গরমিল দেখা দিতে পারে, কিন্তু যথা সময়ে এবং যথা মত পরিবেশনের বেলায় সে সব মিলিয়ে যাবে। ইসমাইলীয়া আন্দোলনে মুক্তবুদ্ধিবাদ তার সতত বিস্তারশীল শাখা-প্রশাখা নিয়ে উৎপাটিত হয়ে যাবার ভয়ে একটি শক্ত ভিত্তির আশ্রয় নিয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে মুক্তবুদ্ধির সমগ্র সত্বার কাছে যা সবচেয়ে আপঙ্‌ক্তেয়, তেমন একটি ব্যাপারই দাঁড়িয়েছে তার চিরন্তন আশ্রয়রূপে। ঊষর কর্তৃত্ব মাঝে মাঝে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্যে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে এবং এই লা-ওয়ারিস সন্তানকে আবার কুক্ষিগত করে নেয়,—এ অবস্থায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানরাজী আত্মস্থ করতে সে আবার নোতুন করে অনুমতি পেয়ে যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে সমসাময়িক রাজনীতির সাথে ইসমাইলীয় আন্দোলনের যোগাযোগের ফলে এ আন্দোলনকে বুঝতে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ভুল করে বসেছেন। তাঁরা এর মধ্যে দেখেছেন—ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাঁদের অন্যতম—কেবল-মাত্র আরব রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ইরান ভূমিথেকে উৎখাত করবার উদ্দেশ্যে একটি প্রবল ষড়যন্ত্রের রূপায়ন। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব সরলচিত্ত চিন্তা-বীর সাধনার শ্রেষ্ঠতম সোপানে আরোহণ করেছেন, তাঁদের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই কোনো কোনো ইতিহাসিক বলে গেছেন যে এরা ছিল একটি নিষ্ঠুরতম

খুনে সম্প্রদায় এবং সব সময় এরা ওঁৎ পেতে থাকতো কি করে শিকারকে আওতায় পাওয়া যায় সে সন্ধানে। ন্যায়তঃ এদের চরিত্র বিচার কালে আমাদেরও মনে রাখা উচিত, রক্তপিপাসু ধর্মান্ধদলের কিরূপ বর্বর নিপীড়নের ফলে এরা শেষ পর্যন্ত তাদের একই পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। সমগ্র সেমিতীয় জাতির কাছে ধর্মীয় কারণে গুপ্তহত্যা দোষাবহ বলে প্রতিভাত হয়নি। এমন কি, তাদের আইনেও সম্ভবতঃ তা শাস্তিযোগ্য ছিল না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পর্যন্ত রোমের পোপ সেণ্ট বার্থোলোমিউ হত্যার মতো পৈশাচিক ক্রিয়ার অনুমোদন করেছেন। ধর্মীয় জোশ-এ উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্বেও গুপ্ত হত্যা যে অপরাধের শামিল, এ ধারণা একান্ত আধুনিক এবং এটি সহজ বিচার বুদ্ধির কথা যে আমাদের আধুনিক কালের পাপপুণ্যের ধারণা নিয়ে আমরা অতীতকালের কার্যকলাপের বিচার করতে পারি না। যে মহৎ ধর্মীয় আন্দোলন একটি বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং কৃতকার্যতার সাথে নৈতিক দোষারোপ, অপবাদ উৎপীড়নের পালা অতিক্রম করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান ও দর্শনের সবল পোষকতা করে চলেছিল, তাকে শুধু মাত্র কতিপয় স্থানীয় অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত একটি ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণজীবী রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ইসমাইলীয়া মতবাদ তার প্রারম্ভিক জীবনী শক্তির প্রায় সবটুকু হারাবার পরেও, এখন পর্যন্ত ভারত, ইরান, মধ্য এশিয়া, সীরিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে একটি বিরাট মানবগোষ্ঠীর নৈতিক আদর্শ নিয়ন্ত্রণ করছে ; তা ছাড়া, ইরানের শেষতম চিন্তাধারা বা'বীয়বাদও মূলত্ব ইসমাইলীয়াবাদেরই একটি প্রশাখা।

এখন এ সম্প্রদায়ের দর্শন পদ্ধতির আলোচনায় আসা যাক্। যুক্তিবাদীদের শেষ পর্যায় থেকে এঁরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণা আহরণ করেন। এঁদের মতে, সৃষ্টি ও স্থিতির আদি কারণ আল্লাহ্‌র কোনো বিশেষণ (attribute) নেই। তাঁর প্রকৃতিতে কোনো কিছু আরোপ করা চলে না। উদাহরণতঃ, যখন আমরা তাঁতে শক্তিরূপ গুণ আরোপ করি, অর্থাৎ তাঁকে

শক্তিমান বলে মানি, তখন প্রকৃত পক্ষে আমরা মনে করি যে তিনিই শক্তির আধার বা শক্তিদাতা। যখন আমরা তাঁতে চিরন্তনতা আরোপ করি, তখন কুর্‌আন যাকে 'আম্‌র্' বা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলে উল্লেখ করেছে, এবং যা ধ্বংসশীল 'খল্‌ক' বা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বিপরীত—তাকেই চিরন্তন বলা হয়। তাঁর প্রকৃতিতে কোনোরূপ বিরোধ ভাব থাকতে পারে না এবং সব বিপরীত অস্তিত্ব তাঁর কাছ থেকেই প্রবাহিত হয়। এ ভাবে তাঁরা মনে করতেন যে যোরো'ষ্টার ও তাঁর শিষ্যদের কাছে যে সব বৈপরিত্যমূলক অস্তিত্ব ও ভাব অসমঞ্জস মনে হতো, তাঁরা সেগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন। 'বহুত্ব কি ?'—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেয়ে ইসমাইলীয়ারা উল্লেখ করেছেন তাঁদের মতে নিম্নোক্ত প্রাজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধটির ঃ এক থেকে মাত্র একই জন্ম নিতে পারে। তাঁরা বলেন, কিন্তু যা জন্ম নেয়, তা জন্মদাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো বস্তু নয়। প্রকৃত পক্ষে, তা রূপান্তরিত আদিসত্বাই বটে। তা হলে সেই আদি একম্‌ সর্বপ্রথমে নিজেকে প্রথম চিৎশক্তি বা বিশ্ব কারণে রূপান্তরিত করলেন ; এবং অতঃপর, নিজেকে এ ভাবে রূপান্তরণের ফলেই সৃষ্টি করলেন বিশ্বআত্মা। এই বিশ্বআত্মা চাইলো নিজেকে তার প্রাথমিক উৎসের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে দিতে এবং এতে তার প্রয়োজন দেখা দিলো গতির এবং অবশেষে গতিশীল একটা পদার্থের রূপ গ্রহণের। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আত্মা সৃষ্টি করলো আকাশ মণ্ডলীর এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলো নির্ধারিত বৃত্তপথে ঘুরতে ; আত্মা আরও সৃষ্টি করলো বস্তুরাজীর উপাদানাবলী—যে-সবের সংমিশ্রণে দৃশ্যমান বিশ্বজগত আকার গ্রহণ করলো। এই বহুত্ব-র বাজারের মধ্য দিয়ে নিজের আদি উৎসের কাছে ফিরে যাবার অনন্ত প্রয়াসই অবশ্য আত্মার উপজীব্য। ব্যক্তি-আত্মা সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিরই একটি প্রতিরূপ বিশেষ ; জ্ঞানাহরণের পথে এগিয়ে চলার জন্যেই এর অস্তিত্ব। সময় সময় বিশ্বকারণ ইমাম-এর ব্যক্তিত্ব অবলম্বন করে ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন এবং আত্মাকে তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানগম্যতা অনুসারে আলোক দান করেন। শেষ উদ্দেশ্য হলো, বহুত্ব-র দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পরিচালিত করে

নিয়ে আত্মাকে চিরন্তন একক-এর দেশে পৌঁছিয়ে দেওয়া। বিশ্বআত্মা এ ভাবে যখন তার শেষ-লক্ষ্যে যেয়ে পৌঁছায়, অথবা বলা যায় যে—তার অন্তরতম অস্তিত্বের কাছে ফিরে যায়, তখন তার মধ্যে ভাঙ্গন পর্যায় শুরু হয়। যে সব বস্তুকণা সমাহারে তার বিশ্ব তৈরী হয়েছিল, সে সব বস্তুকণা একে অপর থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে—এ-সবের মধ্যে যা সৎপথাবলম্বী, তা একত্বব্যঞ্জক সত্য বা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যায়; আর যা অসৎপথাবলম্বী, তা ফিরে যায় বৈচিত্র্য ব্যঞ্জক অসত্য বা শয়তানের দিকে।[১৯] এই-ই হলো ইসমাইলীয়া দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। শাহারিস্তানী বলেছেন যে এ হলো দার্শনিক এবং মানীপন্থী ধারণাবলীর এমন একটি অপূর্ব মিশ্রণ, যা তার সাধককে অল্পে অল্পে বিভিন্ন অলি-গলি পার করে এনে ক্রমশঃ সংশয়বাদের মোহমধুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত করে। তারপর জিজ্ঞাসু সাধক যখন আরও এগিয়ে যায়, তখন সে নিজেকে দেখতে পায় আধ্যাত্মিক রাজ্যে সম্পূর্ণ বিমুক্ত পুরুষরূপে। এখানে আচার-বিচারের প্রশ্ন তাকে আর কোথাও বাধা দেয় না। আনুষ্ঠানিক ধর্ম পদ্ধতিকে সে দেখতে পায় কতকগুলি প্রয়োজনীর মিথ্যাকে পরস্পর সাজিয়ে তোলা একটা কেল্লারূপে।

ইসমাইলীয় মতবাদই হলো সমসাময়িক দর্শনের সাথে বিশ্বপ্রকৃতি সংক্রান্ত খাঁটি ইরানীয় মনোভাবের মিলন সাধনের সর্বপ্রথম প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ—এই মিলন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কুর্‌আন-এর রূপক ব্যাখ্যার সাহায্যে ইসলামের পুনর্ব্যাখ্যার শক্তিমান প্রচেষ্টাও এতে রয়েছে। এ পন্থা সূফী সাধকেরাও পরে অবলম্বন করেছিলেন। ইসমাইলীয়া মতে যোরো'ষ্ট্রীয় আহরিমন বা শয়তান পাপাসক্ত অন্যায় সৃষ্টিকারী নহেন; বরঞ্চ তিনি হলেন সনাতন একত্ব লঙ্ঘনকারী এবং একত্বকে ভেঙ্গে বাহ্য দৃষ্টিতে বিচিত্ররূপে প্রতিভাতকারী নীতিরূপ। বিশ্বজগতের পর্যবেক্ষণমূলক বৈচিত্রের কারণ নির্ণয় করতে যেয়ে যে আদিম সত্বার প্রকৃতিতেই কিছু না কিছু গরমিলের নীতি স্বীকার করে নিতে হচ্ছিল—এ ধারণা পরে পরে আরও পরিবর্তিত রূপ পায়। শেষ পর্যন্ত, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসমাইলীয়াপন্থীদের এক দূরতর প্রশাখা হুরূফী-

সম্প্রদায় একদিকে সমকালীন সূফীবাদ ও অন্য দিকে খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের সাথে নিকট সম্বন্ধে এসে পড়েন। হুরূফীদের মতে, 'কুন্' (হও) হলো আল্লাহ্‌র চিরন্তন নির্দেশ। এ স্বয়ং অ-সৃষ্ট কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টির সূচনাকারী। সৃষ্টি হলো এ নির্দেশের বাহ্যিক রূপ। "এই নির্দেশ-বাক্যের অবর্তমানে আল্লাহ্‌র গূঢ় অস্তিত্ব অনুভব করা অসম্ভব হতো; কেন না, আল্লাহ্ ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত।"[২০] সুতরাং এই নির্দেশবাক্যই পরম পিতাকে প্রতিভাত করবার উদ্দেশ্যে মরিয়ম-জঠরে নিজেকে মাংসাচ্ছাদিত করেছিল।[২১] সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিই আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ-বাক্যের প্রকাশরূপ। এর মধ্যেই তিনি পরিব্যাপ্ত।[২২] বিশ্বজগতে বিচরণশীল প্রত্যেকটি আত্মা আল্লাহ্‌তেই অবস্থিত; প্রত্যেকটি পরমাণু চিরন্তন সঙ্গীতে মুখর;[২৩] জীবন সর্বব্যাপী। যাঁরা বস্তুর অন্তরালে নিগূঢ়তম সত্যের সন্ধানী, তাঁদের কর্তব্য নামের মাধ্যমে নাম ময়ের খোঁজ নেওয়া;[২৪] নামেরই মধ্যে নামময় প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশমান।

(৩) যুক্তিবাদ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া

আশ্‌আরী পন্থীগণ

প্রাথমিক আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে যুক্তিবাদ মুসলিম জগতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে দিন দিন প্রসার লাভ করতে থাকে। এর সামনে প্রথম শক্তিশালী বাধা আসে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আশ্‌আরীয় আন্দোলন থেকে। প্রবল শক্তিধর এবং উদ্যোগী পুরুষ আল্ আশ্‌আরী ৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও সমাপ্ত হয় মু'তাযিলা শিক্ষকদের কাছে। কিন্তু এই বিদ্যাবত্তা তিনি নিয়োজিত করেন যুক্তিবাদের পদ্ধতির সাহায্যেই মু'তাযিলাদের এতকালের অশেষ পরিশ্রমে গড়ে তোলা যুক্তির প্রাসাদ ধূলিলুণ্ঠিত করে দিতে। বস্‌রায় মু'তাযিলাপন্থীদের যে নব্যদল গড়ে উঠেছিল তাঁদের নেতা আল্‌জুবায়ী[২৫]

ছিলেন আল্-আশ্‌আরীর গুরু। গুরু-শিষ্যে আলোচনাচ্ছলে প্রায়শঃই বাদানুবাদ চলতো ;[২৬] ক্রমশঃই এই বাদানুবাদের ফলে দু'জনে আলাদা মতামত পোষণ করতে আরম্ভ করলেন এবং শেষতক্ দু'জনার মধ্যে জীবনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আল্-আশ্‌আরী মু'তাযিলা মত সরাসরি পরিত্যাগ করে তার বিরুদ্ধে লাগলেন। স্পিটা (Spitta) বলেন, আল্-আশ্‌আরীর আন্দোলনের আরও একটি দিক্ আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ছিলেন একান্তভাবে কাল-প্রগতির সন্তান এবং কালের প্রয়োজনে তখন যে সব নোতুন নোতুন ভাবধারা একের পর এক দেখা দিচ্ছিল, তিনি সে সবও সহজেই আয়ত্ব করে নেন। তাঁর এবং তাঁর সতীর্থদের মধ্যে সে কালের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবধারার প্রতিফলন খোলাখুলিভাবে লক্ষ্যণীয়। শৈশবের শিক্ষাদীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন গোঁড়া সম্প্রদায়ের কাছে ; তারপর তাঁর যৌবন কাটে মু'তাযিলা প্রভাবে। অতএব তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী দেখা গেল একদিকে শিশুসুলভ অসহায়তার সাথে ধর্মের কাঠামোকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা, আবার অন্যদিকে অপরিপক্ক ও অসম্পূর্ণ বুদ্ধি নিয়ে যুক্তির পেছনে ধাওয়া করবার প্রবণতা। এ দুই বিরুদ্ধ শক্তি তাঁর সমগ্র চালচলন ও কর্ম প্রচেষ্টাকে এমন নিবিড়ভাবে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল যে, এদের একটি অন্যটিকে শেষবারের মতো পরাস্ত করবার উদাহরণ তাঁর জীবনে অলভ্য।[২৭] মু'তাযিলা চিন্তাধারা (যেমন, আল্‌জাহিয্‌-এর কার্যক্রম) পরিপূর্ণভাবে শৃঙ্খলমুক্তি প্রয়াসী ; এ পথে চলতে যেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পথিক এসে পৌঁচেছে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে। আল্‌-আশ্‌আরীর আন্দোলনের লক্ষ্য হলো দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ইসলামের মধ্যে চুপেচাপে যে সব অনৈসলামিক ভাবধারা ঢুকে পড়েছে, সেগুলিকে সমূলে উৎপাটন ; দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ধর্মীয় চেতনার সাথে ইসলামী ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান। যুক্তিবাদ বা মু'তাযিলাবাদের উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছিল বাস্তবকে নির্ভেজাল যুক্তির আলোকে অবলোকন করা ; এর ফলে ধর্ম ও দর্শনের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি মু'তাযিলাপন্থীদের কাছে লোপ পেয়েছিল এবং

তাঁরা চেষ্টিত হয়েছিলেন ধর্মবিশ্বাসকে দর্শনশাস্ত্রীয় ধারণা ও খাঁটি চিন্তামূলক সংজ্ঞার সাহায্যে প্রকাশ করতে। তাঁদের কাছে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার কোনো মূল্য ছিল না। এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামের সংহতির উপরও তাঁরা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। এ থেকেই আশ্‌আরীয় প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত।

বস্তুতঃ, আল্‌-আশ্‌আরীর নেতৃত্বে যে শাস্ত্রানুসারী প্রতি আন্দোলন শুরু হলো, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় 'ওহি' বা ঈশ্বরানুদেশের কর্তৃত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মু'তাযিলাবাদীদের বিরুদ্ধে যেয়ে আশ্‌আরীপন্থীরা আল্লাহ্‌র গুণাবলী সংক্রান্ত মতবাদকে পুনরায় সমর্থন দিলেন। তারপর মুক্তবুদ্ধিবাদ সংক্রান্ত বাদানুবাদের বেলায় তাঁরা গোঁড়া অদৃষ্টবাদী এবং গোঁড়া মুক্তবুদ্ধিবাদীদের মাঝামাঝি একটি নোতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে, ভালমন্দ বাছাই করে নেবার ক্ষমতা এবং মানুষের সর্বকর্ম আল্লাহ্‌র সৃষ্ট; কিন্তু মানুষকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াকর্ম আহরণ করে নেবার ক্ষমতা।[২৮] কিন্তু ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রা'যী তাঁর দর্শনশাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযানের বেলায় তুসী ও কুত্‌বুদ্দীন কর্তৃক শ্রমসহ প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়ে থাকলেও, এই 'আহরণ'-তত্ত্বকে কৃতকার্যের সাথে নাকচ্‌ করে দেন এবং তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কুর্‌আন-ভাষ্যে প্রয়োজনবাদ (Doctrine of Necessity)-তত্ত্বের অবতারণা করেন। সমরকন্দ নগরীর প্রান্তে অবস্থিত মা'তুরিদ এর অধিবাসী আবুল মন্‌সূর মা'তুরিদী থেকে মা'তুরিদীয়াহ্‌ বলে খ্যাত আর এক যুক্তিবাদ-বিরোধী ধর্মীয় দলের উৎপত্তি হয়। এঁরা আবার যুক্তিবাদ বিরোধী তর্কসূত্র অনুসরণ করে চলতে যেয়ে প্রায় যুক্তিবাদীদের পথেই এসে পড়েন। আশ্‌আরীয় মতবাদের বিরুদ্ধে যেয়ে এঁরা ঘোষণা করেন যে, নিজ কর্মের উপর মানুষের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে এবং মানুষের এই কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা তার কর্মের প্রকৃতির উপরই ক্রিয়াশীল। আল্‌-আশ্‌আরীর মনোগতি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয়; কিন্তু সত্যের নিগূঢ় প্রকৃতির বিবেচনা বাদ দিয়ে যুক্তির সাথে

'ওহি' বা ঈশ্বরানুদেশের সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বাকিলানী [২৯] কতকগুলি খাঁটি প্রাজ্ঞানিক সূত্রের দিকে হাত বাড়ান এবং সেগুলিকে নিজ ধর্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেন ঃ যেমন—বস্তু একটি স্বতন্ত্র একক ; গুণের মধ্যে গুণ বিরাজ করতে পারে না ; সম্পূর্ণ বায়ুমুক্ত স্থানের অবস্থিতি সম্ভবপর—ইত্যাদি। এভাবে এ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিচার-বিবেচনা দর্শনের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এ দিকটিই আমাদের প্রণিধানের বিষয়। অতএব এঁদের শাস্ত্রানুগামী ধর্মবিশ্বাসের সমর্থন প্রচেষ্টা নিয়ে (যেমন ঃ ক্বুর্‌আন অ-স্রষ্ট ; আল্লাহ্‌কে চর্মচক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব ইত্যাদি) আমাদের এখন কিছু বক্তব্য নেই ; কিন্তু তাঁদের ধর্মীয় বাদানুবাদের মধ্যে যে সব প্রাজ্ঞানিক মাল-মশলা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলিকে কুড়িয়ে এনে আমরা দেখবার চেষ্টা করবো দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গনে তাঁদের দান কি। অবশ্য তাঁদের তাগিদ-এর মূলে যা কাজ করেছিল, তা দর্শন প্রচেষ্টা নয়। সমসাময়িক দার্শনিকদের মুকাবিলা না করে উপায় ছিল না ; অতএব দার্শনিকদেরকে দর্শনের ভাষায় জবাব দেবার জন্যেই বিশেষ করে তাঁদের ধর্মকে দর্শনের বস্ত্রালঙ্কার পরাতে হয়েছিল। এভাবে ইচ্ছায় হোক্ বা অনিচ্ছায় হোক্, তাঁরা নিজেদের মনোভাব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত একটি জ্ঞানতত্ত্বের (theory of knowledge) উদ্ভাবন করেন।

আশ্‌আরী পন্থীদের মতে, আল্লাহ্‌ হলেন আদিতম অপরিহার্য অস্তিত্ব (ultimate necessary existence)-স্বরূপ এবং "তাঁর গুণাবলী তাঁর অস্তিত্বেই রয়েছে ;" [৩০] তাঁর অস্তিত্ব (ওজুদ) এবং প্রকৃতি (মা'হিয়াত) অভিন্ন। গতির সাময়িক প্রকৃতি সংক্রান্ত মতবাদ ছাড়াও, তাঁরা নিম্নোক্ত যুক্তিদ্বয়ের সাহায্যে আদিকারণের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন ঃ

(ক) তাঁদের মতে, সব বস্তুই নিজ নিজ বাহ্যিক অস্তিত্ববিচারে এক ; কিন্তু এই একত্ব সত্ত্বেও তাদের গুণ বিভিন্ন, এমন কি পরস্পর বিপরীত ধর্মী।

বস্তুর এই পর্যবেক্ষণমূলক বিভিন্নতার হেতুস্বরূপ একটি আদিকারণের ধারণায় আসতে হয়।

(খ) কোনো অনিয়ত (contingent) বস্তু বিনা কারণে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না ; বিশ্বজগত অনিয়ত ; অতএব এর অস্তিত্বের পেছনে কোনো কারণ থাকতেই হবে। সেই কারণ হলো আদিকারণ ঃ আল্লাহ্।

বিশ্বজগত যে অনিয়ত, তা তাঁরা প্রমাণ করেছেন নিম্নলিখিতরূপে ঃ

এ বিশ্বজগতে যা কিছু রয়েছে, তার সব কিছুই হয়তো বস্তুমূলক, না হয় গুণাত্মক। গুণের উদ্ভব স্পষ্ট ; বস্তুর উদ্ভবের মূলে এই সত্য রয়েছে যে কোনো বস্তু গুণ রহিত হয়ে অবস্থিতি করতে পারে না। গুণের উদ্ভব থেকে বস্তুর উদ্ভবন অবধারিত হয়ে পড়ে ; তা না হলে বস্তুর অবিনশ্বরতা থেকে গুণও অবিনশ্বরতা লাভ করতো।

এ যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে, প্রথমে আশ্আরীয় জ্ঞানতত্ত্ব বুঝে নেওয়া দরকার। বস্তু কি?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে আশ্আরী-পন্থীরা আরস্তর চিন্তা পর্যায়বাদ (Aristotalian categories of thought) সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বস্তুর নিজস্ব কোনো দ্রব্যগুণ (properties) নেই।[৩১] তাঁরা বস্তুর প্রথম স্থানীয় ও দ্বিতীয় স্থানীয় গুণের মধ্যে কোনো প্রভেদ মানলেন না এবং সব-গুলিকেই বললেন প্রত্যয়মূলক সম্পর্ক মাত্র। এমন কি, বস্তুর গুণকেও তাঁরা বললেন আকস্মিক ঘটনামাত্র—যা না থাকলে বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। বস্তু বা পরমাণু ইত্যাদির ধারণা তাঁরা ভাসাভাসা অর্থে ব্যবহার করলেন বস্তুর বাহ্যিকরূপ বুঝাবার জন্যে। কিন্তু বিশ্বজগত আল্লাহ্র সৃষ্ট—ধর্মাশ্রয়ী এই মতবাদের পোষকতায় যুক্তিজাল বিস্তার করতে যেয়ে তাঁরা শেষতক্ তাকে কতকগুলি প্রত্যয়ের সুশৃঙ্খল প্রকাশ মাত্র বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। এখানে বার্কলী (Berkley)-র মতো তাঁরাও বললেন যে এ আল্লাহ্র ইচ্ছার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। মানবীয় জ্ঞানকে শুধুমাত্র একটি পর্যায়ক্রমরূপে না দেখে বরং একটা প্রচেষ্টার পরিণতি বলে

প্রমাণ করতে যেয়ে কা'ন্ট তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ধারণা 'Ding an sich' (thing-in-itself)-এ এসে থেমে গিয়েছিলেন ; কিন্তু আশ্‌আরী-পন্থীরা আরও কিছু গভীরে অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চালনের চেষ্টা করেন। তাঁরা সমসাময়িক সংশয়মূলক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে যেয়ে ঘোষণা করেন যে তথাকথিত অন্তর্নিহিত সত্বা মাত্র সেই পরিমাণ অস্তিত্বশীল, যে পরিমাণে তা জ্ঞানের আওতায় আসে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এঁদের পরমাণুবাদ শেষ পর্যন্ত লোট্‌যে (Lotze)-[৩২] এর ব্যাখ্যাত মতবাদেরই সম পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। লোট্‌যে-র 'বাহ্য দৃষ্টিতে ধৃত বাস্তব অস্তিত্ব'-বাদকে রক্ষা করবার সমস্ত প্রয়াস সত্বেও শেষ পর্যন্ত সে অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভাবরাজ্যে অন্তর্ধান করে। কিন্তু লোট্‌যে-র মতো তাঁরা তাঁদের পরমাণুরাজীকে অনন্ত আদি সত্বার আন্তরিক কর্মধারারূপে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁদের নিষ্কলুষ একেশ্বরবাদ-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। বস্তুর বিশ্লেষণ ব্যাপারে তাঁদেরকে বাধ্য হয়ে বার্কলীর মতো সরাসরি আদর্শবাদে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু পরমাণুবাদের ঐতিহ্যের সাথে তাঁদের সহজাত বুদ্ধি-আশ্রয়ী বাস্তববাদের যোগাযোগের ফলেই বোধ হয় তাঁরা পরমাণু (atom)-শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে যেতে পারেন নি এবং এর সাহায্যে তাঁদের আদর্শবাদকে কিছুখানি বাস্তবভিত্তি দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের পক্ষে দৃঢ় থাকতে যেয়ে তাঁরা দর্শনকে সব সময়েই সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন ; এই অনিচ্ছাকৃত দর্শনিকতা তাঁদের ক্রমশঃ শিক্ষা দেয় নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে একটা নিজস্ব প্রাজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়ে তুলতে।

এ ক্ষেত্রে একটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং দার্শনিক বিচারে বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো আশ্‌আরীয়দের কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রতি মনোভাব।[৩৩] একদিকে যেমন মু'তাযিলাপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে "আল্লাহ্ সম্প্রসারণশীল না হওয়া সত্বেও চর্মচক্ষে দৃষ্টিগোচর হতে পারেন"—এ মতবাদ প্রচারের বেলায় তাঁরা আলোক-বিজ্ঞানের সমুদয় তথ্যাবলী অস্বীকার করেন,[৩৪] অন্যদিকে অলৌকিক ঘটনাবলীর সম্ভাবনাকে

স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তাঁরা কার্য-কারণ নীতিকেই একেবারে উড়িয়ে দেন। গোঁড়া ধর্মপন্থীরা একই সাথে অলৌকিকতার সম্ভাবনা এবং বিশ্বজনীন কার্যকারণ-নীতির অস্তিত্ব—দুইই বিশ্বাস করতেন। তাঁদের মতে, আল্লাহ্ যখন কোনো আলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে যান, তখন তিনি কার্যকারণ নীতিকে সাময়িক ভাবে মুলতুলি রাখেন। কিন্তু আশ্আরীয়রা মনে করতেন যে কারণ এবং কার্য একই ধরণের হতে হবে ; অতএব তাঁরা গোঁড়া ধর্মপন্থীদের মত গ্রহণ করতে পারেন নি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে (কার্য কারণে অন্তর্নিহিত) ক্ষমতার ধারণা অর্থশূন্য ; আমাদের জ্ঞানের দৌড় কতকগুলি হালকা আভাষ মাত্রে পর্যবসিত এবং এ সবের ঘটনা-পরম্পরা আল্লাহ্ই নির্ধারিত করে দেন।

আল্ গাযালী (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দ) র চিন্তা ধারার উল্লেখ না করে আশ্-আরীপন্থীদের প্রজ্ঞান চর্চার ইতিহাস কিছুতেই শেষ করা চলেনা। গোঁড়া ধর্মপন্থীদের অনেকে তাঁকে ভুল বুঝে থাকলেও তিনি সর্বকালের মুসলিম ধর্মীয় ক্ষেত্রে একজন বিরাটতম ব্যক্তিত্বরূপে বিরাজমান থাকবেন। এই অসাধারণ শক্তিমান সংশয়বাদী তাঁর দর্শনালোচনায় যে পন্থা অবলম্বন করেন, তা বহুকাল পরে ডেকার্টস (Descartes)-এর দ্বারা পুনরাবিষ্কৃত হয়।[৩৫] "হিউমের সাত শতাব্দী পূর্বে তিনি নিজ ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে কার্যকারণ শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করে দেন।"[৩৬] তিনিই সর্ব প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে দর্শন তত্ত্বাবলীকে খণ্ডন করতে আত্মনিয়োগ করেন। গোঁড়া ধর্মপন্থীদের মনে যুক্তিবাদের প্রতি যে নিদারুণ বিভিষিকা জমাট বেঁধেছিল, তিনিই তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেন। প্রধানতঃ তাঁর প্রভাবেই লোকেরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও প্রজ্ঞানের চর্চা একসাথে আরম্ভ করে। এভাবেই এমন একটি উদারতর শিক্ষার ধারা প্রবর্তিত হয় যার ফল স্বরূপ আমরা শাহারিস্তানী, আর্-রাযী এবং আল্ ইশ্রাকীর ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পাই। গাযালীর চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্য তাঁর নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য থেকে বোঝা যাবে ঃ

"শৈশব থেকেই আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করতাম। এর ফলে আমি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠি এবং বাল্যকাল থেকে যে সব বিশ্বাস আমার অন্তরে পোষণ করতাম সেগুলির গুরুত্ব কমে যায়। আমার মনে এ সত্য প্রতিভাত হলো যে, এ সব কর্তৃত্ব মূলক বিশ্বাস ইহুদী, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সকলেই পোষণ করে। সত্যিকার জ্ঞান সর্ব প্রকার সন্দেহ থেকে বিমুক্ত থাকা চাই। উদাহরণতঃ, এ'টা একটী স্বতঃসিদ্ধ যে দশ তিনের চেয়ে বেশী। কোনো ব্যক্তি যদি তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে বিশ্বাস করাতে চায় যে তিন দশের চেয়ে বেশী, তাতে অবশ্য তার কলা কৌশলের বাহাদুরী সূচিত হবে, কিন্তু তার কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া চলবে না।" [৩৭]

অতঃপর তিনি সর্বধর্মেরই 'নিশ্চিত জ্ঞান পরিবেশনের দাবী' পরীক্ষা করতে লেগে যান এবং অবশেষে স্থফিবাদে এসে প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভের কথা ঘোষণা করেন।

আশ্‌আরীয় সম্প্রদায় বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন, তাঁদের কঠোর একেশ্বরবাদের সাথে মিল রেখে তার সাহায্যে মানুষের আত্মার প্রকৃতি বিচার তাঁদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। একমাত্র আল্ গাযালীই এই প্রশ্ন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার প্রয়াস পান। অবশ্য আল্লাহ্‌র প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর খাটি মত কি ছিল, তা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। জার্মান মনীষী বর্জার ও সল্‌জার (Borger and Solger)-এর মতোই, বোধ হয়, তাঁর মধ্যে স্থফী সর্বেশ্বরবাদ এবং আশ্‌আরীয় ব্যক্তিত্ব-বাদের এক রকম মিলন ঘটেছিল। এ কারণে সত্যিকরে বুঝতে পারা কঠিন যে তিনি কি একজন খাঁটি সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন, না লোটযে-র মতো একজন 'ব্যক্তিত্ববান সর্বেশ্বরবাদ'-পন্থী ছিলেন। আল্-গাযালীর মতে মানবাত্মা অনু-ভূতিশীল। কিন্তু এই অনুভূতি-ক্ষমতা শুধু মাত্র এমন বস্তু বা সত্তায় গুণ-রূপে বিরাজ করতে পারে, যা দেহ সংক্রান্ত সর্বগুণবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর 'আল্‌মদ্‌নুন'-গ্রন্থে [৩৮] তিনি দেখিয়েছেন, কেন হযরত রসূলুল্লাহ্‌

আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানে বিরত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণী রয়েছে—সাধারণ মানুষ আর চিন্তাশীল মানুষ। সাধারণ মানুষ জড়ত্বকে অস্তিত্বের একটি শর্ত বলে মনে করে ; অতএব তারা অ-জড় বস্তুর ধারণা করতে পারে না। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যুক্তিতর্কের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আত্মার সম্বন্ধে এ হেন ধারণায় উপনীত হন, যাতে আল্লাহ্ এবং ব্যক্তি-আত্মার পার্থক্য লোপ পায়। আল্ গাযালী নিজের চিন্তাসূত্রে এ পথে এগিয়ে বুঝতে পারেন যে তিনি সর্বেশ্বরবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। তারপর তিনি আত্মার নিগূঢ় প্রকৃতি সম্বন্ধে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করেন।

আল্-গাযালীকে সাধারণতঃ আশ্আরী-পন্থীদের মধ্যে গণনা করা হয়। কিন্তু আশ্আরীয় মতকে তিনি জনসাধারণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও, তাঁকে খাঁটি আশ্আরীয় বলা চলে না। মওলানা শিব্লী তাঁর 'ইল্মুল্ কালাম' গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে "আল্ গাযালীর মতে বিশ্বাসের নিগূঢ় তত্ত্ব অপ্রকাশ্য ; এ কারণে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে আশ্আরীয় তত্ত্বকথা প্রচারে উৎসাহ দিতেন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত সাধনায় লব্ধ তথ্যাবলী গোপন রাখবার জন্যে নিকট শিষ্যদেরকে বিশেষভাবে খবর-দারী করতেন।" তাঁর একদিকে আশ্আরীয় ধর্মপদ্ধতির প্রতি এই মনোভাব এবং অন্যদিকে দার্শনিক পরিভাষায় কথা বলার ঝোঁক লোকমনে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। ইবনে জওযী, কাযী ইয়ায্ এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারীদলের অন্যান্য বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে প্রকাশ্যভাবে 'পথভ্রষ্ট' বলে ঘোষণা করেছিলেন। এমন কি, ইয়ায এতদূর এগিয়েছিলেন যে তিনি স্পেনে আল্ গাযালীর দার্শনিক ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর যেটি যেখানে পাওয়া যায় তার সবগুলিই অবিলম্বে ধ্বংস করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতএব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, একদিকে মু'তাযিলা বিতর্কবুদ্ধি যেমন আল্লাহ্র ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে তাঁকে কেবল মাত্র একটী সংজ্ঞাতীত বিশ্বজনীনতায় পর্যবসিত করেছিল, তেমনই যুক্তি-বাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যক্তিত্ববাদকে পোষণ করা সত্ত্বেও বিশ্বপ্রকৃতির

বাহ্যিক বাস্তবতার বিলোপ সাধন করেছিল। নয্‌যাম-এর 'পরমাণুর বাস্ত-বায়ন' [৩৯]-মতবাদের প্রসার সত্ত্বেও, মু'তাযিলীয়মতে এই পরমাণু বা অণুকণিকার একটি স্বাধীন বাস্তব সত্তা আছে বলে মনে করা হতো; অপর পক্ষে আশ্‌আরীয় মতে এ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাশক্তির একটী ধাবমান মুহূর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। একদল প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে ধর্মাশ্রয়ী ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছে; অন্যদল আনুষ্ঠানিক ধর্মপন্থীদের ধারণাশ্রয়ী ঈশ্বরকে বাঁচাতে যেয়ে প্রকৃতিকে বলিদান করেছে। যুগব্যাপী এই ধর্মীয় বিতর্ক থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌তে তন্ময় সূফী সম্প্রদায় অস্তিত্বের এই উভয় দিককেই আধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত করে বাঁচিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা সমগ্র বিশ্বজগতকে মনে করলেন বিশ্ববিধাতার আত্মাভিব্যক্তিস্বরূপ এবং এ উচ্চতর দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে তাঁরা যুধ্যমান পূর্বসূরীদের বিতর্কের মীমাংসা দেখতে পেলেন। তাঁদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিরোধের দুইপ্রান্ত একই দিগন্তরেখায় এসে মিশলো। সূফীদের কথিত 'কাষ্ঠকঠিন যুক্তিবাদে'র গভীরতর স্তর নিংড়েও সংশয়বাদী আল্‌গাযালী আত্মার তৃপ্তিরস আহরণ করতে পারলেন না; নির্জলা জ্ঞান চর্চার পথে তিনি ঊষর মরু কন্দরে, মাঠে ঘাঠে ঘুরে শূন্যহাতে ফিরে এলেন; অতঃপর তিনি মানবীয় হৃদয়াবেগের আরও গভীরতর স্তরে পৌঁছে তবে প্রশান্তির সাক্ষাৎ লাভ করলেন। সূফীরা ইসলামী ধর্ম পদ্ধতির পক্ষ-সমর্থনের খাতিরেই যে শুধু আল্‌গাযালীর সংশয়বাদের উল্লেখ করেছেন, তা নয়; বরঞ্চ আরও একটি উচ্চতর জ্ঞানের উৎসের প্রয়োজনীয়তা যে মানব জীবনে দেখা দেয়, তাও তাঁরা এ-থেকে প্রমাণ করেন। এ ক্ষেত্রে সূফিবাদের নীরব বিজয়েই তাঁদের মতে তৎকালীন অন্যান্য সব প্রতিদ্বন্দী ধর্মীয় চিন্তা ও পদ্ধতির উপরে এর শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত করে।

স্বদেশের দর্শন চর্চাক্ষেত্রে আল্‌গাযালীর প্রকৃষ্ট আবদানের পরিচয় অবশ্য পাওয়া যাবে তাঁর ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'মিশকাতুল্ আনওয়ার'-এ। এ বই তিনি আরম্ভ করেছেন কুর্‌আন-এর "আল্লাহ্ হচ্ছেন আকাশরাজী ও পৃথিবীর আলোক

স্বরূপ"—এই সুপ্রসিদ্ধ আয়াত দিয়ে। তাঁর এই ইরানীয় ঐতিহ্যের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ পরে আল্ ইশরাকীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ বইয়ে আল্-গাযালী ঘোষণা করেন যে আলোকই একমাত্র প্রকৃত অস্তিত্ব; এবং অনস্তিত্বের বাড়া কোনো অন্ধকার নেই। কিন্তু আলোকের অভিব্যক্তি হলো প্রকাশমানতায়। "আলোক আরোপিত হয় প্রকাশমানতায়, আবার প্রকাশমানতা একটি সম্পর্ক বিশেষ।" [৪০] বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হয়েছিল অন্ধকার থেকে, যার উপর আল্লাহ্ নিজের আলোক ছিঁটিয়ে দিয়েছিলেন। [৪১] এই আলোক যেখানে যে পরিমাণে পড়েছে সেখানে বিশ্বজগত সে পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বস্তু সমূহ যেমন আলোকের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন—যথাঃ অন্ধকার, অস্পষ্ট, আলোকিত বা আলোক বিকীরণশীল, মানুষও তেমনি এক থেকে অন্যে আলাদা। কোনো কোনো মানুষ আছেন, যাঁরা অন্যান্য মানুষকে আলোকিত করেন; এ কারণেই কুর্আনে হয্রত রসূলুল্লাহ্‌র নাম দেওয়া হয়েছে 'জলন্ত প্রদীপ'।

ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী দৃষ্টিশক্তি দিয়ে আমরা শুধুমাত্র স্বয়ম্ভু বা নিত্য আলোক এর বাহ্যিক প্রকাশই দেখতে পাই। মানুষের হৃদয়ে একটি আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিক্ষমতা রয়েছে, যা চর্মচক্ষুর মতো নিজের প্রতি অন্ধ নয়; তদুপরি এর দৃষ্টিক্ষমতা সসীম জগতকে অতিক্রম করে নিত্যের অঙ্গনে পৌঁছাতে পারে। এসব এখানে মাত্র কতকগুলি চিন্তাকণিকা বিশেষ; এ বীজ মহীরুহে পরিণত হয়ে ফলবন্ত হয়েছে আল্ ইশ্রাকীর 'আলোক দর্শন' (Philosophy of Illumination) এ—তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিক্মতুল্ ইশরাক'-এ।

এ-ই হলো আশ্আরীয় দর্শনের মূলকথা।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়ার একটী গুরুত্বপূর্ণ ফল দাঁড়ালো এই যে মুক্ত বুদ্ধির প্রসারে মুসলিম ময্হাব এর মধ্যে যে দ্রুত ভাঙ্গন ধরেছিল, তা প্রতিরোধ করা গেলো। অবশ্য আমাদের জন্যে আশ্আরীয় মতবাদের প্রভাবে মুসলিম চিন্তা জগতে যে ফলাফল দাঁড়াল, সেটীই প্রণিধানযোগ্য। প্রধানতঃ এ প্রসঙ্গে দুটী বিষয় উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) এর ফলে গ্রীক্ দর্শন সম্পর্কে স্বাধীন সমালোচনা আরব্ধ হয়। এ নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

(খ) খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আশ্আরীয়দের হাতে যখন মু'তাযিলা-বাদ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, তখন আর একটি নোতুন চিন্তা-ধারার সূত্রপাত হয়-যাকে বলা যেতে পারে ইরানীয় প্রত্যক্ষবাদ।

আল্বিরূনী [৪২] (মৃত্যু ঃ ১০৮৪ খৃষ্টাব্দ) এবং ইব্নে হাইসাম [৪৩] (মৃত্যু ঃ ১০৩৮ খৃষ্টাব্দ) সে কালীন 'প্রতিক্রিয়া কাল' সম্পর্কীয় ধারণা মারফত আধুনিক পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন বলা যায়। তাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত সব কিছুর প্রকৃতি সংক্রান্ত বিচার বিবেচনা একেবারেই পরিত্যাগ করেন এবং ধর্মীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞানীজনোচিত নীরবতা অবলম্বন করেন। অবশ্য মুসলিম চিন্তা জগতে এ রকম একটি ধারা পরিবর্তন সে কালের জন্যে অসম্ভব মনে করবার কোনো কারণ নেই; কিন্তু আল্-আশ্আরীর পূর্বে এ ধরণের কোনো পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত মনে হতো না।

পাদটিকাবলী

(১) আব্বাসীয় আমলে অনেকে গোপনে মানীয় মতবাদ মেনে চলতেন। দ্রষ্টব্য ঃ ফিহ্রিশ্ত, Leipzig, (১৮৭১), ৩৩৮ পৃষ্ঠা। T. W. Arnold সম্পাদিত Al-Mu'tazila, Leipzig (১৯০২), ২৭ পৃষ্ঠা। (এ-গ্রন্থে আবুল হুযায়ল এবং দ্বিত্ববাদী সালিহ্-এর বিতর্কের উল্লেখ আছে।) Macdonald-কৃত Muslim Theology, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

(২) মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক দেশের মানুষ দেখা যায়। অবশ্য এঁদের অনেকেই ছিলেন বংশগতভাবে অথবা বসবাসস্থাপনকারী হিসেবে ইরানীয়। এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে আখ্যাত ওয়াসিল ইবনে আ'তা ছিলেন একজন ইরানবাসী। (Brown কৃত Literary History of

Persia, ১ম খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু Von Kremer-এর মতে উমায়ীয় যুগের ধর্মীয় বাদানুবাদ থেকেই মু'তাযিলাবাদের উদ্ভব হয়। মু'তাযিলা-বাদ মূলতঃ একটি ইরানীয় আন্দোলন নয়; কিন্তু এ-ও সত্য যে ইরানে শিয়া এবং ক্বদ্‌রীয়াহ্ মতবাদের বিকাশ পরস্পর সমঝোতার মধ্যে ঘটেছিল। এ মত অধ্যাপক ব্রাউন সমর্থন করেছেন। (উক্ত পুস্তকের ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) বর্তমানে প্রচলিত শিয়া মতবাদ প্রকৃতপক্ষে বহুলাংশে মু'তাযিলা-বাদেরই নামান্তর। অন্যপক্ষে মু'তাযিলা মতবাদের বিশিষ্টতম বিরোধী হাসান আল্ আশ্‌আরীকে শিয়ারা অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে আবুল হুযায়ল প্রমুখ বিশিষ্ট মু'তাযিলাবাদীদের অনেকে ধর্মতঃ শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। (T. W. Arnold সম্পাদিত Al-Mu'tazila, ২৮১ পৃষ্ঠা।) আল্ আশ্‌আরীর অনুসারীদের অনেকেই ছিলেন ইরানীয়। (Mehren-সম্পাদিত ই'ব্‌নে আসা'বির-থেকে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।) অতএব আশ্‌আরীয় চিন্তাধারাকে খাঁটি সেমিতীয় আন্দোলনের ফল বলেও এক কথায় বলা চলে না।

(৩) কিউরেটন (Cureton)-সম্পাদিত Shahristani, ৩৪ পৃষ্ঠা।

(৪) Dr. Frankl : Ein Mu'tazilitischer Kalam, Wein (১৮৭২), ১৩ পৃষ্ঠা।

(৫) Cureton-সম্পাদিত Shahristani, ৪১ পৃষ্ঠা এবং Steiner-কৃত Die Mu'taziliten, ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) ইবনে হাযম (Cairo, ed 1) ৪র্থ খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা এবং Cureton-সম্পাদিত Shahristani ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) Steiner : Die Mu'taziliten, Leipzig, ৫৭ পৃষ্ঠা।

(৮) ঐ ৫৯, পৃষ্ঠা।

(৯) Cureton সম্পাদিত Shahristani, ৩৮ পৃষ্ঠা।

(১০) ইবনে হাযম (ed. Cairo) ৫ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

(১১) Cureton-সম্পাদিত Shahristani, ৮০ পৃষ্ঠা।

(১২) Steiner: Die Mut'aziliten, ৮০ পৃষ্ঠা।

(১৩) ইব্‌নে হাযম (ed-Cairo) ৪র্থ খণ্ড, ১৯৪—১৯৭ পৃষ্ঠা।

(১৪) ঐ, ১৯৪ পৃষ্ঠা।

(১৫) Cureton-সম্পাদিত Shahristani, ৪৪ পৃষ্ঠা।

(১৬) ইস্‌লামী যুক্তিবাদীদের 'পরমাণুবাদ' আলোচনায় আমি Arthur Biram-এর গ্রন্থ 'কিতাবুল্ মসায়েল ফিল্ খিলাফ্ বায়্‌নল বস্‌রীয়্‌য়ীন্ ওয়াল্ বাগ্‌দাদীয়্‌য়ীন'-এর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

(১৭) Macdonald কৃত Muslim Theology, ১৬১ পৃষ্ঠা।

(১৮) ইব্‌নে হাযম তাঁর 'কিতাবুল্ মিল্‌ল'-এ উল্লেখ করেছেন যে চতুর ইরানীরা আরব শাসন-শৃংখল থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অবিরত যে সব শান্তিগ্রাহ্য উপায় অবলম্বন করে চলেছিল, এ সব পাষণ্ড মতের আবির্ভাব তারই এক একটি অভিব্যক্তি। কর্দোভার এই সুবিজ্ঞ আরব ইতিহাসিকের বিস্তারিত মতামতের কিছু আভাষ পাওয়া যাবে Von Kremer-এর বিখ্যাত Geschichte der herrschenden Ideen des Islams-এর ১০-১১ পৃষ্ঠায়।

(১৯) Cureton-সম্পাদিত Shahristani, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

(২০)—(২৪) Jawidan Kabir—fol. 149 (a), 280 (a), 366 (b), 155 (b) এবং 382 (a).

(২৫) Extract from Abu Asakir (Mehren)—Travaux de la troisieme session du Congres Inernational des Orientalistes, ২৬১ পৃষ্ঠা।

(২৬) Spitta: Zur Geschichte Abul Hasan Al-Ash-ari ৪২-৪৬ পৃষ্ঠা। এই বাদানুবাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে 'ইব্‌নে খাল্লিকান' (Gottingen, ১৮৩৯)—আল্‌জুব্বায়ী-গ্রন্থে।

(২৭) Spitta: Vorwort, p. VII

(২৮) Cureton-সম্পাদিত Shahristani, ৬৯ পৃষ্ঠা।

(২৯) Martin Schreiner : Zur Geschichte dez Ashariten thums, (Huitieme Congress International des Orientalistis, 188. —৮২ পৃষ্ঠা।

(৩০) ঐ, (II me Partie 1893, ১১৩ পৃষ্ঠা।

(৩১) Macdonald-এর The Ahsarite Metaphysics : Muslim Theology, ২০১ ও পর পর পৃষ্ঠা। বর্ণনাটি মনোমুগ্ধকর। মওলানা শিব্‌লীর 'ইলমুল কালাম'—৬০, ৭২ পৃষ্ঠা।

(৩২) "লোট্‌যে (Lotze) একজন পরমাণুবাদী ; কিন্তু তিনি পরমাণুকে বস্তুমূলক বলেই মনে করেন না। কারণ, অন্য সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের মতো প্রসারণও পরমাণু সমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল স্বরূপ। অতএব এ গুণ তাদের নিজেদের থাকতে পারে না। জীবন এবং সব পর্যবেক্ষণগ্রাহ্য গুণের ন্যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রসারণও ঘটে থাকে গতির বিন্দুরাজীর সহযোগিতার ফলে। কালের বক্ষে এই গতিবিন্দুরাজীকেই ধরে নিতে হবে অনন্ত আদি-সত্বার আন্তরিক কর্ম প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ রূপে।" Hoffding, Vol. II, ৫১৬ পৃষ্ঠা।

(৩৩) মওলানা শিবলী কৃত 'ইল্‌মুল কালাম,' ৬৪, ৭২ পৃষ্ঠা।

(৩৪) Cureton-সম্পাদিত Shahristani, ৮২ পৃষ্ঠা।

(৩৫) 'ডেকার্টস্‌ (Descartes) এর Discourse Sur la methode-এর সাথে এ গ্রন্থের (আল্‌গাযালীর 'ধর্মবিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন' গ্রন্থের) সাদৃশ্য এত বেশী প্রকট যে যদি ডেকার্টস্‌-এর সময় এ বইটির কোনো অনুবাদ থেকে থাকতো, তবে প্রতিটি পাঠকই তাঁকে আল্‌গাযালীর নকলকারক বলে দুষতেন।' Lewis-কৃত History of Philosophy, Vol. II, ৫০ পৃষ্ঠা।

(৩৬) Jornal of the American Oriental Society, Vol. 20, ১০৩ পৃষ্ঠা।

(৩৭) আল্‌মুন্‌কিয্‌ মিনদ্‌দালাল, ৩ পৃষ্ঠা।

(৩৮) আত্মাসম্বন্ধে আল্‌গাযালীর ধারণার আলোচনা করেছেন স্যর

সৈয়দ আহমদ তাঁর 'আন্‌নয্‌রু ফি বা'বে মসাইলিল্‌ ইমা'মিল্‌ হুমাম আবু হামীদ আল্‌গাযালী' গ্রন্থে। (No. 4, P. 3 seq., ed. Agra.)

(৩৯) ইব্‌নে হাযম, ৫ম খণ্ড, ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা। এখানে লেখক এ মতবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করেছেন।

(৪০) 'মিশ্‌কাতুল্‌ আন্‌ওয়ার', fol. 3a.

(৪১) ঐ, fol. 10a ; নিজ যুক্তির সমর্থনে আল্‌গাযালী এখানে একটি হাদিস বাক্য উদ্ধৃত করেছেন।

(৪২) আল্‌-বিরূনী আর্যভট্ট শিষ্যদের নিম্নোক্ত নীতির সপ্রংশস উল্লেখ করেছেন ঃ "সূর্যের আলোক যে সব বস্তুর উপর পড়ে, মাত্র সে সব বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এর বাইরে যা কিছু আছে, তা অফুরন্ত ঐশ্বর্য মণ্ডিত হয়ে থাকলেও আমাদের কোনো কাজে আসবে না। কেন না, সূর্য রশ্মি যেখানে পৌঁছায় না, সেখানে আমাদের ইন্দ্রিয়াদি অচল ; আর যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয়াদি অচল, সেখানে আমাদের জ্ঞানও পঙ্গু।" এ থেকে আল্‌-বিরূনীর দর্শনবোধের পরিচয় মেলে ঃ মাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপলব্ধি এবং যুক্তিমূলক বুদ্ধির সহযোগেই আমরা নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করতে পারি। Boer's 'Philosophy in Islam', ১৪৬ পৃষ্ঠা।

(৪৩) ইব্‌নে হাইসাম-এর মতে, যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে বস্তুরূপে ধরা দেয় এবং তারপর যুক্তির আলোকে বুদ্ধির রাজ্যে রূপলাভ করে, মাত্র তা-ই সত্য। (ঐ, ১৫০ পৃষ্ঠা।)

———

চতুর্থ অধ্যায়

আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের বিতর্ক

আশ্‌আরীয়গণ কর্তৃক আরস্তু (**Aristotle**)-র 'আদি-পদার্থ' সংক্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান এবং তাঁদের স্থান-কাল ও কার্য-কারণ নীতির প্রকৃতি সম্বন্ধে নোতুন ব্যাখ্যার ফলে যে অপ্রতিরোধ্য বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তা শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী মুসলিম মনীষিদের বিভিন্ন দলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচনা যোগাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণ উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে তাঁরা কথার লড়াইয়ে শক্তি ব্যয় করতে করতে দেউলিয়া অবস্থায় উপনীত হন। এই সময়ে আরস্তু-শিষ্য নাযিমুদ্দীন আল্‌-কা'তিবী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে শাস্ত্রানুগ ধর্মীয় পণ্ডিত সংঘের থেকে পৃথক হয়ে খাঁটি দার্শনিকদলরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর 'হিক্‌মতুল আয়ন' বা 'নিগূঢ় সত্বার দার্শনিক বিচার'-গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর বাদানুবাদ আবার চরম আকার ধারণ করে। আশ্‌আরীয়রা এবং অন্যান্য আদর্শপন্থী চিন্তানেতারা সমস্বরে এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেন। এ দুই দলের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল, আমি এখন যথাক্রমে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিচ্ছি।

(ক) নিগূঢ় সত্বার প্রকৃতি

আমরা দেখতে পেয়েছি যে আশ্‌আরীয়রা মানবজ্ঞান সম্বন্ধে নিজেদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে প্রত্যেক বস্তুর নিজ বিশিষ্ট সত্বা অন্য বস্তুর সত্বা থেকে আলাদা এবং প্রত্যেকটি ভিন্নভাবে আদি-কারণ আল্লাহ্‌র দ্বারা নিরূপিত। সব বস্তুর মূল স্বরূপ একটি চির পরিবর্তন-শীল আদি পদার্থের অস্তিত্ব তাঁরা অস্বীকার করেন। তা-ছাড়া মু'তাযিলা-পন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে অস্তিত্বই হলো নিগূঢ়

সত্বার জীবন স্বরূপ। অতএব তাঁদের কাছে সত্বা ও অস্তিত্ব একই কথা। তাঁরা বল্‌লেন যে 'মানুষ একটি প্রাণী'—এই রকম একটি রায় সম্ভব হতে পারে কেবল মাত্র এর উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকার দরুণ। কেন না, এ দুই যদি একই বস্তু হতো, তা হলে রায়টি হয়ে দাঁড়াতো অকিঞ্চিৎকর; আবার দু'টি যদি সর্বতোভাবে পৃথক হ'তো, তবে কথাটিই হ'তো মিথ্যা। অতএব অস্তিত্বের বিভিন্ন আকার নির্ধারণ করতে গেলে একটি বাহ্যিক কারণের কল্পনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা অবশ্য অস্তিত্বের সীমাসীনতা বা অবস্থা নির্ভরতা স্বীকার করে নেন্; কিন্তু তাঁরা মনে করেন যে যেহেতু সকল বস্তুই একই আদি-পদার্থের সীমাসীন রূপ, অতএব নিগূঢ় সত্বার বিচারে তাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন রূপ আসলে একই। বিধেয়ের এই সংশ্লেষণ মূলক রূপায়ন সম্ভাবনা এড়াতে যেয়ে আরম্ভ-পন্থীরা যৌগিক সত্বাদির সম্ভাবনা প্রচার করেন; তাঁরা বল্‌লেনঃ 'মানুষ একটি প্রাণী'—এ ধরণের রায় সত্য; কেন না, মানবাত্মা হলো 'মানবীয়' ও 'প্রাণী সুলভ'—এ দু'টি সত্বার সমাবেশে গঠিত। আশ্‌আরীয়রা এর উপর টিপ্পনি দেন যে এ প্রস্তাব যুক্তিসহ নয়। আপনি যদি বলতে চান যে মানুষের এবং প্রাণীর পরম সত্বা এক, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনার এ কথাই বলা হলো যে সমগ্রের সত্বা যা, তার একটি অংশের সত্বাও তাই। কিন্তু তা হতে পারে না; কেন না, যদি একটি যৌগিক পদার্থের সত্বা এবং তার উপাদান সমূহের সত্বা একই হয়, তবে যৌগিক পদার্থটিকে মনে করতে হবে দুইটি সত্বা বা দুইটি অস্তিত্বের অধিকারী একটি বস্তুরূপে।

এ সব বাদানুবাদ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমগ্র বিতর্কটি হলো একটি প্রশ্ন নিয়ে—অর্থাৎ, অস্তিত্ব কি একটি কল্পনা মাত্র, না তার কোনো প্রকৃত বাস্তব সত্বা রয়েছে। যখন আমরা কোনো একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করি, তখন কি আমরা একথা বোঝাতে চাই যে বস্তুটী শুধু আমাদের সম্পর্কেই অস্তিত্বশীল (আশ্‌আরীয় মত), না বলতে চাই যে আমাদের সম্পর্ক ছাড়াও তা বিরাজমান (বাস্তববাদী মত)? এ সম্বন্ধে

আমরা দু'জনেরই যুক্তিতর্কের কিছু কিছু পরিচয় দেবো। বাস্তববাদীদের চিন্তা-ধারা নিম্নরূপ ঃ

(১) আমার নিজ অস্তিত্বের ধারণা আমার কাছে স্বতঃ-অনুভূতির ব্যাপার, কোনোরূপে প্রমাণসাপেক্ষ নয়। 'আমি আছি'—এই চিন্তাটী একটী 'ধারণা' এবং যেহেতু আমার দেহ এই 'ধারণার' একটি উপাদান, অতএব আমার দেহকে স্বভাবতঃই ধরে নেওয়া হচ্ছে একটি সত্যরূপে। যদি এই অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান স্বতঃ সাব্যস্ত না হয়, তাহলে একে উপলব্ধি করতে একটি চিন্তা-পরম্পরার প্রয়োজন দেখা দেয়; কিন্তু আমরা জানি যে তার প্রয়োজন নেই। আশ্‌আরীয়পন্থী আর্‌রাযী স্বীকার করেন যে অস্তিত্বের ধারণা স্বতঃ-সাব্যস্ত। কিন্তু তিনি এই 'অস্তিত্বের ধারণা স্বতঃসাব্যস্ত'—সিদ্ধান্তটিকে মনে করেন মাত্র একটি আহরিত জ্ঞানস্বরূপ। অন্যপক্ষে, মুহম্মদ ইব্‌নে মুবারক বুখারীর মতে, বাস্তববাদীদের সমগ্র চিন্তাপদ্ধতির মৌলিকসূত্র 'আমার অস্তিত্বের ধারণা আমার কাছে একটি স্বতঃসাব্যস্ত ব্যাপার'—এ'টীও বিতর্ক সাপেক্ষ।[১] তিনি বলেন "আমরা যদি স্বীকার করে নেই যে 'আমার অস্তিত্বের ধারণা স্বতঃসাব্যস্ত' তবে বস্তু-নিরপেক্ষ বা অমূর্ত অস্তিত্বকে এই ধারণার একটি উপাদানরূপে গ্রহণ করা চলে না। অবশ্য যদি বাস্তববাদীরা বলেন যে, কোনো বিশেষ একটি বস্তু সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি স্বতঃ-সাব্যস্ত, আমরা তা স্বীকার করে নিতে পারি; কিন্তু তা থেকে এইটি প্রমাণ হয় না যে সে বস্তুটির তথাকথিত অন্ত-নিহিত সত্বাকে বাস্তব ভিত্তিমূলক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। বাস্তব-বাদীদের সমগ্র প্রয়াসের লক্ষ্য অবশ্য এইই। বাস্তববাদী বিতর্ক আরও দাবী করে যে বস্তুতে আরোপিত গুণাবলী মনের ধারণাশক্তির অতীত থাকতেই হবে। 'বরফ শাদা'—এই কথাটির মধ্যে 'শাদাত্ব'-গুণটি আমরা বরফে আরোপ করে দেখি।" মুল্লাহ্ মুহম্মদ হাশিম হুসায়নী[২] এ-প্রসঙ্গে বলেন "এই যুক্তিবিন্যাস ভ্রমাত্মক। মন যখন বরফের উপর শুভ্রত্ব আরোপ করে, তখন সে কাজ করছে একটি খাঁটি আদর্শজগতে—শুভ্রত্বরূপ গুণের

বিবেচনায়। এখানে তাকে কোনো বস্তু-আশ্রয়ী সত্বার বিভিন্ন বাহ্যিক অভিব্যক্তিরূপ গুণাবলীর সাথে ব্যাপৃত বলে মনে করা চলে না।" এ ক্ষেত্রে হুসায়নী হ্যামিল্টন এর পথ প্রদর্শক; কিন্তু অন্যান্য বাস্তববাদীদের বিপক্ষে তিনি এই মত পোষণ করতেন যে বস্তুর তথাকথিত অজ্ঞেয় নিগূঢ় সত্বাও স্বতঃই জ্ঞান পরিধির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে, বস্তু স্বতঃই এককরূপে উপলব্ধ হয়।[৩] আমাদের উপলব্ধিতে যে সব বস্তু আসে, সেগুলির বিভিন্ন দিক আমরা একের পর এক করে দেখি না।

(২) বাস্তববাদীরা বলেন, আদর্শবাদীরা সর্বপ্রকার গুণকে মাত্র প্রত্যক সম্পর্করূপে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তাঁদের যুক্তিধারার অনুসরণ করলে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্বাকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে হয়। এ-সব সত্বা প্রতিভাত হয় কতকগুলি পরস্পর বিরোধী গুণ-সমাবেশে মাত্র। এ-সব গুণের উপলব্ধিমূলক ঘটনা সমাবেশই যেন বস্তু-সত্বার মূল। বস্তুর এই সর্বৈব বৈসাদৃশ্যে বিশ্বাস আঁকড়ে থেকেও, আদর্শবাদীরা আবার বস্তুর 'অস্তিত্বে'র মায়াও ত্যাগ করতে পারেন না। অথচ এ হলো চুপেচাপে এ সত্য মেনে নেওয়া যে অস্তিত্বের বিভিন্নরূপ অভিব্যক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই একটি নিগূঢ় মিলনভূমি রয়েছে—যাকে অন্য কথায় বলা যায় অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত সত্বা। আবুল হাসান আল্-আশ্আরী উত্তরে বলেন যে, এ-সব যুক্তি শুধু বাক্-সৌকর্যের জন্যেই প্রয়োজন; এ থেকে বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত স্বজাতীয়ত্ব প্রমাণ হয় না। বাস্তববাদীদের মতে, আদর্শবাদীদের 'অস্তিত্ব' কথাটির এমন সার্বজনীন ব্যবহারের অর্থ নিঃসন্দেহে এই দাঁড়ায় যে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব বলতে হয়তো তার নিগূঢ় সত্বাকেই বোঝায়, না হয় তার নিগূঢ় সত্বার উপর আরোপিত অন্য একটি কিছু। প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করলে, প্রকারান্তরে বস্তুসমূহের সমজাতীয়ত্বই স্বীকার করে নেওয়া হয়; কেন না, আমরা একথা বলতে পারি না যে কোন এক বস্তুর বিশিষ্ট অস্তিত্ব অন্য বস্তুর বিশিষ্ট অস্তিত্ব থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। দ্বিতীয় প্রস্তাব—অর্থাৎ, অস্তিত্ব বস্তুর নিগূঢ় সত্বার উপর আরোপিত কোনো ব্যাপার—আমাদের

নিয়ে পৌঁছায় এক অসম্ভাব্য পরিস্থিতিতে; কেননা, এ অবস্থায় সত্বাকে মনে করতে হবে অস্তিত্বের থেকে পৃথক কিছু বলে এবং আশ্‌আরীয়দের সত্বায় অস্বীকৃতি শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যেকার পার্থক্যই মুছে দেবে। অধিকন্তু, অস্তিত্ব আরোপ করবার আগে সত্বা কি ছিল? আমরা একথা কিছুতেই বলতে পারি না যে অস্তিত্বকে সত্যি সত্যি গ্রহণ করবার আগে থেকেই সত্বা এ কার্যের জন্যে তৈরি হয়ে ছিল; কেননা, এতে প্রমাণ হয় যে অস্তিত্বকে গ্রহণ করবার আগে সত্বা ছিল অনস্তিত্বরূপে। একইভাবে, যদি বলা হয় যে সত্বার অনস্তিত্ব-গুণ অবলম্বন করবার ক্ষমতা রয়েছে, তা হলেও আমরা এই অসম্ভব পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়াই যে অনস্তিত্বের আগে থেকেই সত্বা অস্তিত্বশীল রয়েছে। অতএব উভয়দিক বিচারে স্বীকার করতেই হবে যে অস্তিত্ব সত্বারই একটি দিক্ বা অংশ। তা'হলে সত্বার অন্যান্য দিকও রয়েছে; অর্থাৎ সত্বাকে একটি যৌগিক বস্তু বলে মেনে নিতে হবে। অন্যপক্ষে, অস্তিত্বকে যদি সত্বার উপর বহিরারোপিত কিছু বলে মনে করা হয়, তবে তার অবস্থা হলো অন্য-নির্ভর; অর্থাৎ সে হয়ে দাঁড়ালো একটি সাময়িক ব্যাপার। এখন যে কোনো সাময়িক বা অনিয়ত ব্যাপারের অভ্যুদয়ে একটি কারণ থাকা চাই। এই কারণই যদি সত্বা হয়ে থাকে, তবে বলতে হয় যে সত্বা অস্তিত্ব গ্রহণের আগে থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল; কেননা, অস্তিত্ব গ্রহণরূপ কার্যকারণের বেলায় কার্যের আগেই কারণ থেকে থাকতে হবে। আবার যদি অস্তিত্বের কারণ সত্বা না হয়ে অন্য কিছু হয়, তা হলে বলতে হবে যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও আল্লাহ্‌র সত্বা ছাড়া অন্য কোনো কারণে ঘটেছিল; অর্থাৎ প্রয়োজন দেখা দেয় অনিয়তরূপে। কিন্তু তা অসম্ভব।[৪] বাস্তববাদীদের এই যুক্তিতর্ক অবশ্য আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে ভুল বোঝার ফল। তাঁরা এখানে এ ব্যাপারটি অনুধাবন করছেন না যে আদর্শবাদীরা কখনও অস্তিত্বকে সত্বার উপরে বহিরারোপিত কিছু বলে স্বীকার করেন নি; বরং সব সময়েই তাঁরা অস্তিত্ব ও সত্বাকে এক বলে প্রচার করেছেন। ইব্‌নে মুবারক[৫] বলেন,

সত্বা হলো অস্তিত্বের কারণ; কিন্তু কালের গর্ভে তা পূর্বাসীন নয়। অস্তিত্বই সত্বার জীবন; তার জন্যে এ নিজের উপর ছাড়া অন্য কারুর উপর নির্ভরশীল নয়।

প্রকৃতপক্ষে, দু'পক্ষের কেউই জ্ঞানের একটি সুষ্ঠু সংজ্ঞ দিয়ে যেতে পারেন নি। 'বস্তুর ঘটনাশ্রয়ী গুণাগুণের পশ্চাতে কারণ-স্বরূপ একটি নিগূঢ়সত্বা বিরাজমান রয়েছে'—অজ্ঞেয়তাবাদ সমর্থক বাস্তববাদীদের এ ধারণায় জাজ্বল্যমান অন্তর্বিরোধ রয়েছে। এঁদের মতে, বস্তুর মূলে রয়েছে একটি অজ্ঞেয় সত্বা বা উপস্তর, যার অস্তিত্বই শুধু জ্ঞাত। অন্যপক্ষে, আশ্‌আরীয় আদর্শবাদীরা জ্ঞানের বিকাশ ধারাকে ভুল বুঝেছেন। তাঁরা জ্ঞানের রূপায়নে সংশ্লিষ্ট মানসিক ক্রিয়াকে অস্বীকার করেন এবং উপলব্ধিরাজীকে তাঁরা মনে করেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কতকগুলি পরিচিতিরূপে। কিন্তু এই পরিচিতিগুলির ক্রমবিন্যাসের পেছনে যদি একটি কারণের প্রয়োজন থাকে তবে, লক্ (Locke)-এর অনুসরণে জিজ্ঞাসা করা চলে যে এই বস্তুগুলির প্রাথমিক উদ্ভাবনের বেলাতেই বা সেই কারণের প্রয়োজন থাকবে না কেন? অধিকন্তু আশ্‌আরীয়রা কখনো চিন্তা করেন নি যে, জ্ঞানতত্ত্ব যদি শুধুমাত্র একটি উপলব্ধি বা সামনে তুলে ধরা প্রতীকাবলীর পরিচিতি মাত্রেই সমাপ্ত হয়, তবে তা থেকে আবার কতকগুলি গ্রহণ-অযোগ্য মীমাংসার সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই; যেমন ঃ

(অ) তাঁরা বিবেচনা করেন নি যে জ্ঞানকে যদি তেমনভাবে খাঁটি প্রত্যক্ষরূপে দেখা হয়, তবে ভুল ভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। যদি কোনো একটি বস্তুর অস্তিত্ব শুধু মাত্র সেটিকে যে রকমভাবে দেখানো হচ্ছে তা-ই হয়, তবে তা যা, তার ব্যতিক্রম কোনো রূপে তাকে দেখবার কোনো কারণ থাকে না।

(আ) তাঁরা একথা ভাবেন নি যে, তাঁদের জ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে মানব জগত, প্রাণীজগত বা বস্তুজগতের অন্যান্য দ্রব্যাদি দ্রষ্টার চেতনাগ্রাহ্য রূপের অতিরিক্ত আর কোনো উচ্চতর অস্তিত্বে আসীন হতে পারে না।

(ই) জ্ঞান যদি শুধুমাত্র পরিচয় গ্রহণ ক্ষমতাই হয়ে থাকে, তবে, পরিচিতির হেতুরূপ আল্লাহ্ আমাদের জ্ঞানকর্মে ক্রিয়াশীল থাকায়, আমরা কি করতে যাচ্ছি তা তাঁর জ্ঞানাতীত থেকে যাবে। আশ্‌আরীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সিদ্ধান্ত তাঁদের সমগ্র দর্শন পদ্ধতির জন্যে একেবারে প্রাণঘাতী। তাঁরা কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না যে পরিচিতি আমার (ব্যক্তির) পরিচয় পর্ব শেষ হবার পরে আল্লাহ্‌র চেতনায় যেয়ে ক্রিয়াশীল হয়।

সত্বার প্রকৃতি সম্বন্ধে আর এক প্রশ্ন হলো—এ কি উদ্ভূত না অনুদ্ভূত। আরম্ভ শিষ্যরা—প্রতিদ্বন্দ্বীদল যাঁদের দার্শনিক সংঘ বলে আখ্যায়িত করেছেন —বিশ্বাস করতেন যে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্বা অ-সৃষ্ট। আশ্‌আরীয়রা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। আরম্ভ পন্থীরা বলেন, নিগূঢ় সত্বা কোনো বাহ্যিক কার্যকারক দ্বারা চালিত হতে পারে না।[৬] আল্ কাতিবী বলেন যে, উদাহরণতঃ মানুষের নিগূঢ় সত্বা যদি বাহ্যিক কোনো কারণ থেকে উদ্ভূত হতো, তবে এটি সত্যিই মানুষের খাঁটি সত্বা কিনা তা-নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতো। কার্যতঃ আমরা তেমন কোনো সন্দেহ পোষণ করি না। অতএব এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে মানবসত্বা নিজের বাইরেকার কোনো বাহ্যিক কারণ বা ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত নয়। আদর্শবাদীরা বাস্তববাদীদের ব্যাখ্যাত 'সত্বা ও অস্তিত্বের পার্থক্যে'র উপর ভিত্তি করে প্রমাণ করতে চান যে বাস্তববাদীদের যুক্তিসূত্রে একটি অসম্ভাব্য পরিণতিতে এসে পৌঁছাতে হয়—যথা ঃ মানুষ হলো স্বয়ম্ভু; যেহেতু বাস্তববাদীদের মতে, মানুষ হলো অস্তিত্ব এবং মনুষ্যত্ব—এ দু'টি অ-সৃষ্ট সত্বার সমাহার।

(খ) জ্ঞানের প্রকৃতি

আরম্ভপন্থীরা সত্বার স্বাধীন বাস্তব অস্তিত্ববাদের আলোকে জ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন "বাহ্যিক বস্তুর প্রতিকৃতি গ্রহণ" বলে।[৭] তাঁদের মতে, বাহ্যতঃ অবাস্তব অথচ অন্যান্য গুণে ভূষিত বস্তুর ধারণা করা চলে। কিন্তু যখন আমরা এ বস্তুতে অস্তিত্ব আরোপ করি, তখন তার অস্তিত্ব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে; কেননা, কোনো বস্তুর গুণের স্বীকৃতি সেই বস্তুটির স্বীকৃতিরই

একদিক। অতএব যদি কোনো বস্তুতে অস্তিত্ব আরোপ সে বস্তুর প্রকৃত বাস্তব অস্তিত্বকে প্রয়োজনীয় করে না তোলে, তা হ'লে বাহ্যিকতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করাই হলো। এ স্থলে বস্তুটি মনের ক্ষেত্রে মাত্র একটি ধারণারূপে অবস্থান করছে বলে ধরে নিতে হয়। ইব্‌নে মুবারক বলেন "কিন্তু কোনো একটি বস্তুকে স্বীকৃতি দেওয়াই সে বস্তুর অস্তিত্বের নামান্তর।" আদর্শবাদীরা স্বীকৃতি ও অস্তিত্বকে ভিন্ন চোখে দেখেন না। এ যুক্তি থেকে বস্তুটি অন্তরের রাজ্যে বিরাজ করছে বলে ধরে নেওয়া যথার্থ হবে না। "আদর্শ" অস্তিত্বের প্রশ্ন উঠে বাহ্যিকতাকে অস্বীকার করবার ফলে; কিন্তু আশ্‌আরীয়রা বাহ্যিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না; কেন না, তাঁদের মতে, জ্ঞান হলো যিনি জানবেন এবং যা জানা হবে—এ দুয়ের মধ্যেকার সম্‌পর্ক; এবং এ সম্‌পর্ক বাহ্যিক। "বস্তুটির যদি বাহ্যিক অস্তিত্ব না থাকে, তবে তার আদর্শ অস্তিত্ব বা মানসিক অস্তিত্ব থাকতে হবে"—আল্‌ কাতিবীর এই সিদ্ধান্ত আত্মবিরোধী; কেন না, তাঁর প্রতিষ্ঠিত নীতিসূত্রে, কল্পনার রাজ্যে যার অস্তিত্ব রয়েছে, বাহ্যিক জগতে তার অস্তিত্ব থাকতেই হবে।[৮]

(গ) অনস্তিত্বের প্রকৃতি

'যা অস্তিত্বশীল তা ভাল, এবং যা অনস্তিত্বশীল তা মন্দ'[৯] সমসাময়িক দার্শনিকদের সাধারণভাবে গৃহীত এ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা ও সমালোচনাচ্ছলে আল্‌-কা'তিবী বলেন, হত্যা করা এ জন্যে অন্যায় নয় যে হত্যাকারী তা করতে ক্ষমতাবান; অথবা হত্যাস্ত্র কাটবার মতো ধারাল; অথবা হতব্যক্তির ঘাড় খণ্ডনযোগ্য। এ অন্যায়, কেন না এতে জীবনকে অস্বীকার করা হয়েছে। এ অবস্থা অনস্তিত্ববাচক, এবং উপরে বর্ণিত অস্তিত্ববাচক অবস্থাবলীর অনুরূপ নয়; কিন্তু অন্যায় যে প্রকৃতপক্ষে অনস্তিত্ববাচক, তা বোঝাবার জন্যে প্রয়োজন একটী পুরোপুরি আগম শাস্ত্রীয় আলোচনা এবং সাথে সাথে অন্যায়ের সর্ব-প্রকার অভিব্যক্তির বিচার। কিন্তু এ রকম সর্বাঙ্গীন আলোচনা অসম্ভব; অথচ আংশিক আলোচনাতে বিতর্কের মীমাংসা হয় না। অতএব আল্‌-কা'তিবী এই সিদ্ধান্ত নাকচ্‌ করে ঘোষণা করেন যে 'অনস্তিত্ব হলো নির্ঘাত

নাস্তি' (absolute nothing)। [১০] তাঁর মতে, সম্ভাব্য সত্বাসমূহ অস্তিত্ব অর্জনের অপেক্ষায় অন্তরীক্ষের কোথাও (somewhere in space) জড়ো হয়ে আছে—এ রকম কিছু মনে করা চলে না। তা'হলে অন্তরীক্ষে জড়ো হয়ে থাকবার অর্থ হতো অস্তিত্বের অতীতে অবস্থান করা। কিন্তু তাঁর সমালোচকেরা বলেন যে, এই যুক্তি খাটে মাত্র তখনই, যখন আমরা মনে করি যে অন্তরীক্ষে স্থিতি আর অস্তিত্ব একই কথা। ইব্‌নে মুবারক বলেন, বহির্দেশে স্থিতির ধারণা অস্তিত্বের চেয়ে প্রশস্ততর। সকল অস্তিত্বই বাহ্যিক ; কিন্তু যা কিছু বাহ্যিক তা সর্বক্ষেত্রে অস্তিত্বশীল না হতেও পারে।

মৃতের পুনর্জীবন লাভ সংক্রান্ত মতবাদ নিয়েও আশ্‌আরী পন্থীরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের জগতে পুনরাবির্ভাবের এই সম্ভাবনা সমর্থন করতে যেয়ে তাঁরা এই এক বাহ্যতঃ অসম্ভাব্য নীতি প্রচার করেন যে 'অনস্তিত্ব অথবা অসত্বার সত্বা রয়েছে'। তাঁদের মতে, যেহেতু আমরা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে মতামত পোষণ করি, অতএব তা জ্ঞাত ; আর এই যে একটি অনস্তিত্বশীল বস্তু জ্ঞাত হলো, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তা একেবারে অনস্তিত্বশীল নয়। জ্ঞাতব্য হলো স্বীকৃতিযোগ্য এবং যেহেতু অনস্তিত্ব জ্ঞাতব্য, অতএব তা স্বীকৃতিযোগ্য। [১১] আল্‌-কা'তিবী 'কোনো বস্তু জ্ঞাতব্য হলেই স্বীকৃতিযোগ্য হবে'—এ ধারণা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, অনেক অসম্ভব ব্যাপার আছে যা জ্ঞানগম্য, কিন্তু বাহ্যিক জগতে অস্তিত্বহীন। আর্‌রা'যী এ যুক্তির প্রতিবাদে বলেন, আল্‌-কা'তিবী এ বিষয়ে অজ্ঞ যে নিগূঢ় সত্বা অন্তরে অবস্থান করে ; কিন্তু তবুও তা বাহ্যিকরূপে জ্ঞাত। আল্‌-কাতিবী মনে করেন যে কোনো বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের ফলে সে বস্তুর স্বাধীন বাস্তব অস্তিত্ব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া, এ-ও মনে রাখতে হবে যে আশ্‌আরী-পন্থীরা একদিকে অস্তিবাচক ও অস্তিত্বমূলক এবং অন্যদিকে নাস্তিবাচক ও অনস্তিত্বমূলক বস্তু ও বিষয়ের বিভিন্নতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। তাঁরা বলেন, সব অস্তিত্বমূলক বস্তুই অস্তিবাচক ; কিন্তু তার উল্টোটা সত্য নয়। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি সম্পর্ক আছে। কিন্তু অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচকের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকতে

পারে না। আল্-কাতিবীর মতো "আমরা বলি না যে যা অসম্ভব তা অনস্তিত্বশীল ; আমাদের মতে, যা অসম্ভব তা হলো নাস্তিবাচক মাত্র।" যে সব বস্তু অস্তিত্বশীল, সে সবকে অস্তিবাচক বলতে হবে। যে গুণকে বস্তু-নিরপেক্ষরূপে ধারণা করা যায় না, তা অস্তিত্বশীলও নয়, অনস্তিত্বশীলও নয় – এ দুয়ের মধ্যে। সংক্ষেপে আশ্আরীয় সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ—

যে কোনো কিছুরই প্রমাণ আছে, অথবা নাই। যদি না থাকে, তবে সে বস্তু নাস্তিবাচক। যদি তার অস্তিত্বের প্রমাণ থাকে, তবে তা হয়ত বস্তুবাচক, না হয় গুণ বাচক। যদি তা' বস্তুবাচক হয় এবং গুণভূষিত হয়, তা হলে তা অস্তিত্বশীল ; আর যদি তা বস্তুবাচক অথচ অনস্তিত্ব গুণ ভূষিত হয়, তবে তা অনস্তিত্বশীল। (অস্তিত্বগুণ ভূষিত হওয়া মানে উপলব্ধি গোচর হওয়া ; এবং অনস্তিত্ব গুণ ভূষিত হওয়া মানে উপলব্ধিগোচর না হওয়া।) যদি ব্যাপারটী গুণবাচক হয়, তবে তা অস্তিত্বশীলও নয়, অনস্তিত্বশীলও নয়। [১২]

পাদটিকাবলী

(১) মুহম্মদ ইব্নে মুবারক কৃত 'হিক্মতুল আয়ন'-এর ভাষ্য, fol. 5a.

(২) হুসায়নী কৃত 'হিক্মতুল আয়ন'-এর ভাষ্য, fol. 13a.

(৩) ঐ fol. 14b.

(৪) ইব্নে মুবারক-ভাষ্য, fol. 8b.

(৫) ঐ, fol. 9a.

(৬) ঐ, fol. 20a.

(৭) ঐ, fol. 11a.

(৮) ঐ, fol. 11b.

(৯) ঐ, fol. 14a.

(১০) ঐ, fol. 14b.

(১১) ঐ, fol. 15a.

(১২) ঐ„ fol. 15b.

———

পঞ্চম অধ্যায়

সূফী দর্শন

(১) সূফীদর্শনের অভ্যুদয় এবং কুর্‌আন সমর্থিত রূপ

জ্ঞানর্চ্চার বিভিন্ন শাখায় প্রভাব-পরম্পরা আবিষ্কার করবার আগ্রহ আজকাল প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের একটা ফ্যাসন-এ দাঁড়িয়েছে। এ পদ্ধতির ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য প্রচুর। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে মানব মনের একটা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং সে নিজেথেকে অনুপ্রাণিত হয়েই নিজ স্বাভাবিক গতিতে এমন সব সত্য আবিষ্কার করতে পারে, যা হয়তো যুগ যুগ পূর্বে অন্যের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। কোনো আদর্শ-বাদই একটি জাতির আত্মার উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যা তার নিজস্ব নয়। বাহ্যিক প্রভাব তাকে গভীর সুপ্তি বা চিত্ত বৈকল্য থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে; কিন্তু তার এমন শক্তি নেই যে, যেখানে কিছুই নেই, সেখানে সে বড় একটা কিছু গড়ে তুলবে।

ইরানীয় সুফীদর্শনের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে; এবং এই বিশেষ আকর্ষনীয় গবেষণাক্ষেত্রে প্রায় সব সুযোগ্য এবং সুচতুর পণ্ডিত ব্যক্তিই সুফীদর্শনের মৌলিক ভাবগুলি কোন্ দেশ থেকে কোন্ পথে এখানে এসে জড়ো হলো তা দেখতে প্রচুর আয়াস স্বীকার করেছেন। মনে হয় তাঁরা এ নীতি সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়েছেন যে একটি জাতির বুদ্ধি বৃত্তির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যে ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলে, সেগুলির পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারা মাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন সে জাতির চিন্তাক্ষেত্রে, রাজ-নীতিতে এবং সামাজিক জীবনে বিরাজমান অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দেখা হয়। বলতে গেলে জাতির অন্তর্জীবনের বিকাশ এ সব প্রাক্-বিরাজমান অবস্থারই অবশ্যম্ভাবী ফল বা প্রতিক্রিয়া। ফন্‌ক্রেমার (Von Kremer) এবং ডোযী (Dozy) সুফীবাদকে ভারতীয় বেদান্তের

সন্তান বলে মনে করেন; মার্কস্ (Merx) এবং নিকল্সন বলেন, এর অভ্যুদয় নিও-প্লেটনিস্‌ম্ থেকে; আবার অধ্যাপক ব্রাউন এক সময়ে মনে করতেন যে হৃদয়াবেগ বর্জিত সেমিতীয় ধর্ম পদ্ধতির বিরুদ্ধে এ হলো একটি আর্যজাতিসুলভ প্রতিক্রিয়া। যা হোক আমার মনে হয় যে এ মতামতগুলি কার্য কারণ সম্পর্কের এমন একটি ধারণার বশে গড়ে উঠেছে, যা মূলতঃ ভ্রান্তিপূর্ণ। একটী নির্দিষ্ট সংখ্যা 'ক' আর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা 'খ'-এর কারণ বা জনক, এধরণের কোনো সূত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। কিন্তু দার্শনিক বিচারে এথেকে সমগ্র অনুসন্ধিৎসার মূলে আঘাত পড়ে; কেন না, এক্ষেত্রে একটি ঘটনার পেছনে যে অসংখ্য অবস্থাবলী বিরাজমান, সে সত্য পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। উদাহরণতঃ একথা বললে একটি ঐতিহাসিক ভুল তথ্য পরিবেশন করা হবে যে রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটে বর্বরদের আক্রমণের ফলে। রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক একতাবিরোধী আরও বহুতর বিভিন্ন প্রকৃতির কারণ যে এতে প্রচ্ছন্ন ছিল, উপরের কথায় তার সব কিছুই অস্বীকৃত। রোমীয় সাম্রাজ্য বর্বর অভিযানের অনেকখানিই বরদাস্ত করে করে নিয়েছিল এবং আরও করতে পারতো। এমতাবস্থায় তর্কশাস্ত্রের বিবেচনায় বর্বর অভিযানকে রোমীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করা একবাক্যে অবিধেয় বলে ঘোষিত হবে। অতএব আমাদের উচিত, এক্ষেত্রে যথার্থভাবে প্রযোজ্য হেতুবাদের আলোকে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ ও নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম জীবনে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থাবলী বিরাজ করছিল, সুফী দর্শনের অভ্যুদয় কালীন সে সব অবস্থার প্রধান প্রধান দিকগুলি মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করা। এর পর হবে সুফিবাদের দার্শনিক যুক্তিযুক্ততার আলোচনা সত্যিকারভাবে প্রাসঙ্গিক।

(অ) ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, সময়টি ছিল একটি রাজনৈতিক অশান্তির যুগ। রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে উম্মীয় রাজশক্তি গদিচ্যুত হয়। এরপর অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগের দিকে দেখা দেয়, এক

পক্ষে যেন্দিক্ বিতাড়ন আন্দোলন এবং অন্য পক্ষে ইরানীয় প্রচলিত ধর্মাচরণ বিরোধী (heretics)দের বিদ্রোহ (সিন্দবাহ্ঃ ৭৬৬-৬৬৮ ; খোরাসানের মুখোসধারী পয়গম্বর ঃ ৭৭৭-৭৮০)। এদের কর্মপদ্ধতি ছিল আমাদের সময়কার Lamennaisদের মতো, অজ্ঞ জনসাধারণের ভক্তিবিশ্বাস অর্জন করে ধর্মীয় মুখোসের আড়ালে রাজনৈতিক অভিষ্ট সিদ্ধি। পরবর্তীকালে নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে হারুন উর রশীদ-এর দুই পুত্র মা'মুন ও আমীনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের জন্যে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। আরও পরে মযদকীয় নেতা বাবক্ (৮১৬-৮৩৮ খৃষ্টাব্দ)-এর পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহের সংঘাতে ইসলামী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মা'মুনের রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর আর একটি সবিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনে ব্যয়িত হয়। এই শুয়ূবিয়াহ্ বাদানুবাদ ৮১৫ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হয়ে স্বাধীন ইরানীয় রাজপরিবারাবলী তা'হিরীয় (৮২০ খৃষ্টাব্দ), সাফ্ফারীয় (৮৬৪ খৃষ্টাব্দ) এবং সামানীয় (৮৭৪ খৃষ্টাব্দ) এর প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এ সব এবং অনুরূপ রাজনৈতিক বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের ফলে সমাজদেহে প্রতিনিয়ত যে অশান্তি চলছিল, তা থেকে বাঁচবার জন্যেই ধর্মভাবাপন্ন ও চিন্তাশীল প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সাংসারিক জীবনযাত্রা ত্যাগ করে উত্তরোত্তর বুদ্ধিবৃত্তির গভীর থেকে গভীরতর শান্তিময় নির্জনতার দিকে প্রয়াণ করেছিলেন। এই প্রাথমিক যুগের মুসলিম বৈরাগ্যপন্থীদের জীবন ও চিন্তাধারার সেমিতীয় বৈশিষ্ট ধীরে ধীরে কমবেশী আর্যভাবাপন্ন উদারচিত্ত সর্বেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হতে লাগলো। এ স্থলে লক্ষ্যণীয় যে, এই ধীরস্থির ক্রমরূপায়ণ এবং অন্য পক্ষে ইরানের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিকে প্রগতি প্রকৃতপক্ষে সমান্তরাল রেখাপথেই চলেছিল।

(আ) ইসলামী যুক্তিবাদে সংশয়প্রবণতার প্রথম বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখা দেয় বুশ্শার ইবনে বুর্দ্-এর রচনায়। এই ইরানীয় সংশয়বাদী অন্ধ কবি অগ্নিতে দেবত্ব আরোপ করেছিলেন এবং অ-ইরানীয় সর্বপ্রকার চিন্তাধারাকে

প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করতেন। যুক্তিবাদের অন্তঃস্থলে সংশয়বাদের যে বীজ লুকিয়ে ছিল, তার বিকাশের সাথে সাথে দেখা দিল জ্ঞানের আর এক অতি-প্রাজ্ঞিক উৎসের প্রয়োজনীয়তা, যার দৃঢ় সমর্থন রয়েছে 'রিসালায়ে আল্-কুশায়রী'-তে (৯৮৬ খৃষ্টাব্দ)। আমাদের কালেও কা'ন্ট (Kant)-এর 'ক্রিটিক্ অব্ পিওর রীয্ন্' (Critique of Pure Reason)এ ব্যাখ্যাত নেতিবাচক পরিণতি থেকে নিস্তার পাবার জন্যে জেকোবী (Jacobi) ও শ্লেয়ারম্যাকার (Schleirmacher) শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসকে আদর্শের সত্যতা-অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হন। এই মনোভাব থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সংশয়বাদী দার্শনিক ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ মনের সেই রহস্যাশ্রয়ী অবস্থার সন্ধান পান "যার মধ্যে আমরা চেতনার লালন করি এবং জীবনবোধের দেখা পাই" তাতে।

(ই) আল্-মা'মুনের মৃত্যুর পর মুসলিম জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ভাবাবেগবর্জিত ও নিষ্ঠাপ্রবণ মযহাবী শাসন শৃঙ্খলা—যেমন: হানাফী মযহাব (প্রবর্তক: ইমাম আবু হানিফা, মৃত্যু ৭৬৭ খৃষ্টাব্দ); শাফেয়ী মযহাব (প্রবর্তক: ইমাম আশ্শাফেয়ী, মৃত্যু ৮২০ খৃষ্টাব্দ); মা'লিকী মযহাব (প্রবর্তক: ইমাম আল্মা'লিক, মৃত্যু ৭৯৫ খৃষ্টাব্দ) এবং আল্লাহ্তে মানব প্রকৃতি আরোপকারী, মুসলিম ধর্মীয় জগতে স্বাধীন চিন্তার কঠোরতম বিরোধী হাম্বলী মযহাব (প্রবর্তক ইমাম ইব্নে হাম্বল, মৃত্যু ৮৫৫ খৃষ্টাব্দ)।

(ঈ) আল্মা'মুনের উদ্যমে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয়দের মধ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বিচার বিতর্ক—বিশেষ করে, আশ্আরীয় এবং মু'তাযিলীয়দের মধ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বাদানুবাদ। এ সবের ফলে ধর্মীয় চিন্তা যে শুধুমাত্র কয়েকটি সংকীর্ণ মযহাব বা সংস্থায় আবদ্ধ হয়েছিল, তা নয়; তার সাথে সাথে সাধারণ সুবুদ্ধিশীল ব্যক্তিদের মনে এ সব সাম্প্রদায়িক কোন্দল থেকে বেঁচে থাকবারও প্রবল প্রয়াস দেখা দিয়েছিল।

(উ) আব্বাসীয় যুগের প্রাথমিক দিকে যুক্তিবাদের প্রসারের ফলস্বরূপ

সমাজমনে ধর্মীয় প্রেরণা ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে। তদুপরি, দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধির ফলে এসময়ে সমাজের উচ্চস্তরে নৈতিক অবনতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা দেখা দেয়।

(ঊ) দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রণালী হিসেবে পারিপার্শ্বিক খৃষ্ট ধর্মের প্রভাব। প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টীয় ধর্মীয় আদর্শের চেয়ে খৃষ্টীয় সাধুদের জীবন-যাপন প্রণালীই প্রাথমিক যুগের মুসলিম ধর্মানুরাগী ব্যক্তিদের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। খৃষ্টীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের এই পরিপূর্ণ সংসার বিরাগ মুসলিম সাধক জীবনে প্রবলভাবেই সংক্রমিত হয়েছিল। অবশ্য বাহ্যতঃ এ যতই আকর্ষণীয় হোক্ না কেন, আমার মতে, এ মনোবৃত্তি নিঃসন্দেহে ইসলামের মর্মবিরোধী।

এসব পরিপার্শ্বিক ভাবধারা ও ঘটনা সমাবেশের মধ্যেই স্থফি-দর্শনের জন্ম। অতএব এর বিকাশের গতি প্রকৃতি সত্যিকারভাবে অনুধাবন করতে হলে এসব অবস্থার সম্মিলিত ফলাফলের দিকেই আমাদের নযর দিতে হবে। এসব অবস্থার সাথে ইরানীয় মনের সহজাত অদ্বৈতবাদ প্রবণতার কথা স্মরণ রাখলে স্থফি-দর্শনের জন্মতত্ব বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না। এখন আমরা যদি নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌-এর উদ্ভব প্রাক্‌কালীন অবস্থাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখতে পাব যে সে ক্ষেত্রেও এক ধরণের অবস্থা থেকে একই ধরণের ফললাভ হয়েছিল। যে বর্বর উপদ্রব প্রাসাদবাসী সম্রাটদেরকে শিবিরে রাত্রিযাপনে অভ্যস্ত করে তুলেছিল, তা সবিশেষ গুরুত্ব সঞ্চয় করে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে। প্লটিনাস্ (Plotinus) নিজেই ফ্ল্যাক্‌কাস (Flaccus)-কে লিখিত এক পত্রে [১] তাঁর সময়কার রাজনৈতিক অশান্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি জন্মভূমি অ্যালেকযান্দ্রিয়ায় নিজ চতুষ্পার্শে তাকিয়ে দেখলেন যে সেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল মনোভাব এবং ধর্মীয় জীবনের প্রতি অমনোযোগ বিরাজ করছে। ইতিমধ্যে রোম প্রায় সর্বদেবতার পূজামণ্ডপে পরিণত হয়েছে। তিনি রোম নগরীতে দেখলেন যে সেখানেও জীবন ও নীতির প্রতি একটি

তাচ্ছিল্যভাব এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে চরিত্রহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে। অধিকতর বিদ্বান-চক্রের মধ্যে দর্শন শাস্ত্র নিজ বৈশিষ্ট হারিয়ে সাহিত্যের একটি বিভাগ হিসেবে অধীত হচ্ছে। অ্যান্‌টিও-কাস (Antiochus) এর অনুসরণে সংশয়বাদ ও নিস্পৃহতাবাদের সংযোগ সাধন করে সেক্‌স্‌টাস এমপিরিকাস (Sextus Empiricus) প্রায় পীরো (Pyrrho) প্রবর্তিত নিরেট সংশয়বাদে যেয়ে পৌঁছান এবং ঘোষণা করেন যে নিশ্চিত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। এই পরিপূর্ণ হতাশা ব্যঞ্জক চিন্তাভাবনার সম্মুখীন হয়ে প্লটিনাস সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রকৃত সত্য মানুষের চিন্তাস্তরের ঊর্ধে অবস্থিতিশীল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মারফত্‌ই মাত্র লভ্য। খৃষ্টীয় সাধুসন্ন্যাসীরা দীর্ঘকাল ধরে সহস্র প্রকার উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য করেও সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্যে তাঁদের প্রেম ও বাৎসল্যমূলক ধর্মের সন্দেশ বিতরণে ব্যাপৃত ছিলেন। একদিকে স্টোয়ীয় (Stoic)দের কঠোর আপোষহীন নীতিনিষ্ঠা এবং সংসারের সুখ দুঃখের প্রতি সমভাবে ঔদাসিন্য, অন্যদিকে এই খৃষ্টধর্মাবলম্বী সাধুব্যক্তিদের প্রেম ও শান্তি প্রচারণা—সর্বোপরি এ দুইয়ের সম্মুখীন হয়েই এ কালের দার্শনিকদেরকে তাঁদের মজ্জাগত প্রতীকবাদ এমন একটি নবতর ব্যাখ্যা দিয়ে দাঁড় করাতে হলো, যাতে, তার ফলে, একাধারে জাতির পূর্বেকার জীবনাদর্শের পুনরুজ্জীবন এবং নোতুন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের নিষ্পত্তি—দুই-ই লাভ হয়। কিন্তু নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌ ছিল একটি বিশেষভাবে প্রাজ্ঞানিকতাপুষ্ট মতবাদ [২] এবং সে কারণে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ছিল তার কম। শিক্ষা ও সভ্যতায় পশ্চাৎপদ বর্বরদের কাছে এর তত্ত্ব তাৎপর্য যেয়ে পৌঁছালো না। অন্যদিকে খৃষ্টধর্মের নৈতিক শক্তির কাছেও এ ব্যবহারিক জীবনে দাঁড়াতে পারলো না। ফলে নির্যাতিত খৃষ্টানদের জীবন যাপন ও নীতিনিষ্ঠার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এ বিজেতৃদল বিজীতদের ধর্ম গ্রহণ করলো এবং এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপর নোতুন সাম্রাজ্য গঠনে আত্মনিয়োগ করলো। ইরানেও বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন, সংঘাত ও ভাববিনিময়ের ফলে

চিন্তাজগতে যে নবতর স্ফূরণ আরম্ভ হয়, তাতে কোনো কোনো মুসলিম দার্শনিকের মনে ইসলামের একটি অনুরূপ পুনর্ব্যাখ্যার ঝাপসা আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। এতদিনে ইসলামী চিন্তাধারায় খৃষ্টীয় জ্ঞানবাদীদের চিন্তাভাবনার অনেককিছু ঢুকে পড়েছে ; এমনকি, ক্বুর্আন থেকেও এসব ধারণা ও আদর্শের দৃঢ় সমর্থন প্রমাণিত হয়েছে। গ্রীক্ চিন্তাশ্রয়ী কুস্তুমকোরক খৃষ্টীয় তপশ্বাসে উবে গেলো ; কিন্তু ইব্নে তায়্মিয়ার মরু-সাইমূম তার দহনশক্তি নিঃশেষ করেও ইরানের গোলাবকুঞ্জে পৌঁছাতে পারলো না। একটি বর্বর অভিযান প্রবাহে সম্পূর্ণরূপে ভেসে গেলো ; অন্যটি তাতার-বিপ্লবকে হেলায় উপেক্ষা করে আজতক্ আত্মরক্ষা করে চলেছে।

সূফিদর্শনের আলোকে ইসলামের পুনর্ব্যাখ্যা কি করে যে এমন আশ্চর্যজনক সজীবতা লাভ করেছিল, তা বুঝতে হলে সূফিবাদের সর্বগ্রাহী রূপের দিকে নজর দিতে হয়। পারত্রিক মুক্তির সেমিতীয় ব্যবস্থাপত্র এক কথায় হলো ঃ "তোমার ইচ্ছাকে রূপান্তরিত কর।" এ থেকে বোঝা যায় যে, সেমিতীয় বিচারে ইচ্ছাই হলো মানবাত্মার নির্যাস। পক্ষান্তরে, ভারতীয় বেদান্তবাদী শিক্ষা দেন যে, আমাদের সব কষ্ট হলো বিশ্বজগতের প্রতি ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। অতএব তার নির্দেশ হলো ঃ চিন্তা বা বুদ্ধির রূপান্তর ; অর্থাৎ তার মতে, মানবপ্রকৃতির পরম অভিব্যক্তি হলো চিন্তায়—কর্মে বা ইচ্ছায় নয়। কিন্তু সূফীরা বলেন যে, শুধুমাত্র ইচ্ছা বা চিন্তার রূপান্তর সাধনেই শান্তি লভ্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে অনুভূতির সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করেই আমাদের ইচ্ছা এবং চিন্তা—দু'য়েরই রূপান্তর সাধন করতে হবে। কেন না, ইচ্ছা এবং চিন্তা—এ হলো অনুভূতিরই দুই বিশিষ্ট দিক্। সূফীর বাণী হলো ঃ "সবাইকে ভালবাস ; অন্যের উপকার করবার বেলায় নিজের ব্যক্তিত্বকে ভুলে যাও।" রূমী বলেন ঃ "মানুষের হৃদয় জয় করাই হলো প্রকৃত হজ্জ্। একটি হৃদয় এক সহস্র কা'বার চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। কা'বা হলো ইব্রাহিমের গৃহমাত্র ; আর মানুষের হৃদয় আল্লাহ্র নিবাস।" কিন্তু এই সূত্র থেকে প্রশ্ন উঠে 'কেন ?' এবং 'কি করে ?'

বুদ্ধি আশ্রয়ী মানব মন খোঁজে প্রাজ্ঞানিক যৌক্তিকতা এবং ইচ্ছাকে পরিচালিত করবার জন্যে একটি কর্মপদ্ধতি। সুফিবাদের কাছে এ দুটিই লভ্য। সেমিতীয় ধর্ম হলো জীবন-যাপন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন সমাহার; আবার ভারতীয় বেদান্ত হলো একটি নির্ভেজাল চিন্তাসূত্র। সুফিবাদ দু'দিক্‌কারই মনস্তাত্বিক অসম্‌পূর্ণতা এড়িয়ে যেয়ে, প্রেমের উচ্চতর পর্যায়ে সেমিতীয় ও বেদান্তীয় ভাবধারাকে একসূত্রে গ্রথিত করবার চেষ্টা করে। একদিকে এ যেমন বৌদ্ধদের নির্বানের ('ফনা' ঃ আত্ম বিলোপন) ধারণাকে আত্মস্থ করে তার উপর নিজের প্রাজ্ঞানিক সৌধ গড়ে তুলেছে, অন্যদিকে আবার ইসলাম থেকেও যাতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করতে হয় সেজন্যে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যার সূত্রাদি সে ক্কুর্‌আন থেকে সপ্রমাণ করেছে। ইরানের ভৌগোলীক অবস্থিতির মতোই, সুফিবাদের অবস্থিতি হলো সেমিতীয় ও আর্যসংস্কৃতির মাঝামাঝিতে। অতএব সে সহজেই দু'পক্ষ থেকে প্রয়োজনানুযায়ী আহরণ করেছে এবং দু'পক্ষকেই নিজের দানও অকাতরে বিলিয়েছে। অবশ্য-সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হবে যে সুফিবাদ আন্তরিকভাবে সেমিতীয়ের চাইতে আর্য-সংস্কৃতিরই অধিকতর নিকটবর্তী। অতএব বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, মানব প্রকৃতিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে অবলোকনই হলো সুফিবাদের মর্মকথা; এবং এখানেই রয়েছে তার প্রবল জীবনীশক্তির উৎস। এই মানব প্রকৃতির উপর সামগ্রিক প্রভাবের ফলেই, গোঁড়া শাস্ত্রানুসারীদের প্রতিরোধ ও নির্যাতন এবং রাজনৈতিক বিপ্লবাদি অতিক্রম করে সুফিবাদ আজও অপ্রতিহত। জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ মহিমায় ভাস্বর, অথচ চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে অবারিতদ্বার—এই-ই হলো সুফিদর্শনের অপরূপ বৈশিষ্ট্য।

সুফী লেখকেরা ক্কুর্‌আনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি ভাবে তাঁদের দর্শন পদ্ধতির সমর্থন প্রমাণ করেন, এখন আমি সে বিষয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করবো। হয্‌রত রসুলুল্লাহ্‌ যে আলী বা আবু বকরকে ব্যক্তিগত ভাবে কতকগুলি আধ্যাত্মিক গুপ্ত তথ্য দিয়ে গিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে, তার মূলে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। কিন্তু সুফীরা দাবী করেন যে,

হয্‌রত রসূলুল্লাহ্‌ কিতাবীয় শিক্ষার অতিরিক্ত আর এক ধরণের আধ্যাত্মিক নিগূঢ় 'জ্ঞানে' বিভূষিত ছিলেন, যার প্রমাণ কুর্‌আন-এর নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যায় :

"এবং আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি আমাদের বাক্যাবলী তোমাদের কাছে পাঠ করেন, তোমাদের পবিত্রতা সাধন করেন, তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন এবং তোমরা আগে যা জানতে না, তা তোমাদের শিক্ষাদান করেন।" [৩]

তাঁদের মতে এ আয়াত-এ যে 'জ্ঞানে'র উল্লেখ করা হয়েছে, তা 'কিতাব'-এর অন্তর্গত শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত নয় ; কেন না, হয্‌রত রসূলুল্লাহ্‌ বারবার বলেছেন যে কিতাবীয় শিক্ষা তাঁর পূর্বেকার পয়গম্বরেরাও প্রচার করে গেছেম। 'জ্ঞান' যদি কিতাবীয় শিক্ষার অন্তভূ'ক্ত হতো, তবে, তাঁদের কথায়, এখানে তার আলাদা উল্লেখ পুনরুক্তিমূলক হয়ে পড়তো। অবশ্য আমার মতে, কুর্‌আন ও সহীহ্‌ হাদিস-এ যে সূফিবাদের সমর্থনসূচক ধারণা রয়েছে, তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু আরব জাতির একান্ত ব্যবহারিক প্রতিভার কাছে এ বাণী জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ইসলাম বিদেশ-ভূমিতে যেয়ে যখন নোতুন উর্বর মাটির সন্ধান পেলো, তখন সূফিবাদের বিকাশ ও পরিপূর্ণ রূপগ্রহণ স্বাভাবিকরূপে দেখা দিল। 'মুসলিম'-এর সংজ্ঞা দিতে যেয়ে কুর্‌আন বলছে : যারা অদৃশ্য (আল্লহ্‌)-তে বিশ্বাস স্থাপন করে, দৈনিক উপাসনায় অবিচল থাকে এবং আমরা তাদের যা দিয়েছি তা থেকে (মুক্ত হস্তে সৎকার্যে) ব্যয় করে।" [৪] কিন্তু প্রশ্ন উঠে 'অদৃশ্য কি এবং কোথায়'—তা নিয়ে। কুর্‌আন-এ বলা হয়েছে : তিনি তোমার আত্মাতেই আছেন—"এবং যারা বিশ্বাসী, তাদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাদি রয়েছে, এবং তোমার নিজের মধ্যেও ;—কি ! তোমরা কি তা দেখ না ?" [৫] আবার "(মানুষের) গর্দানের শিরার চেয়েও আমরা তার নিকটতর।" [৬] অনুরূপ ভাবে পবিত্র গ্রন্থ শিক্ষা দেয় যে 'অদৃশ্যের' নিগূঢ় প্রকৃতি হলো নির্মল আলোকরূপ—"আল্লাহ্‌ হলেন আকাশরাজী ও পৃথিবীর আলোক।" [৭] এই আদি আলোক কি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ? —এ প্রশ্নের উত্তরে ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক

নানাবিধ বর্ণনা দেওয়া সত্বেও কুর্‌আন ঘোষণা করছেঃ "তাঁর মতো কিছুই নেই"।[৮] কুর্‌আনের কতকগুলি প্রসিদ্ধ বাক্য থেকে স্থূফী ভাষ্যকারেরা বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কীয় সর্বেশ্বরবাদের সমর্থন প্রমাণ করেন। আদি আলোকের নির্দেশ বা নীতিরূপ আত্মা ("বল যে আত্মা হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ বা নীতি"[৯]) যদি সাধারণ পশুসুলভ অবস্থান থেকে উন্নতি লাভ করে জাগতিক অস্তিত্বসমূহের উৎসের সাথে মিলিত বা একীভূত হতে চায়, তবে তাকে আধ্যাত্মিক সাধনার চারিটি পর্যায় অতিক্রম করে যেতে হবে ; যথা ঃ

(অ) অদৃশ্যে বিশ্বাস

(আ) অদৃশ্যের সন্ধান। প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য দৃশ্যাবলী অবলোকন করার ফলে অনুসন্ধান স্পৃহা জাগ্রত হতে থাকে। "দেখ, উষ্ট্রকে কিভাবে স্থষ্ট করা হয়েছে, আস্‌মানকে কিভাবে উঁচুতে ধরে রাখা হয়েছে, পাহাড়-গুলিকে কিরূপে অনড়ভাবে স্থাপিত করা হয়েছে।"[১০]

(ই) অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান। এ জ্ঞান হাসিল হয় নিজ আত্মার গভীর প্রদেশে অবলোকন করে।

(ঈ) উপলব্ধি। উচ্চতর স্থূফি দর্শনের মতে, উপলব্ধি আসে বিচার-শীলতা ও বদান্যতার অনবরতঃ অভ্যাসের ফলে। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন স্থবিচার ও পরোপকার করতে এবং আত্মীয় পরিজনের (প্রাপ্য) আদায় করতে ; এবং তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন পাপাচার, অন্যায় কার্য এবং উৎপীড়ন।"[১১]

এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পরবর্তীকালীন স্থূফীদের কোনো কোনো সম্প্রদায় (যেমন নক্‌শ্‌বন্দী সম্প্রদায়) এই উপলব্ধির অন্যান্য প্রথাও উদ্ভাবন করেছিলেন ; অথবা বলা চলে যে, ভারতীয় বেদান্ত দর্শন থেকে আহরণ করেছিলেন।[১২] হিন্দুদের 'কুণ্ডলিনী' তত্ত্বের অনুসরণে তাঁরা প্রচার করলেন যে মানুষের দেহে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের ছয়টি বৃহৎ কেন্দ্র রয়েছে। স্থূফী সাধনার লক্ষ্য হলো, নিবিষ্টতামূলক কতকগুলি প্রক্রিয়ার সহায়তায় এই আলোকাধারগুলিকে নাড়া দেওয়া, বা তাঁদের পরিভাষায় এগুলিতে 'হর্‌কত' স্থষ্টি করা এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরালোকের

বাহ্যতঃ বিভিন্ন আলোকগুচ্ছের মধ্যে এমন একটি মৌলিক শুভ্র আলোক আবিষ্কার করা যার সাহায্যে সব কিছু দেখা যায় কিন্তু যা নিজে অদৃশ্য থাকে। আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম ধীরে ধীরে বারংবার উচ্চারণ এবং অন্যান্য গোপন জপ-তপের সাহায্যে দেহের অনুকণিকাবলী কতিপয় সুনির্ধারিত গতিপথে প্রবহমান হয়। তার ফলে দেহাভ্যন্তরস্থ আলোককেন্দ্রগুলিও নিরবচ্ছিন্ন গতিলাভ করে নিজেদের স্বরূপ উপলব্ধি করে। এ থেকে সূফীর সমগ্র দেহ আলোকোজ্জল হয়ে যায়। বহির্জগতেও এই একই আলোকের পরিব্যাপ্তরূপ প্রকাশ পেয়ে তাঁর মন থেকে নিজের ভিন্নতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়। ইরানীয় সূফীরা যে এ সব প্রক্রিয়ার খবর রাখতেন, তা থেকে ভুল করে ফন্ ক্রেমার (Von Kremer) বলেছেন যে সমগ্র সূফী দর্শনই বেদান্তীয় ধারণাবলীর প্রভাব থেকে জন্মলাভ করেছে। সাধনা-প্রক্রিয়া বিচারে বিদান্তীয় পদ্ধতি সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরোধী। বিশিষ্ট সূফীরা এ-সব পদ্ধতিকে একেবারেই আমল দেন্‌নি।

(২) সূফী প্রজ্ঞানের বিভিন্ন দিক

এখন আমরা সূফী প্রজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তা গোষ্ঠির অথবা অন্যকথায়, বিভিন্ন ভাবধারার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি। সূফী সাহিত্য মনোযোগের সাথে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে চরম সত্যকে সূফীরা তিনটি দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেছেন। অবশ্য এ তিন দৃষ্টিকোণ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। কোনো কোনো সূফী সত্যের নিগূঢ় প্রকৃতিকে মনে করেছেন আত্ম সচেতন ইচ্ছারূপে; অন্যেরা মনে করেছেন সৌন্দর্য রূপে; আবার অন্য একদল মনে করেছেন যে সত্য প্রকৃতপক্ষে চিন্তা, আলোক ও জ্ঞানরূপ। সূফী চিন্তার এ তিনটী দিক আলাদাভবে আলোচনা করে দেখা সঙ্গত।

(ক) সত্যের আত্ম সচেতন ইচ্ছারূপ

ঐতিহাসিক দিক থেকে এ দলের চিন্তাবিদ্‌রা হলেন যথাক্রমে শকীক বলখী, ইব্‌রাহীম আদহাম, রাবেয়া এবং পরেকার আরও কতিপয় সূফী।

এই দল নিগূঢ় সত্যকে মনে করেন ইচ্ছাশক্তি রূপে এবং বিশ্ব প্রকৃতিকে দেখেন এই ইচ্ছা শক্তির একটি সীমায়িত প্রকাশ রূপে ; এ দলের মনোভাব বিশেষভাবে একেশ্বরবাদ মূলক, তথা অধিকতর সেমিতীয় বৈশিষ্ট্যবাহী। এই সূফী সম্প্রদায়ের আদর্শ জ্ঞানান্বেষামূলক নয় বরং তাঁদের জীবন ও কর্মের বিশিষ্টতম লক্ষ্য হলো ধর্ম নিষ্ঠা, বৈরাগ্য এবং সংসারের পাপাসক্তির প্রতি সতত প্রহরারত মন নিয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুলতা। তাঁদের লক্ষ্য দার্শনিকতা নয়, বরং একটি জীবনাদর্শের পথে কর্মময় সাধনা। সুতরাং আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(খ) সত্যের সুন্দররূপ

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে মারুফ কর্‌খী সূফী দর্শনের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'আল্লাহ্‌র নিগূঢ় সত্যাবলীর উপলব্ধি' [১৩] বলে। এই সংজ্ঞা থেকে সূফিবাদের মোড় বিশ্বাস থেকে জ্ঞানের দিকে ফিরলো মনে করা যায়। কিন্তু এ সব নিগূঢ় সত্যাদির উপলব্ধির পদ্ধতি বিধিবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন আল্‌কুশায়রী দশম শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে। এই দলের চিন্তানেতারা মধ্যস্থদের দ্বারা সৃষ্টিকর্ম সম্পাদনের নিও প্লেটনিক ধারা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সূফী লেখকদের মনে অনেককাল ধরে এ ধারণা উঁকিঝুঁকি দেওয়া সত্বেও, সর্বেশ্বরবাদ তত্বের প্রতি তাঁদের বিশেষ প্রবণতার দরুণ শেষ পর্যন্ত তাঁরা নির্গমনবাদ একেবারেই ত্যাগ করেছিলেন। ইব্‌নে সীনার মতো তাঁরাও মনে করতেন যে নিগূঢ় সত্য হলো 'চিরন্তন সুন্দর'-রূপ যার আদি প্রকৃতিই হলো বিশ্বজগতরূপ দর্পণে প্রতিফলিত নিজ 'চেহারা' অবলোকন। অতএব বিশ্বজগত তাঁদের দৃষ্টিতে হলো চির সুন্দরের একটি প্রতিবিম্বরূপ, নিও প্লেটনীয় শিক্ষায় বিধৃত নির্গমন সঞ্জাত বস্তুরূপ নয়। মীর সাইয়িদ শরীফ বলেনঃ সৃষ্টির কারণ হলো সুন্দরের প্রকাশ বাসনা এবং প্রথমতম সৃষ্টি হলো প্রেম। এই সুন্দরের উপলব্ধি সম্ভব হয় বিশ্বজনীন প্রেমের দ্বারা—যা ইরানীয় সূফীর সহজাত যোরো' য়ীয়

প্রবণতার কাছে সংজ্ঞা লাভ করেছে "সেই পবিত্র অগ্নি, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছুকে জ্বালিয়ে দেয়" বলে। রূমী বলেছেন ঃ

"ওহে তীব্র সুখদায়িনী উন্মাদনা—প্রেম !
ওহে আমাদের সমুদয় দুঃখ বেদনার চিকিৎসক !
ওহে অহঙ্কাররূপ রোগের নিরাময়কারী !
ওহে আমাদের আত্মার আফলাতুন ও জালিনুস !" [১৪]

বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মনোভাবের সহজ পরিণাম স্বরূপ অব্যক্তিক আত্মস্থকরণ মতবাদের উদ্ভব হয়। এ মতবাদের গোড়াপত্তন করেন বায়েযিদ বিস্তামী এবং এটাই এ সম্প্রদায়ের পরেকার সাধকদের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ বাকুর বৌদ্ধ মন্দিরের (মন্দিরটী এখনও টিকে আছে।) পথে যে সব ভারতীয় তীর্থ যাত্রী ইরানের মধ্যে দিয়ে গমনাগমন করতেন, তাঁদের প্রভাবেই এ মতবাদের উদ্ভব হয়ে থাকবে। [১৫] এ দলের সাধক হুসায়ন মন্‌সুর (হাল্লাজ) সর্বেশ্বরবাদকে প্রায় উন্মাদনার পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছিলেন। খাঁটি বেদান্ত দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি ঘোষনা করলেন 'আনল্ হক্ক'—অহম্ ব্রহ্মা অস্‌মি—বাণী।

এই দলের সূফী সাধককের মতে, নিগূঢ় সত্য কিম্বা চিরন্তন সত্য অনাদি অনন্ত এ কারণে যে তা আরম্ভ, শেষ, ডাইন, বাঁ, ঊর্ধ, অধঃ—ইত্যাদি সীমাসীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। [১৬] এ অনাদি-অনন্তে সত্বা ও গুণের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই "এর বস্তুসত্বা ও গুণ মূলক স্বত্তি এক ও অভিন্ন।" [১৭] আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে এঁদের মতে বিশ্ব-প্রকৃতি হলো নিগূঢ় সত্বার দর্পণ স্বরূপ। কিন্তু নসফী বলেন, দর্পণ দুই প্রকার ঃ [১৮]

(অ) যা শুধু একটি প্রতিবিম্বিত ছবি ধারণ করে—এ হলো বাহ্যিক জগত।

(আ) যা আসল সত্বাকেই ধারণ করে—এ হলো মানুষ, যার সত্বা হলো আদি সত্বার একটি সীমায়িত রূপ। অবশ্য মানুষ ভুল করে মনে করে যে সে একটি স্বাধীন সত্বা।

নসফী বলেন "হে দরবেশ! তুমি কি মনে কর যে তোমার অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল নয়? এ একটি মারাত্মক ভ্রম"।[১৯] তিনি একটি সুন্দর রূপকের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২০] কোনো এক সরোবরবাসী মৎস্যেরা বুঝতে পারলো যে তাদের বসবাস, চলাচল, জীবন-যাপন সব কিছুরই মূল হলো পানি। তখন তাদের মনে প্রশ্ন জাগলো: জীবনের উৎসের আসল প্রকৃতি কি? এ প্রশ্নের সত্যিকার জবাবের অন্বেষণে তারা চলে গেলো একটি বৃহৎ নদীতে বসবাসকারী এক দার্শনিক মৎস্যের কাছে। দার্শনিক তাদের বললো "হে জীবন-গ্রন্থ উন্মোচনে অভিলাষী অজ্ঞের দল! তোমারা জন্মেছ মিলনের দেশে, কিন্তু মরতে যাচ্ছ একটী অবাস্তব বিরহের আশঙ্কায়। সাগরতীরে থেকে তোমরা তৃষ্ণার্ত। অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও তোমরা মরতে যাচ্ছ কপর্দকহীনরূপে।"

তা' হলে বিচ্ছেদের সর্ব প্রকার চিন্তাই অজ্ঞতা এবং সর্বপ্রকার 'অন্যত্ব'-বোধ হলো—একটি বাইরের চেহারা, স্বপ্ন কিম্বা ছায়া-সদৃশ। এ অন্যত্ব-বোধ পরম সত্বার আত্ম-চেতনার সাথে জাগতিক অস্তিত্বের সম্পর্ক নির্ধারণ পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। হেগেলের ভাষায় "সাধক শ্রেষ্ঠ রূমী"ই এ চিন্তাধারার বিশিষ্টতম উদ্‌গাতা। বিশ্ব-জাগতিক আত্মার বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশের নিও প্লেটনীয় পুরাতন মতবাদকে গ্রহণ করে তিনি তাকে এমন চমকপ্রদ আধুনিক রূপে প্রকাশ করেছেন যে ক্লড্‌ (Clodd) তাঁর Story of Creation গ্রন্থে সে মতবাদের উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। রূমীর অসাধারণ মণীষা আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ মূলক চিন্তাধারার কত কাছাকাছি এসেছিল, তা দেখাবার জন্যে আমি এখানে তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কীয় সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনাটী উদ্ধৃত করছি। এ মতবাদ তিনি পোষণ করতেন তাঁর আদর্শবাদের বাস্তবায়ন বিবেচনায়:

"মানুষের প্রথম অভ্যুদয় হলো অ-জৈব জগতে;
তারপর সে অবলম্বন করলো উদ্ভিদ্‌-জীবন।

সে অবস্থায় সে কাটিয়ে দিলো যুগের পর যুগ—
সাদৃশ্যহীন পূর্বেকার অজৈব অবস্থার কথা
কিছুই মনে না রেখে।
তারপর যখন সে উদ্ভিদ্-জগত থেকে প্রাণী জগতে চলে এলো,
উদ্ভিদ্-জগতের কথাও তার আর কিছুই মনে রইলো না—
কেবলমাত্র বৃক্ষলতার প্রতি একটি মানসিক আকর্ষণ ছাড়া,
বিশেষ করে, বসন্তাগমে যখন গাছপালা
ফুলে-ফুলে ভরে ওঠে।
যেমন শিশুর তার মায়ের প্রতি আসক্তি—
মাতৃস্তন্যের প্রতি আকর্ষণের কারণ না জেনেও।
আমাদের মহান স্রষ্টা
মানুষকে পশুজীবন থেকে মনুষ্যজীবনে উন্নীত করেন,—
এ ভাবে মানুষ প্রকৃতির এক স্তর থেকে অন্য স্তরে এগিয়ে আসে,
এবং এ ভাবে সে শিক্ষালাভ করে, জ্ঞান অর্জন করে
এবং শক্তিমান আজকের মানুষে পরিণত হয়!
তার প্রথম আত্মার অভিব্যক্তির কথা
সে তো আজ ভুলেই গেছে;
তার বর্তমান আত্মাও তো পরিবর্তনেরই পথে দাঁড়িয়ে।"
(মস্নভী—চতুর্থ খণ্ড)

এখন আমাদের জন্যে সুফি দর্শনের এই বিশিষ্ট মতবাদের সাথে নিও-প্লেটনীয় মৌলিক নীতিসমূহের একটা তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষাপ্রদ হবে। নিও-প্লেটনিস্ম্-এর ঈশ্বর হলেন সর্বপরিব্যাপ্ত অথচ ইন্দ্রিয়াতীত। "যেহেতু তিনি সবকিছুরই কারণ, অতএব তিনি সর্বত্র। যেহেতু তিনি সব কিছুরই অতীত, অতএব তিনি কোথাও নেই। যদি তিনি শুধুমাত্র 'সর্বত্র' হতেন এবং 'কোথাও নেই' না হতেন, তবে তিনি হয়ে পড়তেন 'সবকিছু'।" [২১] সুফীরা অবশ্য সোজাসুজি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ সবকিছু। নিও-প্লেটনীয়দের মতে, বস্তু কিছু পরিমাণে স্থায়ী ও স্থির; [২২] কিন্তু আমাদের

বর্তমানে আলোচ্য সুফি-সম্প্রদায়ের মতে, সর্বপ্রকার পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতাই হলো স্বপ্নের সাথে তুলনীয়। তাঁরা বলেন, সীমায় আবদ্ধ জীবন হলো ঘুমন্ত; মৃত্যুই হলো জাগরণস্বরূপ। অবশ্য নিও প্লেটনিস্‌ম্‌ থেকে এর প্রকৃত পার্থক্য সূচিত হয়েছে 'সত্তাকার প্রাচ্য-ভাবাপন্ন' অব্যক্তিক অমরত্ব-বাদের মারফত্‌। হুইট্যাকার (Whittakar) বলেন ঃ "এর (আরবীয় দর্শনের) বিশিষ্ট মতবাদ—সাধারণ মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির অব্যক্তিক অমরত্বতত্ব—আরম্ভপন্থী বা নিও-প্লেটনীয়পন্থী মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ মতবাদ এঁদের একটি খাঁটি মৌলিক পদক্ষেপ।"

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ চিন্তাধারায় তিনটি মৌলিক ধারণা রয়েছে। যথা—

(অ) এক প্রকার ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্যের সাহায্যে চরম সত্যকে জানা যায়।

(আ) চরম সত্য অব্যক্তিক।

(ই) চরম সত্য—এক।

এসব ধারণার মুখোমুখি আমরা দেখতে পাই—

(অ) খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অজ্ঞেয়তাবাদী কবি ওমর খৈয়ামের বুদ্ধিবৃত্তিক হতাশার প্রকাশ—

"আকণ্ঠ সুরাপায়ী আনন্দ পথিকদল
এবং মস্‌জিদ প্রাঙ্গনে দুঃসহ বিনিদ্র রজনী যাপনকারী
সাধুসজ্জন ব্যক্তিরা
একই অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে;
কিনারার হদিস্‌ জানা নেই কারও।
মাত্র একজনই জাগছেন, আর সবাই ঘুমন্ত।"

(আ) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইব্‌নে তায়মিয়ার একেশ্বরবাদ মূলক প্রতিক্রিয়া।

(ই) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ওয়াহিদ্‌ মাহ্‌মুদ-এর বহুত্বমূলক প্রতিক্রিয়া।

খাঁটি দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই শেষোক্ত অন্দোলনটাই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। মানুষের বুদ্ধিবিকাশের ইতিহাস অনুধাবন করলে

কতকগুলি সূত্র পাওয়া যায় যা বিভিন্ন জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও খাটে। একত্ববাদমূলক জার্মান চিন্তাধারা থেকে হারবার্ট্ (Herbart) বহুত্ববাদের প্রেরণা লাভ করেন ; আবার স্পিনোযা (Spinoza)-র সর্বেশ্বরবাদ লাইব্‌নিয্ (Leibniz)-কে একত্ববাদে উদ্বুদ্ধ করে। সেই একই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াহিদ মাহমুদ সে কালের অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করে বলেন যে আদি সত্য এক নয়, বহু। লাইব্‌নিয্-এর বহু পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেন যে বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর পরিভাষায় 'আফ্‌রাদ' বলে কথিত কতকগুলি মৌলিক বা সরল অণুকণিকার যৌগিক রূপ—এ সব অণুকণিকা অনন্তকাল ধরে রয়েছে এবং এরা জীবন্ত। এই মৌলিক এককগুলি একপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করে অনবরতঃ নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে ; এবং বিশ্বপ্রকৃতির কানুন হলো এই মৌলিক বস্তু সমূহকে ক্রমোন্নতির পথে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাঁর সৃষ্টি পর্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায় হলো আট হাযার বৎসর। আবার এ রকম আট অধ্যায়ের পর বিশ্বপ্রকৃতি ভেঙ্গেচুরে যাবে এবং তার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার নোতুন বিশ্বপ্রকৃতি জন্মলাভ করবে। ওয়াহিদ মাহমুদ একটা নবতর সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন ; কিন্তু এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে শেষ পর্যন্ত শাহ্ আব্বাসের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুনতে পাওয়া যায় যে সিরাজ-এর কবি হাফিয্ এ দলের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

(গ) সত্যের আলোক বা মনন্ রূপ

সুফী দর্শন পন্থী তৃতীয় বিশিষ্ট দল মনে করেন যে সত্য হলো মূলতঃ আলোক বা মনন্ রূপ। তা হলে এর অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতেই রয়েছে চিন্তা করবার বা আলোকিত করবার জন্যে কোন উপলক্ষ্যের প্রয়োজন। এঁদের পূর্বেকার সম্প্রদায় নিও-প্লেটনীয়বাদ বর্জন করেন ; কিন্তু এঁরা নিও-প্লেটনীয় বাদকে একটি নবতর পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করেন। অবশ্য এ সম্প্রদায়ের প্রজ্ঞান চর্চারও দু'টি দিক্ আছে। একটি হলো খাঁটি ইরানীয় মনোভাব সম্ভূত, আর অন্যটা বিশেষ ভাবে খৃষ্টীয় চিন্তাধারাদ্বারা প্রভাবিত। দু'জনই

মনে করেন যে, আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে চরম-সত্যের প্রকৃতিতেই অন্তর্নিহিত একটী বৈষম্যের নীতি। আমি এখন ঐতিহাসিক পর্যায় ক্রমে দু'দলের মতবাদ আলোচনা করছি।

[১] সত্যের আলোক-রূপ—আল্ ইশ্‌রাকী ইরানীয় দ্বিত্ব-বাদে প্রত্যাবর্তন

ইসলামী ধর্মতত্ত্বে গ্রীক তর্কপদ্ধতি প্রয়োগের ফলে আল্ আশ্‌আরীর সময়ে যে বিচার বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়, তার পূর্ণতম পরিণতি ঘটে আল-গাযালীর সংশয়বাদমূলক আলোচনা ধারায়। এমন কি মু'তাযিলা যুক্তি-বাদীদের মধ্যেও নয্‌যাম প্রমুখ বিচারশীল ব্যক্তিরা গ্রীক-দর্শনকে হুবহু গ্রহণ করেন নি, বরং স্বাধীন সমালোচনার আলোকে যাচাই করে নিয়েছেন। আল্‌গাযালী, আর্‌রাযী, আবুল বরকাত, আল্ আমিদী প্রভৃতি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের সমর্থক। তাঁরা গ্রীক্ দর্শনের সমগ্র অবয়ব সমালোচনার তীব্র কশাঘাতে অনবরতঃ ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকেন। তারপর আবু সঈদ সায়রাফী, কাযী আবদুল জব্বার, আবুল মাআলী, আবুল কাসিম এবং সর্ব-শেষে প্রখরবুদ্ধি ইবনে তায়মিয়া—একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে গ্রীক দর্শনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাসমূহ প্রকাশ করে দিতে থাকেন। গ্রীক দর্শনের সমালোচনায় তাঁরা শাহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর মতো মহাপণ্ডিত সূফীদের দু'একজনের সহায়তাও লাভ করেন। এ সময়ে সুহরাওয়ার্দী 'গ্রীক দর্শনের অযৌক্তিকতা প্রকাশ' (The Unveiling of Greek Absurdities) নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করে সে চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য বলে প্রমাণ করেন এবং সাথে সাথে দেখান যে নিরেট যুক্তির সাহায্যে সত্যোপলব্ধির আশা একান্ত বৃথা। মু'তাযিলাবাদের বিরুদ্ধে আশ্‌আরীয় প্রতিক্রিয়ার ফলে শুধু যে একটী অনেকদিক দিয়ে আধুনিক মনোভাবাপন্ন নবতর প্রাজ্ঞানিক পদ্ধতির অভ্যুদয় হলো, তা নয়; জরাগ্রস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বের শৃঙ্খলও তাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। আর্ডম্যান্ (Erdmann) [২৪] সম্ভবতঃ মনে করতেন

যে আল্ ফারাবী ও ইবনে সীনার সাথে সাথে মুসলিম তত্ব জিজ্ঞাসার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায় এবং তাঁদের পর দর্শনশাস্ত্র ভিত্তিচ্যুত হয়ে সংশয়বাদ ও মরমীয়াবাদের অন্তরালে ঢাকা পড়ে। অবশ্য গ্রীক দর্শনের সমালোচনার ফলে মুসলিম চিন্তাজগতে একদিকে আশ্আরীয়া আদর্শবাদের উদ্ভব ও অন্য দিকে গ্রীক দর্শনের একটী পুরোপুরি রূপান্তরণ—এই যুগল অভিব্যক্তির ব্যাপারটি তিনি অনুধাবন করেন নি। পুরোপুরি ইরানীয় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত একটি দর্শন পদ্ধতি গড়ে তুলবার বেলায় অবশ্য প্রয়োজন ছিল হয়তো বিদেশীয় মনোভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন, না হয় অন্ততঃ পক্ষে মন থেকে তার প্রভাব অনেকখানি বিতাড়ন। আশ্আরীয় এবং আনুষ্ঠানিক ধর্ম পদ্ধতির অন্যান্য গোঁড়া সমর্থকদল গ্রীক দর্শনকে ইসলামী চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিতাড়িত করেন। অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধির সন্তান আল্ ইশরাকী একটী নবতর দর্শন সৌধ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন। অবশ্য তাঁর নোতুন পদ্ধতিতে পুরাতন উপাদানাদি পুরোপুরি বর্জিত হয় নি। তাঁর খাঁটি ইরানীয় মস্তিস্ক সংকীর্ণ চিত্ত কর্তৃপক্ষের ভীতিপ্রদর্শন তুচ্ছ করে মুক্ত স্বাধীন চিন্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পুরাতন ইরানীয় ঐতিহ্য চিকিৎসক আর্রাযী, আল্ গাযালী এবং ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের লেখকদের আলোচনাধারায় কিছু কিছু স্থান পেয়েছিল; কিন্তু আল্ ইশরাকীর দর্শনে এই সনাতন ধারা এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে পূর্বসূরীদের দার্শনিক মত এবং ইস্লামী ধর্মতত্বের সাথে এর একটী শেষ বোঝাপাড়া এখানে অবধারিত হয়ে পড়ে।

শয়্খ্ শাহাবুদ্দীন সুহ্রাওয়ার্দী খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশ্য নাম ছিল শয়্খুল ইশ্রাক মক্তুল। তিনি ক্বুর্আন-ভাষ্যকার আর্রাযীর শিক্ষক মাজ্দ্-জিলীর কাছে দর্শনশিক্ষা লাভ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি সমগ্র মুসলিম জগতে চিন্তাশীলতায় অপ্রতিদ্বন্দী বলে স্বীকৃত হন। আলেপ্পোর সুলতান সালাহুদ্দীনের পুত্র আল্মলেক্ আয্যাহের তাঁর প্রতি অতিমাত্রায় প্রশংসমান হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে আলেপ্পো দরবারে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে এই তরুণ দার্শনিকের

নির্ভিক স্বাধীন উক্তি ও মতামতাদি তখনকার ধর্মনেতাদের তীব্রতম ঈর্ষার উদ্রেক করে। আনুষ্ঠানিক ধর্মপন্থীরা নিজেদের ভিত্তিভূমির দুর্বলতার প্রতি সচেতন থাকেন না—এমন নয়। অতএব যখনই তাঁরা ক্ষমতাসীন হন, তখনই তাঁদের দেখা গেছে পাশবিক শক্তির উদ্বোধন করে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকা দেবার চেষ্টা করতে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। আনুষ্ঠানিক ধর্মের এই রক্তপিপাসু ভাড়াটিয়া কিঙ্করদল সুলতান সালাহুদ্দীনের কাছে লিখিত ভাবে এই আর্‌যী পেশ করলেন যে শয়্‌খ্‌ এর মতাবলী ইসলাম ধর্মের জন্যে ঘোরতর আশঙ্কার কারণ এবং এ সবের অঙ্কুরে বিনাশ একান্ত প্রয়োজন। সুলতান এতে স্বীকৃতি দিলেন এবং সেখানে, মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে এই প্রাণবন্ত ইরানীয় সাধক ধীর-স্থির চিত্তে ঘাতকের নিষ্ঠুর আঘাত বক্ষে ধারণ করলেন। এই মৃত্যু অবশ্য তাঁকে সত্যের পথে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করলো। কালের গর্ভে হত্যাকারীদের নাম মুছে গেছে; কিন্তু তাঁর রক্তের মূল্যে উত্তীর্ণ দর্শন বেঁচে রয়েছে, বেঁচে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে সত্য সন্ধানী মানবাত্মাকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আপনার করে নেবে।

এই ইশ্‌রাকী দর্শন প্রতিষ্ঠাতার ভাবধারার কয়েকটি বিশিষ্ট দিক হলো: প্রথমতঃ, তাঁর চিন্তাবিকাশের স্বাধীন ও সচ্ছন্দ গতি; দ্বিতীয়তঃ, তাকে একটি সুসমঞ্জস সামগ্রিক রূপ দেবার কারুকর্ম এবং সর্বোপরি, স্বদেশের দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততা। অনেক মৌলিক প্রশ্নে তিনি আফলাতুন-এর বিরোধিতা করেন। আরস্তুর দর্শন পদ্ধতির অবারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে এ পদ্ধতি উদ্দেশ্য-প্রসূত; অর্থাৎ, নিজের চিন্তাধারাকে বিধিবদ্ধরূপে প্রকাশ করবার প্রয়াস নিয়েই আরস্তু সমগ্র বিতর্কের অবতারণা করেছেন; সত্য সন্ধানের খাতিরে নয়। এমন কি আরস্তুর যুক্তিসূত্রগুলিকে আলাদাভাবে সমালোচনার কষ্টি পাথরে যাচাই করে তিনি তার কতকগুলির অন্তঃসার শূন্যতা সপ্রমাণ করেছেন। উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আরস্তুর মতে সংজ্ঞা হলো: Genus plus differentia বা কোনা জাতির সাধারণ পরিচিতি ও তার বৈশিষ্ট্যের সমাহার। কিন্তু আল্‌ইশ্‌রাকী বলেন যে, যে বস্তুটির সংজ্ঞা দেওয়া হলো, শুধু মাত্র

তার বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ দ্বারাই তার পরিচয় সম্ভব নয়, যদি সে গুণ অন্য কারুর না থাকে। ঘোড়াকে আমরা বলতে পারি 'একটি হ্রেষা ধ্বনিকারী জন্তু' বলে। এখানে আমরা 'জন্তু'র অর্থ বুঝি ; কেন না নানারূপ জন্তুর সাথে আমরা পরিচিত। কিন্তু হ্রেষাধ্বনির অর্থ আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না ; কেন না, ঘোড়া ছাড়া আর কোনো জন্তু হ্রেষাধ্বনি করে না। অতএব যে ব্যক্তি আগে ঘোড়া দেখে নি, তার কাছে ঘোড়ার এই মামুলী সংজ্ঞা একেবারেই অর্থহীন। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক নীতি হিসেবে আরম্ভর সংজ্ঞাদান পদ্ধতি একেবারেই অকেজো। এই বিতর্ক সূত্র থেকে শয়্খ সুহ্‌রাওয়ার্দী বোসাঙ্কেট্ (Bosanquet) এর মনোভাবের খুব কাছাকাছি এসে পড়েন। [Bosanquet-এর 'সংজ্ঞা'র সংজ্ঞা হলো 'summation of qualities' বা 'গুণাবলীর সমাহার'।] তিনি মনে করেন, কোনো বস্তুর সত্যিকার সংজ্ঞা দিতে হলে তার সর্বপ্রকার গুণাগুণের একত্র সমাবেশ করতে হবে—যা একযোগে আর কোনো বস্তুতে নেই, অথচ আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে থাকতে পারে।

কিন্তু এখন আমাদের উচিত তাঁর প্রাজ্ঞানিক পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং স্বদেশের চিন্তাধারায় তাঁর দানের গুরুত্ব বিবেচনা করা। শয়্খ্ বলেন ঃ অতীন্দ্রিয় দর্শনতত্ত্বের নিরঙ্কুশ বুদ্ধিবৃত্তিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, এ পথের সাধকের জন্যে আরম্ভপন্থী দর্শন, তর্কশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র এবং সূফিবাদের সম্যকজ্ঞান আহরণ করতে হবে। তাঁর মন কুসংস্কার ও পাপাসক্তির কালিমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে,—যাতে তিনি ক্রমশঃ সেই অন্তশ্চক্ষু উন্মিলন করতে সক্ষম হন, যার সাহায্যে শুধুমাত্র তত্ত্ব হিসেবে বুদ্ধির কাছে গ্রাহ্য ধারণাবলীকে যাচাই ও সংশোধন করা সম্ভব হয়। এভাবে সহায়তা থেকে বঞ্চিত যুক্তি নির্ভরযোগ্য নয়। যুক্তিকে 'যওক' (বস্তুর মূলসত্ত্বা উপলব্ধিকারী একটি রহস্যজনক ক্ষমতা)-এর সহায়তা নিতে হবে। এই যওক ই অশান্ত আত্মাকে প্রকৃত জ্ঞান ও শান্তিতে বিভূষিত করতে পারে এবং সংশয়বাদকে চিরতরে নির্মূল করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার খাঁটি চিন্তামূলক দিকটিই বিচার করবো এবং

যুক্তি আশ্রয়ী চিন্তাদ্বারা এই আন্তরিক অনুভূতি কিভাবে সংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ পেলো, তা অনুধাবন করবো। অতএব ইশ্‌রাকী দর্শন রীতির অন্তর্ভুক্ত স্বষ্টিতত্ব ও মনস্তত্ব আলাদাভাবে আলোচনা সাক্ষেপ।

(অ) তত্ব দর্শন

সর্ব অস্তিত্বের অন্তরতম নীতি হলো 'নূর-ই-কাহির' বা আদি-পরম-আলোক, যার প্রকৃতির একান্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্যকে আলোকিত করা। "আলোকের চেয়ে স্বচ্ছতর আর কিছুই নেই এবং এই স্বচ্ছতার কোনোরূপ সংজ্ঞার প্রয়োজন করে না।" [২৫] অতএব আলোকের মৌলিক ধর্ম হলো প্রতিভাতকরণ। কেন না, 'প্রতিভাতকরণ' গুণ যদি আলোকের অন্তর্নিহিত না হয়ে তার উপর আরোপিত ব্যাপার হতো, তা হলে মনে করতে হতো যে নিজে থেকে আলোক প্রতিভাত নয় এবং অন্য কোনো স্বতঃ প্রতিভাত বস্তুর সহায়তা ছাড়া প্রতিভাত হতে পারে না। তা হলে, ফল এই দাঁড়ায় যে, আলোকের চেয়েও আলোকময় আরও কিছু আছে—যা হ'তে পারে না। তা হলে, আদি-আলোকের অস্তিত্বের অতীত এমন কোনো হেতু নেই যা তার অস্তিত্বের কারণ হতে পারে। এই মৌলিক নীতির বাইরে যা আছে, তা এর উপর নির্ভরশীল, সাময়িক এবং সম্ভাব্য মাত্র। অনালোক বা অন্ধকার অন্য কোনো স্বাধীন সত্বা থেকে উদ্ভূত কিছু হতে পারে না। আলোক এবং অন্ধকার আদতে দুইজন আলাদা স্বষ্টিকর্তার স্বষ্টি দুইটি আলাদা স্বাধীন সত্বা বলে ম্যাজীয় ধর্মাবলম্বীরা যে বিশ্বাস পোষণ করেন, তা - তা হলে ভ্রমাত্মক না হয়ে পারে না। যোরো'ষ্ট্রিয় ধর্মযাজকেরা এ নীতিতে বিশ্বাস করতেন যে এক থেকে একের বেশী নির্গমিত হতে পারে না। সুতরাং তাঁরা আলোক ও অন্ধকারকে দুইটি স্বতন্ত্র উৎস থেকে উদ্ভূত বলে স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইরানের প্রাচীন ঋষিরা তাঁদের মতো দ্বিত্ববাদী ছিলেন না। আলোক এবং অন্ধকারের সম্পর্ক বৈপরিত্যমূলক নয়; বরং একটির অস্তিত্ব হলো অপরের অনস্তিত্বের কারণ। আলোকের অস্তিত্ব অন্ধকারের পূর্ব-অস্তিত্ব জ্ঞাপক; অন্য কথায়,

আলোকের আত্ম প্রকাশের মানে হলো অন্ধকারকে আলোকিত করণ। এই আদি-আলোকই হলো সব গতির উৎস। কিন্তু এর গতি স্থান পরিবর্তন নয়; এর অন্তরতম প্রকৃতি হলো আলোকিতকরণ স্পৃহা (love of illumination) এবং এই স্পৃহার তাড়নায়ই যেন সে সব বস্তুর অস্তিত্বকে নিজের ছটায় অভিষিক্ত করে জীবন্ত করে তোলে। আলোকের বিকীরণ অনন্ত। ঘনতর বিকীরিত আলোকচ্ছটা নবতর আলোক-বিকীরণের উৎসরূপে কাজ দেয়। এভাবে হাল্‌কা হতে হতে এক পর্যায়ে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে আলোকচ্ছটাগুলি আর নোতুন বিকীরণ সৃষ্টি করতে পারে না। এই আলোকচ্ছটাগুলিই আদি-আলোক থেকে পার্থিব জগতের সংখ্যাহীন ও অন্তহীন বৈচিত্র্যময় জীবমণ্ডলে জীবন সঞ্চারে মাধ্যমের কাজ করে। ধর্মীয় পরিভাষায় এদের বলা হয় 'ফেরেশ্‌তা'। আরস্তু-শিষ্যরা ভ্রমক্রমে আদিম-চিৎশক্তিকে মাত্র দশটি বলে মনে করতেন। চিন্তা-পর্যায়কেও তাঁরা সে ভাবে গণনার গণ্ডিতে আনবার ভ্রমাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। আদি-আলোকের সম্ভাবনাবলী সংখ্যাতীত; এবং এই অশেষ বৈচিত্রময় বিশ্বপ্রকৃতি এর পশ্চাৎপটের এ-সব সম্ভাব্যতার একটি আংশিক প্রকাশ মাত্র। অতএব আরস্তুর নির্ধারিত পর্যায়াবলী (categories) মাত্র আপেক্ষিকভাবে সত্য। আদি-আলোক যে কত বিচিত্র পন্থায় অনালোককে আলোকিত করেন বা করতে পারেন, তার ইয়ত্বা নেই। এসব সংখ্যাতীত পন্থা বা ধারণার নিরিখ করা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবচিত্তের জন্যে একেবারে অসম্ভব। অবশ্য আদি-আলোকের নিম্নবর্ণিত দুইটি আলোকায়ন-পন্থার পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে পারি:—

১। অমূর্ত আলোক (যথা: বিশ্বজনীন অথবা ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি)।—এর কোনো আকার নেই এবং এ নিজের বাইরে অন্য কারুর গুণরূপে দেখা দেয় না। (বরঞ্চ এ বস্তুমূলক।) এর থেকেই আংশিক চেতন, সচেতন এবং আত্মসচেতন আলোকমালা অর্থাৎ আলোকের বিভিন্ন অভিব্যক্তি রূপলাভ করে। [আদি-আলোক সত্বার নৈকট্য বা দূরত্বের উপর নির্ভর করে আলোকের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য। এ-সব বিভিন্ন অভিব্যক্তি

এই ঔজল্যের তারতম্যেরই নামান্তর।] ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি বা ব্যক্তি আত্মা হলো আদি-আলোকের একটি হাল্‌কা প্রতিচ্ছবি বা একটি দূর ব্যবধানে অবস্থিত প্রতিফলিত রূপ মাত্র। অমূর্ত আলোক নিজে থেকেই নিজেকে চেনে; তার নিজ অস্তিত্বকে নিজের কাছে প্রতিভাত করবার জন্যে সে অন্য কোনো অস্তিত্বাতীত সাহায্যকারীর প্রয়োজন বোধ করে না। তা হলে, চেতনা বা আত্মোপলব্ধি অমূর্ত আলোকের অন্তর্নিহিত গুণ এবং অনালোক হলো এর বিপরীত।

২। নৈমিত্তিক আলোক (এ হলো গুণমূলক)।—এর একটি আকার রয়েছে এবং এ নিজের উপর ছাড়াও অন্য বস্তুর উপর আরোপিত হতে পারে। (যেমনঃ তারার আলোক, বা অন্য কোনো বস্তুর দৃশ্যমানতা।) এই নৈমিত্তিক আলোক—অধিক যুক্তিযুক্তভাবে একে বলা যায় 'ইন্দ্রিয়ায়িত আলোক'—হলো অমূর্ত আলোকের একটা দূরবর্তী প্রতিফলন, যা তার আদত্ থেকে দূরত্বের জন্যে ঔজল্য বা বস্তুমূলক প্রকৃতির বেশীর ভাগ হারিয়ে ফেলেছে। এই বারম্বার প্রতিফলন ক্রিয়া প্রকৃত পক্ষে আলোককে মৃদুতর করে তুলছে। এ ভাবে প্রতিফলিত হতে হতে আদিম আলোকচ্ছটা এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, যখন ঔজল্য হারাতে হারাতে সে আর স্বাধীনভাবে টিকে থাকতে পারে না। তখন তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অন্য বস্তুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই মৃদুতম আলোকচ্ছটাগুলিই হলো স্ব-নির্ভর অস্তিত্ব বঞ্চিত নৈমিত্তিক বা আরোপিত আলোক।

তা' হলে, এই নৈমিত্তিক আলোক আর অমূর্ত আলোকের সম্পর্ক হলো কার্য-কারণ সম্পর্ক। এক্ষেত্রে কার্য অবশ্য কারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কিছু নয়; এ হলো কারণ-রূপের একটি রূপান্তর বা দুর্বলতর প্রকাশ। অমূর্ত আলোক ভিন্ন অন্য কোনো জিনিষ (যেমন, আলোকিত বস্তুটিরই প্রকৃতি) এই নৈমিত্তিক আলোকের কারণ হতে পারে না; কেন না, এই নৈমিত্তিক আলোক হলো একটি অনিয়ত ব্যাপার এবং তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া যায়; অথচ তা'তে বস্তুটীর প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না।

যদি আলোকিত বস্তুর সত্বা বা প্রকৃতি এই নৈমিত্তিক আলোকের কারণ হতো, তবে বস্তুটীকে অনালোকিত করবার কার্যক্রম সম্ভব হতো না। কোনো ক্রিয়াহীন কারণ আমরা কল্পনা করতে পারি না। [২৬]

এখন পরিষ্কাররূপে বোঝা যাচ্ছে যে শয়্খুল ইশ্রাক আরস্ত-পন্থীদের বর্ণিত আদি পদার্থ (Prima Materia)-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করবার বেলায় আশ্-আরীয় চিন্তানেতাদের সাথে একমত। অবশ্য তিনি আলোকের অনস্তিত্ব বাচক অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন—যা প্রকারান্তরে আলোকেরই হেতুরূপ। বস্তু এবং গুণ—এই দুই ব্যতীত আর সমস্ত শ্রেণী পর্যায় যে পরস্পর সাপেক্ষ—সে মতবাদ প্রচারেও তিনি আশ্আরীয়দের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের জ্ঞানতত্বকে তিনি কিছুটা সংশোধন করে নিয়ে বলেন যে মানবীয় জ্ঞানের একটী ক্রিয়াশীল দিক্ আছে। জ্ঞাত বস্তুর সাথে আমাদের সম্পর্ক একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়; ব্যক্তি আত্মা নিজেই একটী আলোক স্বরূপ; এবং কোনো বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সময় সে তাকে নিজ আলোকে আলোকিত করে দেখে। বিশ্বজগত তাঁর মতে হলো একটী বিশাল আলোকায়ন কর্মের ধারাবাহিক রূপ; কিন্তু শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে এই আলোকায়ন আদি আলোকের অন্তহীন অভিব্যক্তির আংশিক প্রকাশ মাত্র। তিনি আরও অনেক প্রথায় এই আলোকায়ন কর্ম সমাপ্ত করতে পারেন, যা আমাদের জ্ঞানগ্রাহ্য নয়। চিৎ-বৃত্তির শ্রেণী পর্যায় অনন্ত; আমাদের চিন্তাধারা মাত্র তার কয়েকটীতেই কর্মতৎপর। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে শয়্খ্ যুক্তিমূলক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে আধুনিক মানবতাবাদ থেকে অধিক দূরে ছিলেন না।

(আ) সৃষ্টিতত্ত্ব

ইশ্রাকী ভাবুকদের মতে, যা কিছু 'অনালোক' তা হলো 'অবিমিশ্র পরিমাণ' বা 'অবিমিশ্র বস্তু'। এ সব হলো আলোকের সত্বার আর একটী প্রমাণ; আরস্ত-পন্থীরা এ সবকে স্বাধীন অস্তিত্বরূপ মনে করে ভুল করেছেন। এই মৌলিক অবিমিশ্র বস্তু থেকেই স্থূলতার বিভিন্ন পরিমাণে জাগতিক

সমুদয় বস্তুর অভ্যুদয়। অতএব বিভিন্ন ধরণের প্রাথমিক বস্তুর একের সাথে অন্যের মিলনে যে তৃতীয় বস্তুর অভ্যুদয় আমাদের পরীক্ষাগ্রাহ্য জগতে অনবরতঃ দেখা যাচ্ছে, তাও প্রকারান্তরে এই অবিমিশ্র বস্তুরই অস্তিত্বের প্রমাণ। তা হলে, সব বস্তুকে অন্য নিরপেক্ষ অবস্থিতি হিসেবে দু'রকম ভাবে ভাগ করা যেতে পারে ; যথা—

১। যা স্থানাতীত---অপ্রকাশ সত্বাসমূহ বা অণু-ণিকাবলী---(আশ্-আরীয় মতে ঃ বস্তুর নির্যাসরূপ)।

২। যা অপরিহার্যরূপে স্থান নিবদ্ধ---অন্ধকারের বিভিন্ন আকার – যেমন ঃ ভার, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি।

এ দু'য়ের সমাহারই অবিমিশ্র বস্তুকে রূপদান করে। বাস্তব পদার্থ তা হলে হলো অমূর্ত আলোকের দ্বারা দৃশ্যমান বা দীপ্তিপ্রাপ্ত অন্ধকার আকার ও অপ্রকাশ অণুকণিকাবলীর সমাহার। কিন্তু অন্ধকারের বিভিন্ন ধরণের হেতু কি? আলোকের বিভিন্ন ধরণের মতো. অন্ধকারেরও অস্তিত্বের মূলে রয়েছে অমূর্ত আলোক। অতএব এই মৌলিক বস্তুর প্রভার পরিমাণের তারতম্য অনুসারে অন্ধকারের ধরণের মধ্যেও তারতম্য দেখা দিতে বাধ্য। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে ধরণ বা আকারের পার্থক্য রয়েছে, অবিমিশ্র বা পরম বস্তুতে তা নেই। অবিমিশ্র পরিমাণ ও অবিমিশ্র বস্তু আদতে একই। অতএব এ সব আকার ভেদ যদি অবিমিশ্র বা পরম বস্তুর নিগূঢ় সত্বায় বিদ্যমান থেকে থাকে, তবে অন্ধকারের আকার বিবেচনায় সব জাগতিক বস্তুই একই রূপে প্রতিভাত হতো। কিন্তু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এর বিরোধী। তা হলে অন্ধকারের আকার ভেদের হেতু স্বরূপ পরম বস্তুকে মনে করা চলে না। এবং যেহেতু এসব আকার ভেদের অন্য কোনো কারণও নেই, অতএব মনে করতে হবে যে অমূর্ত আলোকের দীপ্তির বিভিন্নতার জন্যেই এসব হয়েছে। বাস্তব পদার্থের তৃতীয় উপাদান অর্থাৎ অমূর্ত অণুকণিকা বা নির্যাস তা হলে আলোকের অভিব্যক্তির একটি দিক এবং পদার্থ হলো সামগ্রিক বিবেচনায় আদি-আলোকের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বজগতই হলো প্রাথমিক আলোকের উপর নির্ভরশীল অস্তিত্ব চক্রাবলীর

বিরতিহীন বিকাশ-ক্রম। এ সব অস্তিত্ব চক্রের মধ্যে যারা যতখানি উৎসের নিকটবর্তী তারা ততখানি প্রদীপ্ত ; আর যারা যতখানি দূরবর্তী, তারা ততখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ সব চক্রের প্রত্যেকটিতে অবস্থিত বিভিন্ন অস্তিত্ব—এবং সাথে সাথে এ সব চক্রাবলীও—সংখ্যাতীত মাধ্যমিক ছটার সাহায্যে দীপ্তি লাভ করে। এ মাধ্যমিক ছটাগুলির কাজ হলো 'সচেতন আলোক' (মানুষ, জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির বেলায়)-এর সাহায্যে, অথবা তা ছাড়া (খনিজ দ্রব্যাদি এবং প্রাথমিক মৌলিক পদার্থাদির বেলায়) অস্তিত্বের বিভিন্ন আকারাবলী সংরক্ষণ করে চলা। অতএব আমরা যাকে বিশ্ব প্রকৃতি বলি, সে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্য সমাবেশ হলো আদি আলোকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দীপ্তি ও ছটার উজ্জ্বল্যের অন্তহীন বৈচিত্র্য থেকে উদ্ভূত একটি বিশাল ছায়ারূপের বিকাশ। প্রত্যেক বস্তুই, বলতে গেলে, প্রেমিকের তীব্র কামনা নিয়ে নিজ নিজ অভিষ্ট আলোক-ছটার নিকটতর হতে চায় এবং তা থেকে অস্তিত্বের রসদ সংগ্রহ করে। এ ভাবে সে আদি-আলোকের উৎসের সান্নিধ্য লাভ করে অধিকতর জীবন্ত হয়ে উঠতে চায়। সমগ্র বিশ্বজগতই হলো প্রেমের একটি চিরন্তন রঙ্গমঞ্চ।

এর বিভিন্ন স্তরগুলি হলো নিম্নরূপ ঃ

আদি আলোকের স্তর—

- (১) চিৎশক্তির স্তর—মহাকাশের অভ্যুদয় স্থল
- (২) আত্মার স্তর
- (৩) আকৃতির স্তর

|

- (১) আদর্শ আকৃতির স্তর
- (২) বাস্তব আকৃতির স্তর

|

(অ) মহাকাশ

(আ) মৌলিক পদার্থসমূহ

|

I সহজ মৌলিক পদার্থসমূহ

II যৌগিক পদার্থসমূহ

(ক) খনিজ জগত

(খ) উদ্ভিদ জগত

(গ) প্রাণীজগত

- (১) মহাকাশের স্তর
- (২) বস্তুজগতের স্তর

|

(অ) মৌলিক পদার্থ

(আ) যৌগিক পদার্থ ঃ

|

(ক) খনিজ জগত

(খ) উদ্ভিদ জগত

(গ) প্রাণী জগত

জীব-জগতের মোটামুটি প্রকৃতির এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর আমরা জাগতিক কার্য-কারণ সম্পর্কে আরও কথঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারি। অনালোকরূপ সব কিছু নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত ঃ—

(১) চিরন্তন—যথা ঃ চিৎশক্তি, গ্রহ-নক্ষত্রাবলীর আত্মা, অন্তরীক্ষ, মৌলিক পদার্থাবলী, জ্ঞান, গতি।

(২) অনিয়ত—যথা ঃ মৌলিক পদার্থসমূহের বিভিন্ন সংযোগে উদ্ভূত যৌগিক পদার্থাবলী।

মহাকাশের গতি প্রকৃতি চিরন্তন ; এ থেকেই বিশ্বজগতের বিভিন্ন চক্রের সৃষ্টি। এর অন্তর্নিহত কারণ হলো অন্তরীক্ষ-আত্মার সর্ব আলোক উৎস-থেকে দীপ্তি লাভের প্রবল বাসনা। মহাকাশকে যে উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তা অনালোকের বিভিন্ন রূপ অমার্জিত আকার থেকে উদ্ভূত রাসায়নিক ক্রিয়াকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। অন্তরীক্ষের প্রত্যেক স্তর তার নিজ বিশিষ্ট উপাদানে তৈরি। এক স্তর থেকে অন্য স্তরের উপাদান সম্পূর্ণ আলাদা। আবার প্রত্যেক স্তরের গতির দিকও আলাদা। এ বিভিন্নতার কারণ হলো—তাদের প্রেমাস্পদরূপ আলোকের ঔজ্জ্বল্য এক এক ক্ষেত্রে এক এক রূপ। গতি হলো কালের একটি অভিব্যক্তি। কালের ক্ষুদ্রতম অংশগুলির এক সূত্রে গ্রথিত বাহ্যিক রূপই গতি রূপে দেখা দেয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে পার্থক্য করা হয় শুধুমাত্র জাগতিক সুবিধার জন্যে ; কালের আদি প্রকৃতিতে এ রূপ কোনো পার্থক্য নেই। [২৭] আমরা কালের আরম্ভ বলে কোনো কিছু কল্পনা করতে পারি না ; কেন না, এই কালের আরম্ভ কল্পনাও কালবক্ষে লীন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পড়বে। অতএব কাল এবং গতি—দু'টিই চিরন্তন।

জগতের আদ্যতম উপাদান তিনটি—পানি, মাটি ও বাতাস। ইশরাকীদের মতে, আগুন হলো জ্বলন্ত বাতাস। এ-সব মৌলিক উপাদান বিভিন্ন বহিরারোপিত অবস্থার সংযোগে বিভিন্ন আকার ধারণ করে—যেমন ঃ কঠিন, তরল ও বায়বীয়। মৌলিক উপাদানাবলীর এই রূপান্তরণ পর্যায়ই হলো জাগতিক 'গড়ন ও ভাঙ্গন'—যা অনালোকের সমগ্র সত্বাব্যাপী বিরাজ-

মান। এই গড়া-ভাঙ্গা-গড়ার ফলে বস্তুসমূহ ক্রমশঃ উন্নততর আকার লাভ করে আলোক উৎসের নিকটতর হচ্ছে। বৃষ্টি মেঘ, বজ্র, উল্কা ইত্যাদি সব নৈসর্গিক ব্যাপার এই সর্ব পরিব্যাপ্ত গতির কর্মফল। তাদের উদ্ভব হলো আদি-আলোকের বস্তু জগতের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্রিয়াকর্মের ফল এবং প্রকারভেদ হলো এই আলোকথেকে বিচ্ছুরিত ঔজ্জ্বল্য পরিমাণে কম-বেশী গ্রহণক্ষমতার ফল। এক কথায়, বিশ্বজগত হলো একটি কঠিন রূপ প্রাপ্ত বাসনা বিশেষ বা একটি আলোকসান্নিধ্যকামী কামনার স্ফটিকায়িত প্রকাশ।

কিন্তু এ-কি চিরন্তন? বিশ্বজগত হলো আদি আলোকের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উপাদান স্বরূপ দীপ্তিক্ষমতার বহিঃ প্রকাশ। অতএব যে দৃষ্টিকোণ থেকে এ একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সে বিবেচনায় একে বলতে হবে একটি পর নির্ভর অস্তিত্ব বলে; অর্থাৎ, একে চিরন্তন বলে স্বীকার করা চলবে না। কিন্তু অন্য একদিক থেকে এ চিরন্তন। জাগতিক অস্তিত্বের সব বিভিন্ন স্তর চিরন্তন আলোকের ছটা এবং দীপ্তিদ্বারাই অস্তিত্বশীল থাকতে পেরেছে। কয়েক প্রকারের দীপ্তি আছে যা চিরন্তন; আর কতকগুলি হলো মৃদুতর এবং অন্যান্য দীপ্তি ও ছটার সহযোগ ছাড়া আত্মপ্রকাশে অক্ষম। যে হিসেবে আদি আলোক বা প্রাথমিক আলোকচ্ছটা সমূহের অস্তিত্ব চিরন্তন, সে হিসেবে এ সব দুর্বল আলোকচ্ছটার অস্তিত্ব চিরন্তন নয়। যখন একটি অন্ধকার দ্রব্যকে কোনো আলোকাধারের নিকটে আনা হয়, তখন দ্রব্যটি আলোকিত অর্থাৎ বর্ণায়িত হয়। অতএব আলোক-চ্ছটার তুলনায় দেখতে গেলে বর্ণটী আরোপিত। এই একই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজগত বাহ্যিক প্রকাশের বিবেচনায় অনিয়ত, কিন্তু তার মূল উৎসের চিরন্তনতা বিবেচনায় চিরন্তন। যাঁরা বিশ্ব প্রকৃতিকে নশ্বর বলে দাবী করেন, তাঁদের যুক্তিধারা আগম পদ্ধতির ব্যতিক্রম সম্ভাবনা রহিত সত্যতার উপর নির্ভরশীল। তাঁদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ—

১। অ্যাবিসীনিয়দের প্রত্যেকেই কৃষ্ণকায়;
অতএব, সব অ্যাবিসীনিয়ই কৃষ্ণকায়।

২। প্রত্যেক গতি একটি বিশিষ্ট মুহূর্তে আরম্ভ হয় ;
অতএব সর্ব প্রকার গতিই সে ভাবে আরম্ভ হয়।

কিন্তু এ ধরণের যুক্তি বিষম চক্রের সৃষ্টি করে। এর প্রধান সূত্র খাড়া করা একেবারেই অসম্ভব। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অ্যাবিসীনিয়দের সবাইকে কালের একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে হাযির করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব তেমন একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। অতএব অ্যাবিসীনিয়দের কয়েকজন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে, বা আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ গতির কয়েকটী নির্দিষ্ট অভিব্যক্তিকে বিচার করে আমরা ন্যায়তঃ এমন একটি সার্বজনীন সিদ্ধাতে আসতে পারি না যে সব অ্যাবিসীনিয়ই কৃষ্ণকায় ; বা সর্বপ্রকার গতিই কালগর্ভে উৎপন্ন।

(ই) মনস্তত্ব

নিম্নশ্রেণীর বস্তুর ব্যাপারে গতি ও আলোক আনুসঙ্গি নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একটি পাথরের টুকরাকে আলোকের সামনে আনলে তা দৃষ্টিগোচর হবে, কিন্তু সাথে সাথে নিজে থেকে তার কোনো গতিশক্তি জন্মাবে না। কিন্তু ক্রমশঃ উচ্চতর বাস্তবতার দিকে এগিয়ে আসলে আমরা দেখতে পাই যে এ সব জগতে বস্তু বা জীবের মধ্যে গতি ও আলোক একযোগে কার্যরত। অমূর্ত আলোকের সব চেয়ে উন্নত অবস্থান দেখা যায় মানুষে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে আমরা যে মানবাত্মাকে ব্যক্তিগত অমূর্ত আলোকের অভিব্যক্তি বলে অভিহিত করি, মানবীয় দেহ পরিবেশ সৃষ্টির পূর্বে তা অস্তিত্বশীল ছিল—কি ছিল না? এ প্রশ্নে ইব্‌নে সীনার যুক্তিধারার অনুসরণ করে ইশরাকী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন যে ব্যক্তিগত অমূর্ত আলোক-রশ্মিসমূহের দেহের জন্মের পূর্বে থেকে আলোককণিকারাজীরূপে অবস্থিতি সম্ভব নয়। এই অমূর্ত দীপ্তির বেলায় বস্তু জগতের 'এক' বা 'বহু'-গুণ অপ্রযোজ্য ; কেন না, এ নিজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বিচারেই এক-ও নয়, বহু ও নয়—যদিও বাস্তব সংযোগের ক্ষেত্রে

বিভিন্ন সহযোগীর ঔজ্জ্বল্য আহরণ-ক্ষমতার তারতম্যের জন্যে একে বহু মনে হয়। অমূর্ত প্রভা বা আত্মা এবং দেহের সম্পর্ক কার্য-কারণ সম্পর্ক নয়; এদের পরস্পরে বন্ধন হলো প্রেমের বন্ধন। আলোকের জন্যে তৃষ্ণাতুর দেহ তার কাম্যকে পায় আত্মার মাধ্যমে; কেন না, দেহ নিজ প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যেই আলোক উৎস ও আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনে অপারগ। আত্মা আবার তার প্রত্যক্ষভাবে আহরিত আলোক অন্ধকার স্থূল পদার্থে অর্পন করতে পারে না, যে হেতু আত্মা ও স্থূল পদার্থ নিজ নিজ গুণাগুণ বিবেচনায় অস্তিত্বের দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। অতএব এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তাদের আলোক ও অন্ধকারের মাঝামাঝি অবস্থিত একটি মাধ্যমের দরকার পড়ে। এই মাধ্যম হলো, জীব-আত্মা (animal soul) বলে পরিচিত একটি গরম, স্বচ্ছ, হাল্‌কা বায়বীয় পদার্থ। এর প্রধান আবাস স্থল হলো হৃৎপিণ্ডের বামপাশের একটি ছোট খাত; কিন্তু এ ঘুরে বেড়ায় সমগ্র দেহময়। এই জীব-আত্মার সাথে আলোকের আংশিক একত্বের দরুণই অন্ধকার রাত্রিতে স্থলচর পশুরা জলন্ত অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, আর জলচর প্রাণীরা চন্দ্রের নয়নাভিরাম রূপের আকর্ষণে বাসস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তা হলে, মানুষের কাম্য হলো জীবনের পর্যায়ে ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত হওয়া এবং ক্রমশঃ অধিকতর ঔজ্জ্বল্য আহরণ করে চলা। এ ক্রমোন্নতির পথে সে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে যখন আকারময় জগত থেকে তার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ঘটবে। কিন্তু এ আদর্শ মার্গে পৌঁছাবার উপায় কি? উপায় হলো জ্ঞানার্জন ও কর্ম সাধন। জ্ঞান ও ইচ্ছার রূপান্তর, তথা কর্ম ও চিন্তার সহযোগেই এই মহানতম আদর্শ মানুষের লভ্য হয়। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি আপনার মনোভাব পরিবর্তন করুন এবং সাথে সাথে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্ম ও চাল চলনের সংস্কার করুন। এখন জ্ঞান ও কর্মের বিবেচনায় আসা যাক।

১। জ্ঞান। যখন অমূর্তপ্রভা কোনো উচ্চতর জীবনের সংশ্রবে আসে, তখন তার কাজ হলো জীবনের বিকাশ সাধন। এর জন্যে

তার বৃত্তি বা হাতিয়ার হলো আলোকের শক্তিপুঞ্জ এবং অন্ধকারের শক্তিপুঞ্জ। প্রথম দল হলো ঃ পঞ্চেন্দ্রিয় এবং চেতনা, ধারণা, কল্পনা, বুদ্ধি ও স্মৃতি—এই পাঁচ অন্তরেন্দ্রিয়। দ্বিতীয় দল হলো ঃ পরিপুষ্টির ক্ষমতা, পরিপাক ক্ষমতা ইত্যাদি। অবশ্য বৃত্তি সমূহের এহেন বিভাগ শুধু সুবিধার খাতিরে করা। "একটী বৃত্তিই সর্বক্রিয়ার মূল উৎস স্বরূপ হতে পারে।"[২৮] মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে একটি মাত্র ক্ষমতা কার্যকরী, যদিও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম। মন হলো একটী একক। অবশ্য সুবিধার খাতিরে একে বহু-রূপে দেখা হয়। অমূর্ত আলোক হলো মানুষের নিগূঢ় অস্তিত্বের উপাদান স্বরূপ। কথিত মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে অবস্থিতিশীল শক্তিকে অমূর্ত আলোকের সাথে ভুল করলে চলবে না। এই আলোকায়নপন্থী দার্শনিক কর্মময় মন ও মূলতঃ কর্মবিরত আত্মার মধ্যে একটি পার্থক্য বোধ করতেন বলে মনে হয়। কিন্তু তবুও তাঁর শিক্ষানুযায়ী, অস্তিত্বের সর্ব প্রকার কর্মমূলক অভিব্যক্তিই কোনো রকম রহস্যজনক উপায়ে আত্মার সাথে সম্পর্কিত বলে স্বীকৃত হয়েছে।

যা হোক, তাঁর বুদ্ধিক্রিয়া সংক্রান্ত মনস্তত্বের সবচেয়ে অধিক মৌলিক অবদান হলো তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিষয়ক মতবাদ।[২৯] চক্ষু থেকে যে আলোকচ্ছটা বেরিয়ে আসে বলে মনে করা হয়, তা হয়তো একটি বস্তু, না হয় একটি গুণ। যদি গুণ হয়, তা হলে তা এক বস্তু (চক্ষু)-থেকে অন্য বস্তু (দৃষ্ট দ্রব্য)-তে স্থানান্তরিত করা যায় না। অপর পক্ষে, তা যদি একটি বস্তু হয়, তবে তা হয়তো সচেতন অবস্থায় গতিশীল হয়, না হয় তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রেরণায় গতিশীল হয়। চেতনাসম্পন্ন গতি একে অন্যান্য বস্তু অবলোকনেরও ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রাণীতে পরিণত করতো। তা হলে মানুষটী দ্রষ্টা না হয়ে এই আলোক-রশ্মিটীই দ্রষ্টা হয়ে দাঁড়াতো। আবার এই আলোক-রশ্মির গতি যদি তার প্রকৃতি সঞ্জাত একটী গুণ হতো, তবে এ গতি সবদিকে ছড়িয়ে না পড়ে একটী বিশিষ্ট দিক অবলম্বন করবার কোনো কারণ ছিল না। অতএব আলোকরশ্মিটী চক্ষু থেকে

নিক্রান্ত হচ্ছে—এরূপ মনে করা চলে না। আরস্তুপন্থীরা মনে করতেন যে দৃষ্টিপাত ক্রিয়া কালে দৃষ্ট বস্তুসমূহের ছবি চক্ষুর উপর মুদ্রিত হয়। এই মতবাদকে ইনি ভুল বলে ঘোষণা করেন, যেহেতু বৃহৎ বস্তুর ছবি ক্ষুদ্র স্থানে মুদ্রিত হতে পারে না। প্রকৃত সত্য হলো এই যে, যখন কোনো বস্তু চক্ষুর সম্মুখে আসে, তখন একটি আলোকায়নরূপ কর্ম ঘটে এবং সেই আলোকায়নের মাধ্যমে মন বস্তুটীকে দেখতে পায়। যখন বস্তুটী এবং স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তির মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না এবং মন অনুভূতির জন্যে প্রস্তুত থাকে, তখন দৃষ্টি ক্রিয়া ঘটতে বাধ্য—কেন না, এইই হলো যথাযথ কানুন। "সব দৃষ্টি ক্রিয়াই আলোকায়ন বিশেষ; এবং আমরা বস্তুকে ঈশ্বরে লীন দেখি।" বার্কলী আমাদের দৃষ্টি মূলক ধারণাবলীর পরস্পর সম্পর্ক ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সর্বপ্রকার ধারণার মূল ভিত্তি হলেন ঈশ্বর। আমাদের ইশ্‌রাকী দর্শনবেত্তার উদ্দেশ্যও তাই ছিল, যদিও তাঁর দৃষ্টি সংক্রান্ত মতবাদে আমরা দৃষ্টি ক্রিয়ার ব্যাখ্যা ততটা পাই না, যতটা পাই দৃষ্টিরূপ ঘটনার প্রতি একটি নোতুন আলোকপাত।

অবশ্য চেতনা ও যুক্তি ছাড়া জ্ঞানের আরও একটি উৎস রয়েছে যার নাম 'যওক্'। এ এক প্রকার আন্তরিক উপলব্ধি—যার সাহায্যে অপার্থিব ও স্থানাতীত জীবন স্তরাদির রূপ অভিব্যক্ত হয়। দর্শন চর্চা বা বিশুদ্ধ ধারণাবলী সম্পর্কে চিন্তাভ্যাস এবং সৎকর্ম সাধনে অবিচল তৎপরতা থেকে এই রহস্যাশ্রয়ী চেতনার উন্মেষ হয়।

আমরা চিন্তাদ্বারা যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হই, এ চেতনা সে সবকে সমর্থন ও সংশোধন করে।

২। কর্ম। কর্মশীল জীব হিসেবে মানুষের নিম্নোক্ত গতিধর্মী ক্ষমতাবলী রয়েছে ঃ—

(অ) যুক্তি বা ফিরিশতা আত্মা (angelic soul) যা বুদ্ধিবৃত্তি, বিচার বোধ এবং জ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষার উৎস।

(আ) পশু আত্মা (beast soul)—যা ক্রোধ, সাহস, পরাক্রম এবং উচ্চাশার উৎস।

(ই) জীব আত্মা (animal soul)—যা লোভ, ক্ষুধা এবং যৌনা-কাঙ্ক্ষার উৎস।

প্রথমটি চালিত করে জ্ঞানের দিকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি, যদি যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে যথাক্রমে সাহসিকতা ও সৎ জীবনের দিকে চালিত করে। সব কয়টির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে সুবিচার প্রবণতা দেখা দেয়। পুণ্য চর্চার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভবপরতা থেকে প্রমাণিত হয় যে আমাদের এই জগতই সম্ভাব্য সর্বজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কোনো বস্তু যেমন আছে তেমনটিতে ভালও নয়, মন্দও নয়। বস্তুর বা বৃত্তির অপব্যবহার বা সীমায়িত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তার ভালমন্দ আসে! কিন্তু তবুও মন্দের বাস্তবতা অস্বীকার্য নয়। মন্দ নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু ভালর তুলনায় সংখ্যায় তা অনেক কম। মন্দ অন্ধকার জগতের একটি অংশের বৈশিষ্ট্য মাত্র। বিশ্ব প্রকৃতির অন্যান্য বিরাটতর অংশ সমূহ মন্দের কালিমা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। সংশয়বাদীরা মনে করেন যে মন্দও ঈশ্বরের সৃষ্টিধর্মিতারই অন্যতম অভিব্যক্তি; এতে মানবীয় ও ঐশ্বরিক ক্রিয়াকর্মকে একই নিক্তিতে পরিমাপ করা হয়। তাঁরা এ কথাও ভুলে যান যে, তাঁদের ধারণা অনুযায়ী কোনো অস্তিত্বেরই স্বাধীনতা নেই। যে হিসেবে আমরা কোনো কোনো মানবিক ক্রিয়াকর্মকে মন্দের কারণ বলে আখ্যাত করি, সেই একই হিসেবে ঐশ্বরিক কর্মকে আমরা মন্দ সৃষ্টির মূলে দেখতে পারিনে। [৩০]

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে জ্ঞান ও পুণ্য—এ দু'য়ের সংযোগেই আত্মা অন্ধকার জগত থেকে মুক্তিলাভ করে। আমরা জাগতিক বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সম্বন্ধে যতই জ্ঞানলাভে অগ্রসর হই, ততই আমাদের আলোকের জগতের সাথে নৈকট্য লাভ হতে থাকে। এ ভাবে সে জগতের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। যেহেতু প্রেমের সোপান সংখ্যাতীত, সেহেতু আধ্যাত্মিক বিকাশের পর্যায়ও সংখ্যাতীত। যা হোক, প্রধানতম সোপানাবলী নিম্নরূপ ঃ

(অ) অহং (আমিত্ব)-পর্যায়। এ পর্যায়ে ব্যক্তি ত্ব চিন্তাই প্রধানতম এবং কর্মোদ্যমের মূলে রয়েছে স্বার্থপরতা।

(আ) 'তুমি নহ'-ত্ব পর্যায়। বহির্জগতের যতকিছু সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেয়ে নিজের অন্তর্নিহিত সত্বায় একান্তভাবে নিমগ্ন থাকা হলো এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য।

(ই) 'আমি নহি'-ত্ব পর্যায়। এ পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়েরই অবধারিত পরিণতি।

(ঈ) 'তুমি'-ত্ব পর্যায়। এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য 'আমি'-ত্ব সম্পূর্ণ-রূপে ভুলে যাওয়া এবং তুমি'-র সর্বব্যাপী স্বীকৃতি। এর অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি সর্বতোভাবে আত্ম সমর্পন।

(উ) 'আমি নহি এবং তুমি নহ'-পর্যায়। 'আমি' 'তুমি'--চিন্তার এই দুই সূত্রকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতি এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। এখানে লাভ হয় বিশ্ব চেতনা।

প্রত্যেক পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট ঔজ্জল্য আছে। অর্থাৎ, ঔজ্জল্যের কম বেশী দ্বারা এক পর্যায় অন্য পর্যায় থেকে আলাদা। আবার তার সাথে যুক্ত রয়েছে একপ্রকার অবর্ণনীয় শব্দ ঝঙ্কার। মৃত্যুর দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। মৃত্যুর পরেও ব্যক্তি-আত্মা সমূহ একে অপরের সাথে মিশে যায় না। পার্থিব জীবনে দেহের সহযোগিতায় যে আত্মা যে পরিমাণে আলোকায়িত হয়েছিল, আলোকায়নের সে পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন আত্মা বিভিন্ন অবস্থায় কালযাপন করতে থাকে। এই প্রখ্যাত আলোকায়ন দর্শনবাদী লাইব্‌নিয্‌ (Leibniz)-এর Identity of Indiscernibles-নীতির পূর্বাভাষ দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে কোনো দুইটি আত্মাই সর্বতোভাবে একপ্রকার হতে পারে না। [৩১] আত্মার পার্থিব যন্ত্ররূপ দেহকে অবলম্বনের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে ক্রম পর্যায়ে আলোকায়িত-করণ। এ যন্ত্রের কর্মক্ষমতা যখন বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন আত্মা সম্ভবতঃ পূর্ব জীবনের উৎকর্ষ অনুযায়ী অন্য কোনো দেহ অবলম্বন করে এবং অস্তিত্বের আলাদা-আলাদা স্তরে সেই সেই স্তরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আকারাদি ধারণ করে ক্রমোন্নতিশীল পথে ধাবিত হয়। এ যাত্রার শেষতম পরিণতি হলো পরিপূর্ণ বিলুপ্তি। কোনো কোনো আত্মা সম্ভবতঃ

এই পৃথিবীতেই ফিরে আসে তাদের অযোগ্যতা খণ্ডন করে নিতে।[৩২] খাঁটি তর্ক শাস্ত্রীয় বিচার-বিবেচনার সাহায্যে আত্মার দেহান্তর গ্রহণ মতবাদ প্রমাণ বা প্রত্যাখ্যান করা চলে না; অবশ্য আত্মার ভবিষ্যৎ নিয়তি বিচারে এ একটি সম্ভাব্য সমাধান। এ ভাবে সকল আত্মাই অনবরতঃ তাদের সাধারণ মূল উৎসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যখন পথের শেষ হবে, তখন সমগ্র বিশ্বজীবনকে একত্রিত করা হবে এবং আবার একটী নোতুন জীবন চক্র আরম্ভ করা হবে। এ জীবন চক্রও প্রায় সবদিক দিয়ে তার পূর্ব ইতিহাসের অনুকরণ করে চলবে। এ ভাবে চক্রের পর চক্র কালের বক্ষে প্রবহমান রয়েছে।

ইরানীয় দর্শনের মহান শহীদ শয়্খ্ শাহাবুদ্দীন সুহ্রাওয়ার্দীর মত-বাদের এই হলো সংক্ষিপ্তসার। ইরানীয় তত্বজিজ্ঞসার সমগ্র ক্ষেত্র থেকে সত্য কণিকাগুলি কুড়িয়ে এবং সেগুলি নিয়ে একটী সুসংবদ্ধ ও নিজস্ব দর্শন পদ্ধতি গড়ে তুলে তিনিই সর্ব প্রথম বিদ্বজ্জনসমাজে প্রচার করেছেন। তাঁর এ কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী 'আল্লাহ্' হলেন সর্ব প্রকার চেতনান্বিত ও আদর্শ অস্তিত্বের সামগ্রিক রূপ। এ-বিবেচনায় তাঁকে বলা যায় একজন সর্বেশ্বরবাদী।[৩৩] পূর্ববর্তী সুফীদের কারও কারও মতের বিরুদ্ধে যেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বিশ্বজগত বাস্তব এবং মানবত্মা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। গোঁড়া শাস্ত্রানুগামী ধর্ম পন্থীদের মতো তিনিও মনে করতেন যে প্রত্যেক বাহ্যদৃশ্যের আদি-তম হেতু হলো পরম আলোক, যার দীপ্তিই সমগ্র বিশ্বজগতের গুঢ় অস্তিত্ব স্বরূপ। মনস্তত্বের ক্ষেত্রে তিনি ইব্নে সীনার অনুসারী; কিন্তু তাঁর চিন্তা ভাবনা এবং প্রকাশ পদ্ধতি অধিকতর সুসমঞ্জস ও পরীক্ষাগ্রাহ্য। নীতি শাস্ত্রজ্ঞ হিসেবে তিনি আরস্তুরই অনুসরণ করেছেন। আরস্তুর মাধ্যম বিষয়ক নীতি (doctrine of the mean)-র তিনি আরও বিশদ ভাবে ব্যাখ্য দান করেন এবং উদাহরণ সাহায্যে তা সুপরিস্ফুট করে তোলেন। সর্বোপরি তিনি তৎকালীন ঐতিহ্য লালিত নিও-প্লেটনিস্ম্কে এমনভাবে সংশোধিত ও রূপান্তরিত করেন যে তা এখন ইরানীয় চিন্তাধারার সাথে সম্পূর্ণরূপে সুসমঞ্জস রূপ লাভ করে। এ মতবাদ তাঁর ব্যাখ্যা কৌশলে শুধু

যে আবার আফলাতুন (Plato)-এর মৌলিক দর্শনের দিকে ফিরে যায় তা নয়, বরং সা.থ সাথে তা পুরাতন ইরানীয় দ্বিত্ববাদকে আধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত করে তোলে। কতকগুলি নিজস্ব মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠিত করে তার আলোকে বাস্তব অস্তিত্বের সর্ব দিককে ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজনের প্রতি তাঁর মতো আর কোনো ইরানীয় চিন্তানেতা অতখানি সজাগ ছিলেন না। তিনি সর্বদাই অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং দৈহিক ঘটনাবলীকেও তাঁর আলোকায়ন তত্ত্বের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। অত্যুগ্র সর্বেশ্বরবাদ আশ্রয়ী প্রখর দৃষ্টি ভঙ্গীর ফলে তখনকার দিনে বিষয় নিবিষ্ট (Objective) বিচার একেবারে লোপ পেয়ে বসেছিল বলা যায়। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যার আলোকে তা আবার যথাযোগ্য আসন লাভ করে। শুধু তা নয়; বিশদ বিচার ও স্পষ্ট ব্যাখ্যার কল্যাণে বিষয় দৃষ্টি অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যশালী হয়ে দেখা দেয়। অতএব এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই যে এই অসাধারণ প্রতিভা শালী চিন্তানেতা এমন একটি দর্শন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে কৃতকার্য হয়ে ছিলেন, যা চিন্তাশক্তি ও ভাবাবেগের পরিপূর্ণ মিলন ঘটিয়ে সর্বকালের দার্শনিক মনের উপর এক অতুলনীয় মায়া বিস্তার করতে পেরেছে। হীনচিত্ত সমসাময়িকেরা তাঁকে 'মক্‌তূল' (নিহত ব্যক্তি) আখ্যা দিয়েছিলেন; কেন না, তাঁদের মতে তিনি 'শহীদ' (ধর্মার্থে উৎসর্গিত প্রাণ) আখ্যার অযোগ্য। কিন্তু পরবর্তী কালের সূফী এবং দার্শনিকেরা তাঁকে গভীরতম শ্রদ্ধার আসনে সযত্নে পোষণ করে এসেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমি ইশ্‌রাকী দর্শনের আর একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল আধ্যাত্মিক মতবাদের উল্লেখ করতে পারি। নসফী [৩৪] একটি সূফী দর্শন পদ্ধতির বিবরণ রেখে গেছেন, যা শেষ পর্যন্ত পুরাতন বস্তুধর্মী মানীয় দ্বিত্ব বাদে পর্যবসিত হয়। এ দলের ভাবুকেরা মনে করেন যে আলোক আর অন্ধকার পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য। আলোক-অন্ধকার যেন সঙ্গমশীল দু'টি নদীসদৃশ—একটি দুগ্ধের, অন্যটি তৈলের—[৩৫] এবং এই দুগ্ধ ও তৈলের মিশ্রণ থেকে জাগতিক বস্তু সমূহের বৈচিত্র্যাবলীর অভ্যুদয়। মানুষের কর্ম জীবনের আদর্শ হলো অন্ধকারের কালিমা থেকে মুক্তি এবং অন্ধকার

থেকে আলোকের মুক্তির অর্থ হলো আলোকের আলোক-হিসেবে আত্ম চৈতন্য অর্জন।

[২] সত্যের চিন্তারূপ—আল্‌জি লী

আল্‌জি'লী নিজের এক কবিতায় তাঁর জন্ম সন ৭৬৭ হিজ্‌রী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মৃত্যুসন ৮১১ হিজ্‌রী। শয়্‌খ্‌ মহীউদ্দীন ইব্‌নে আরবীর মতবাদ ও চিন্তাধারা তাঁকে অত্যধিকভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি ইব্‌নে আরবীর মতো রচনাকুশলী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে কবি-কল্পনা ও দার্শনিক প্রতিভার একত্র সমাবেশ ঘটে এবং তাঁর কবিকীর্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয় তাঁর মরমী ও প্রাজ্ঞানিক মতবাদের রূপ দিতে। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে শয়্‌খ মহীউদ্দীন ইব্‌নে আরবীর লিখিত 'আল্‌ফুতুহাতুল্‌ মক্কীয়াহ্‌'-গ্রন্থের একটি টিকা পুস্তক, 'বিস্‌মিল্লাহ'র একটি ভাষ্য এবং সুপ্রসিদ্ধ রচনা 'ইন্‌সানুল্‌ কামিল্‌' (কায়রোতে মুদ্রিত)।

তাঁর মতে, খাঁটি এবং সরল গূঢ় অস্তিত্বই আসল জিনিষ—তাতে আপনি যে নাম ও গুণাগুণই আরোপ করুন না কেন—সে বাস্তব জগতেই হোক্‌ বা আদর্শ জগতেই হোক্‌। অস্তিত্ব দুই জাতীয় ঃ—

(অ) স্বয়ংসম্পূর্ণ বা বিশুদ্ধ অস্তিত্ব--অর্থাৎ যাঁর অস্তিত্ব অবিমিশ্র—আল্লাহ্‌।

(আ) অনস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত অস্তিত্ব—সৃষ্টি-জগত—প্রকৃতি। আল্লাহ্‌র গূঢ় অস্তিত্ব বা নির্মল চিন্তা রূপ জ্ঞানের অতীত। কোনো বাক্য দ্বারা একে বোঝানো যায় না ; কেন না, এ সর্ব সম্পর্কের অতীত, আর জ্ঞান একটা সম্পর্ক বিশেষ। মানুষের চিৎশক্তি অন্তহীন মহাশূন্যের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত বিহার করে, নাম ও গুণাগুণের পর্দা ভেদ করে, কালের সুবিশাল মণ্ডল পরিভ্রমণ করে, তারপর অনস্তিত্বের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে। সেখানে সে অমলিন চেতনা-রূপের গূঢ় অস্তিত্বকে দেখতে পায় অনস্তিত্ব রূপে ; বলতে গেলে, এ একটি পরস্পর বিরোধিতার যৌগীক রূপ।[৩৬] এর দু'টী অনুসঙ্গ

আছে ; যথা ঃ সমগ্র অতীত কালের বক্ষে অনন্ত জীবন এবং সমগ্র ভবিষ্যৎ কালের বক্ষে অনন্ত জীবন। এর দু'টী অভিব্যক্তি আছে ; যথা ঃ আল্লাহ্-রূপ এবং সৃষ্টি-রূপ। এর দু'টী সংজ্ঞা আছে ; যথা ঃ অ-সৃষ্টিযোগ্যতা এবং সৃষ্টিযোগ্যতা। এর দু'টী নাম আছে ; যথা ঃ আল্লাহ্ এবং মানুষ। এর দু'টী অবয়ব আছে ; যথা ঃ প্রকাশমান (এই বিশ্বজগত) এবং অ-প্রকাশমান (পরজগত)। এর দু'টি কার্যকারিতা আছে ; যথা ঃ প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্যতা। এর দু'টী দৃষ্টিভঙ্গি আছে ; যথা ঃ প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ নিজের জন্যে অনস্তিত্বশীল, নিজের বাইরে অস্তিত্বশীল এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—এ নিজের জন্যে অস্তিত্বশীল এবং নিজের বাইরে অনস্তিত্বশীল।

তাঁর মতে, নামের কর্তব্য হলো নাম-প্রাপ্ত বস্তুটীকে জ্ঞানের আওতায় আনা, মনে তার ছবি ফুটিয়ে তোলা, কল্পনায় তাকে উপস্থাপিত করা এবং স্মরণে তাকে রক্ষা করা। নাম হলো নামপ্রাপ্তের বহির্বাস বা খোলস স্বরূপ ; আর নাম-প্রাপ্তই হলো প্রকৃত অস্তিত্ব বা সারাংশ। এমন কতক নাম আছে যা শুধু নামমাত্র, অর্থাৎ যা অবাস্তব—যেমন ঃ 'আন্‌কা' (এক প্রকার কাল্পনিক পক্ষী)। এ এমন একটি নাম যার ধারণকারী কিছু বাস্তব জগতে নেই। যে ভাবে 'আন্‌কা' সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্ব বিহীন, সেভাবেই আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান, যদিও তাঁকে ধরা ছোঁয়া বা দেখা যায় না। আনকা-র অস্তিত্ব হলো শুধুমাত্র কল্পনারাজ্যে ; কিন্তু 'আল্লাহ্'-নামধারীর অস্তিত্ব একান্তভাবে সত্য, যদিও আনকা-র ন্যায় তাঁকেও চেনা যায় শুধুমাত্র নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে। নাম হলো এখানে একটী দর্পণ-স্বরূপ, যার সহায়তায় পরম-অস্তিত্বের সর্বপ্রকার গোপন তত্ত্বের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। এ একটি আলোক-বর্তিকা স্বরূপ, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে দেখেন। আল্‌জি'লী এখানে 'নামের মাধ্যমে নামাধারের সন্ধান কর'—ইস্‌মাইলীয়াদের এ মতবাদের নিকটবর্তী হয়েছেন।

এই কথাগুলি বুঝতে হলে আমাদের আল্‌জি'লী-বিবৃত পরম-সত্বার বিকাশ-ধারার তিন পর্যায়ের কথা মনে রাখতে হবে। তাঁর মতে, পরম সত্বা

বা নির্মল আত্মা নিজের অনন্যনির্ভরতা ত্যাগ করেন তিনটি পর্যায়ে। এ তিন পর্যায় হলো ঃ (১) এক-ত্ব, (২) 'সে'-ত্ব ও (৩) 'আমি'-ত্ব। প্রথম পর্যায়ে সর্বপ্রকার গুণাগুণ ও সম্পর্কের অনুপস্থিতি সূচিত হয়; তবু তাকে বলা হয় 'এক'। অতএব এই একত্ব-ই অনন্যনির্ভরতা থেকে বিচ্যুতির প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মল আত্মা সর্বপ্রকার বহিঃপ্রকাশ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং তৃতীয় পর্যায় ('আমি'-ত্ব) প্রকৃতপক্ষে 'সে'-ত্বর বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। হেগেল্ এই পর্যায়কে বলেছেন ঈশ্বরের আত্ম অবলুপ্তি (self diremption)। এই তৃতীয় পর্যায়ই আল্লাহ্-নামের মণ্ডল। এখানে নির্মল আত্মার অন্ধকার আলোকিত হয়, তার প্রকৃতি প্রকাশমান হয় এবং পরম-আত্মা চেতনালাভ করে। আল্জি'লী আরও বলেন যে 'আল্লাহ্-নাম হলো ঈশ্বরত্বের বিভিন্ন অবস্থার সর্বৈব পরিপূর্ণতার মূল ভিত্তি। পবিত্র আত্মার ক্রমোন্নতির দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ্র আত্মবিলোপনের যা কিছু ফল, তার সবটাই এই মহা নামের প্রবল কুক্ষিতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছিল; এবং তৃতীয় পর্যায়ে এ নাম বাস্তবায়িত হয়ে দর্পণরূপে আত্মপ্রকাশ করলো, যাতে আল্লাহ্ নিজেকে প্রতিফলিত করেন। এ ভাবে স্ফটিকায়িত হয়ে তা পরম-আত্মার সর্বকালিমারেখা দূর করে দিলো।

পরম সত্বার বিকাশের এই তিন পর্যায়ের সাথে সাথে 'ইন্সানে কামিল্' বা পূর্ণ বিকশিত মানব-এর জন্যেও আধ্যাত্মিক শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে বিকাশধারা উল্টো দিক থেকে আরম্ভ হতে বাধ্য; কেন না, মানুষের বেলায় গতি হলো আরোহনের দিকে; আর পরম আত্মার গতি ছিল বিশেষভাবে অবরোহনের দিকে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রাথমিক স্তরে মানুষের কাজ হলো নাম-মাহাত্ম্যে অভিনিবিষ্ট হওয়া এবং যে প্রকৃতির উপর এ নামের মোহর পড়েছে, তাকে অনুধাবন করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি গুণাবলীর মণ্ডলে পদক্ষেপ করেন এবং তৃতীয় পর্যায়ে নিগূঢ় অস্তিত্বের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন। এখানে উপনীত হলেই সাধক পূর্ণবিকশিত মানবের মর্যাদা লাভ করেন। তখন তাঁর দৃষ্টি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে, তাঁর বাক্য আল্লাহ্র বাক্যে এবং

তাঁর জীবন আল্লাহ্‌র জীবনে পরিণত হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ জীবনানুভূতির সাথে তাঁর জীবনানুভূতি মিশে যায় এবং তিনি সব কিছুর জীবন-রহস্যের সন্ধান লাভ করেন।

এখন গুণাবলীর আলোচনায় আসা যাক্‌। এই বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক বিষয়ে আল্‌জি'লীর মতামতের গুরুত্ব সমধিক; কেন না, এখানেই তিনি হিন্দু আদর্শবাদ থেকে মৌলিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি গুণ-এর সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেছেন যে, এ এমন একটী মাধ্যম যার সাহায্যে আমরা বস্তুর অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি।[৩৭] অন্যত্র তিনি বলেছেন যে বস্তুর অন্তর্নিহিত পরিচিতি ও গুণের মধ্যে এই যে পার্থক্য, তা শুধুমাত্র প্রকাশমান জগতে প্রযোজ্য; কেন না, এখানে প্রত্যেক গুণকে মনে করা হয় বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য কিছু বলে। এই 'অন্য' ত্ব বোধের কারণ হলো দৃশ্যমান জগতে সংগঠন ও বিখণ্ডনের অস্তিত্ব। কিন্তু এই বিভিন্নতা অপ্রকাশমান জগতে প্রযোজ্য নয়; কেন না, সেখানে কোনো সংগঠন বা বিখণ্ডন নেই। এ বিষয়ে তিনি মায়াবাদ থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে পড়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বাস্তব জগতের অস্তিত্ব সত্য। অবশ্য তা প্রকৃত অস্তিত্বের বাইরের খোলস মাত্র। কিন্তু তা হলেও বাহ্যিক আবরণ-হিসেবে এর অস্তিত্ব কম সত্য নয়। তাঁর মতে, বাহ্যিক ঘটনাময় জগতের হেতু গুণাবলীর সমগ্রতার পেছনে লুক্কায়িত কোনো সত্যিকার অস্তিত্ব নয়। বরং তা হলো মনের তৈরি একটী ধারণা, যাতে বাস্তব জগতকে বুঝতে কোনো কষ্ট না হয়। এ পর্যন্ত বার্কলী (Berkley) ও ফিক্‌টে (Fichte)-কে তাঁর সাথে একমত হতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না; কিন্তু এরপর তাঁর মতবাদ তাঁকে অতি সুস্পষ্টভাবে চিন্তা এবং অস্তিত্বের অভিন্নতা মূলক হেগেলীয় মতবাদের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। 'ইন্‌সানুল্‌ কামিল্‌'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের সাঁইত্রিশ অধ্যায়ে তিনি পরিষ্কাররূপে ঘোষণা করেছেন যে বিশ্বজগত সৃষ্টির মূল উপাদান হলো ধারণা। চিন্তা, ধারণা বা ভাবই হলো প্রকৃতির কাঠামোর লোহা লক্কড় স্বরূপ। এই মতবাদের উপর জোর দিতে যেয়ে তিনি বলেন

"তুমি কি তোমার নিজের বিশ্বাসের দিকে দৃষ্টি দাও না? তথাকথিত ঐশ্বরিক গুণাবলী যে বাস্তব অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবার কথা—তা কোথায়? তা ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৩৮] অতএব বিশ্বপ্রকৃতি একটী স্ফটিকায়িত ধারণা বই আর কিছু নয়। কা'ণ্ট (Kant)-এর 'ক্রিটিক্ অভ্ পিওর রীয্ন্' (Critique of Pure Reason)-এর সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি তিনি সানন্দ সমর্থন জানিয়েছেন; কিন্তু কা'ণ্ট-এর সাথে একমত না হয়ে তিনি এই 'ধারণা'-কেই বিশ্ব-প্রকৃতির অস্তিত্বমূল বলে বিবৃত করেছেন। তাঁর বিবেচনায় কা'ণ্ট এর Ding an sich (Thing in itself) একটী পুরোপুরি অনস্তিত্ব; গুণাবলীর সমাহারের পেছনে অন্য কিছুই নেই। গুণাবলীই হলো প্রকৃত বস্তু। বাস্তব জগত পরম সত্বার বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়; পরম সত্বার অন্য অভিব্যক্তি—যে অভিব্যক্তি তাঁরই প্রকৃতির বৈচিত্র্য নীতি—থেকে এ উদ্ভূত। বিশ্ব প্রকৃতি হলো আল্লাহ্‌র ধারণা বিশেষ। এ এমন একটি কিছু যার প্রয়োজন তাঁর কাছে দেখা দিয়েছিল তাঁর নিজেরই সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্যে। হেগেল্ তাঁর নীতিকে বলেছেন 'চিন্তা ও অস্তিত্বের অভিন্নতাবাদ'। আল্‌জি'লী নিজ নীতিকে বলেন 'গুণ ও বাস্তবের অভিন্নতাবাদ'। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থকার 'গুণাবলীর জগত' বলতে যে ভাবে বস্তুময় জগতকে বোঝাচ্ছেন, তাতে কথঞ্চিৎ ভুল বোঝবার সম্ভাবনা রয়েছে। যা তিনি সত্যিকার ভাবে বিশ্বাস করতেন, তা হলো এই যে গুণ ও বাস্তবের মধ্যে যে পার্থক্য তা শুধুমাত্র দৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার; বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে এ পার্থক্যের স্থান নেই। এটা আমাদের প্রয়োজনে আসে; কেন না এর সাহায্যে আমরা পারিপার্শ্বিক জগতকে সহজে বুঝতে পারি। কিন্তু আদতে এ মোটেই সত্য নয়। আমরা বুঝতে পারছি যে আলজি'লী 'পরীক্ষা মূলক আদর্শবাদ' (Empirical Idealism) এর সত্যতা মাত্র পরীক্ষামূলক ভাবেই স্বীকার করছেন, কিন্তু এই বিভিন্নতার অনন্য নির্ভর সত্যতা স্বীকার করছেন না। এই আলোচনা থেকে অবশ্য এ কথা বুঝলে চলবে না যে আল্‌জি'লী বস্তুর নিজস্ব সত্যতা স্বীকার করতেন না। তিনি নিশ্চই

তাতে বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু তিনি তার অভিন্নতা ঘোষণা করতেন। তাঁর মতে বস্তুময় জগত হলো নিজে থেকেই অস্তিত্বশীল; এ হলো সত্যের 'অন্য দিক' বা আসল অস্তিত্বের বহিঃ প্রকাশ। Ding an sich এবং তার বাহ্যিক প্রকাশ বা আত্মবিলোপন সংঘটন প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন, যদিও বিশ্বজগতকে বোঝবার সুবিধের জন্যে আমরা তাদের ভিন্নরূপে দেখি। তিনি বলেন, যদি দু'টি এক বা অভিন্ন না হতো, তবে একটী আর একটীকে প্রকাশ করতো কি করে? এক কথায়, তিনি Ding an sich-কে মনে করছেন নির্মল পরম আত্মা রূপে এবং তাঁকে খুঁজছেন বিশ্বজগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ বা বাহ্যিক বিকাশের মাধ্যমে। তাঁর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুণাগুণ ও প্রকৃত অস্তিতের অভিন্নতা না উপলব্ধি করতে পারি, ততক্ষণ বস্তু জগত বা গুণাগুণের জগত আমাদের কাছে একটী পর্দার মতো মনে হয়। কিন্তু যখন আসল নীতিসূত্র আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হয়, তখন এই পর্দা সরে যায়। তখন আমরা নিগূঢ় অস্তিত্বকে সর্বত্র দেখতে পাই এবং বুঝতে পারি যে তাঁর সর্ব গুণাগুণ আমরা-ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্ব প্রকৃতি তখন সত্যিকার রূপে দেখা দেয়; সব 'অন্য'ত্ব দূরিভূত হয় এবং আমরা প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যাই। অনুসন্ধিৎসার দংশন জ্বালা দূরিভূত হয়ে তখন আমাদের অন্তরে অন্বেষণ-বৃত্তির পরিবর্তে একটী দার্শনিক সুলভ প্রশান্তি দেখা দেয়। যে ব্যক্তি এই অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃতি দ্বারা কোনো নোতুন খবর লভ্য হয় না এবং অতি প্রাকৃতিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন ধর্মের তাঁকে বলবার কিছু থাকে না। এইই হলো আধ্যাত্মিক মুক্তি।

এখন আমরা দেখতে পারি, আল্লাহ্‌র যে সব নাম ও গুণাবলী বিশ্ব প্রকৃতিতে স্বপ্রকাশ রয়েছে, অথবা তাঁর ঈশ্বরত্বকে স্ফটিকায়িত করেছে বলা চলে, আল্‌জি'লী সেগুলিকে কি ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তা হলো নিম্নরূপ ঃ—

(অ) যে সব নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্‌র আত্মস্থতাজ্ঞাপক (আল্লাহ্‌, একক, বিজোড়, আলোক, সত্য, নির্মল, জীবন্ত)।

(আ) যে সব নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্‌র মহিমার উৎসরূপ জ্ঞাপক (সুমহান এবং সুউন্নত, সর্বশক্তিমান)।

(ই) যে সব নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্‌র পরম সুন্দররূপ জ্ঞাপক (অ সৃজনীয়, পরম শিল্পী, দয়াময়, সব কিছুর মূল উৎস)।

এ সব নাম ও গুণাবলীর প্রত্যেকটীই পরিপূর্ণ মানবের আত্মা ও বিশ্ব-প্রকৃতিকে আলোকায়িত করবার বেলায় নিজ নিজ বিশিষ্টরূপে প্রকাশমান। কি ভাবে এ আলোকায়ন সংঘটিত হয় এবং কি ভাবে এ সব নাম-মহিমা-রাজী মানুষের আত্মায় প্রভাব বিস্তার করে, তা আল্‌জি'লী ব্যাখ্যা করেন নি। এ সব ব্যাপারে তাঁর নীরবতা থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় কোন্ কোন্ স্থানে তাঁর দর্শন মরমীয়াবাদ আশ্রয়ী এবং কোথায় কোথায় তিনি আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত পথ-নির্দেশকের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

আল্লাহ্‌র বিশেষ বিশেষ নাম ও গুণাবলী সম্বন্ধে আল্‌জি'লীর মতামত বিবেচনার পূর্বে আমরা অন্য একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। তাঁর উপরিউক্ত নামাবলীর শ্রেণীবিন্যাস থেকে দেখা যায় যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা শ্লেয়ারম্যাকার (Schleiermacher)-এর ধারণার অত্যন্ত কাছাকাছি। এই জার্মান ধর্মবেত্তা ঈশ্বরের সমুদয় গুণাবলীকে একটিমাত্র বিশিষ্ট গুণ—'শক্তি'-র অন্তর্ভুক্ত করে দেখেন। আমাদের গ্রন্থকার আল্লাহ্‌কে সব গুণ থেকে মুক্ত করে দেখবার বিপদ বুঝতে পেরেও শ্লেয়ার-ম্যাকার এর সাথে একমত হয়ে বলেন যে আল্লাহ্ তাঁর নিজের মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয় একক-স্বরূপ ; এবং তাঁর গুণাবলী "তাঁর সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মতামত ছাড়া আর কিছুই নয়। একটী অপরিবর্তনীয় কারণের দিকে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি নিয়ে আধ্যা-ত্মিক দৃশ্যপটের বিভিন্ন দিক থেকে দৃষ্টিপাত করে বিভিন্ন রকম ছবি দেখতে পাই মাত্র।"[৩৯] তাঁর অন্য নিরপেক্ষ অস্তিত্বে তিনি নাম ও গুণাবলীর দ্বারা সীমায়নের অতীত। কিন্তু যখন তিনি নিজেকে বহির্জগতে অভ্যুদিত করেন, তখন তিনি অন্যনিরপেক্ষতা ত্যাগ করেন। অন্য কথায়, যখন

বিশ্বপ্রকৃতি জন্মলাভ করে, তখন তার বহিরাবরণের উপরেই নাম ও গুণাবলীর ছাপ পড়ে যায়।

এখন অল্লাহ্‌র বিশেষ বিশেষ নাম ও গুণাবলীর সম্বন্ধে আল্‌জি'লীর শিক্ষা আমরা অনুধাবন করতে পারি। প্রথম মৌলিক নাম হলো আল্লাহ্‌ (ঈশ্বরত্ব)—যার অর্থঃ অস্তিত্বের সর্ব-সত্যের সমাহার এবং সে সমাহারে সত্য সমূহের যথাযথ ক্রমবিন্যাস। এই নাম তাঁর প্রতি প্রযোজ্য হয় একমাত্র অবধারিত অস্তিত্বরূপে। ঈশ্বরত্বেই হলো পবিত্র সত্বার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ; এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে তাঁর প্রকাশ আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য, কিন্তু তাঁর নিজের 'ঠিকানা' অজ্ঞাত। তাঁর পদচিহ্ন দৃশ্যমান, তিনি অদৃশ্য। বিশ্বপ্রকৃতিকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের স্ফটিকায়িত রূপ; অতএব তা নিজে সত্যিকার ঈশ্বর নয়। অতএব এ কথা বলা যায় যে তিনি নিজে অদৃশ্য থেকে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকৃতি দর্পনে মানবচক্ষুর গোচরে আনেন। লেখক উদাহরণচ্ছলে বলেন যে, আল্লাহ্‌কে যদি পানি বলে ধরা হয় তবে প্রকৃতি হলো বরফ স্থানীয়; কিন্তু বরফ পানি নয়। পরম সত্বাকে এ ভাবে দৃষ্টিগোচর মনে করলেও [লেখকের 'প্রাকৃতিক বাস্তববাদ বা অবিমিশ্র আদর্শবাদ'—Natural Realism or Absolute idealism-এর আর একটী প্রমাণ], তার সর্ব গুণাগুণ আমাদের জ্ঞাত নয়। এমন কি, এ সব গুণাগুণের আসল পরিচয়ও আমরা রাখি না ঃ এগুলির ছায়া বা ক্রিয়ার সাথেই আমরা পরিচিত মাত্র। উদাহরণতঃ, দাক্ষিণ্য ব্যাপারটী অজ্ঞাত; কিন্তু তার ক্রিয়া অর্থাৎ দরিদ্রজনকে কিছু দেবার ঘটনাটা আমরা জানতে ও দেখতে পাই। এর কারণ হলো, এ সব গুণাগুণ পরম সত্বার প্রকৃতির সাথেই নিবদ্ধ। যদি এ সব গুণাগুণের খাঁটি প্রকৃতির প্রকাশ সম্ভব হতো, তবে এ সব গুণাগুণকে পরম সত্বা থেকে আলাদা করাও সম্ভব হতো। কিন্তু আল্লাহ্‌র আরও কয়েকটী মৌলিক নাম আছে, যেমন ঃ অন্যনিরপেক্ষ একত্ব এবং অমিশ্র (simple) একত্ব। অন্যনিরপেক্ষ একত্ব হলো, বেদান্তের দৃষ্টিতে, অন্তর্নিহিত বা মৌলিক মায়ার অন্ধকার (darkness of Cecity)-থেকে বিশুদ্ধ চেতনার প্রকাশমানতার আলোকে

অভ্যুদিত হবার প্রথম পদক্ষেপ। যদিও এই অবস্থান্তরের সাথে কোনো বাহ্যিক অভিব্যক্তির যোগ থাকে না, তবু এর সুবিশাল বিশ্বজনীনতার মধ্যে সর্ব-অভিব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। গ্রন্থকার বলেছেন: আপনার সামনের দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; নিশ্চয়ই আপনি সবটা দেওয়াল এক দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু যে সব মাল মসলা দিয়ে দেওয়ালটীর অবয়ব গড়ে উঠেছে, সে সব আপনার দৃষ্টির অতীত। দেওয়ালটা একটী একক, কিন্তু তার অন্তরালে রয়েছে বৈচিত্র্য সমাবেশ। সেইরূপ নির্মল চেতনা একটী একক, কিন্তু আসলে সে একত্ব বৈচিত্র্যের আত্মা-রূপ।

পরম সত্বার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো অমিশ্র একত্বে—যেখানে বাহ্যিক অভিব্যক্তির সাথে তাঁর যোগ সাধিত হয়। অন্যনিরপেক্ষ একত্ব সর্বপ্রকার বিশিষ্ট নাম বা গুণাগুণ থেকে মুক্ত। অমিশ্র একত্বে আসীন পরম সত্বা নাম ও গুণাবলী গ্রহণ করেন; কিন্তু এই গুণাবলীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই একটী অন্যটীর মূলরূপ। ঈশ্বরত্ব হলো অমিশ্র একত্বের অনুরূপ; কিন্তু এর নামাবলী ও গুণাবলীতে পার্থক্য, এমন কি—পরস্পর বিরোধিতা বিরাজমান; যেমন, উদারতা গুণ প্রতিশোধপ্রবণতা গুণের বিপরীত।[80] তৃতীয় পদক্ষেপ (হেগেলের ভাষায়: Voyage of the Being) আর একটী গুণ বিশিষ্ট। এ গুণ হলো দয়া। লেখক বলেন: করুণার প্রথম প্রকাশ হলো তাঁর নিজের থেকে বিশ্বপ্রকৃতির উদ্বোধন এবং তাঁর আত্মবিলোপনের ফলে উদ্ভূত বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেকটী অণুপরমাণুতে নিজেকে অভিব্যক্তকরণ। আল্‌জি'লী আবার একটী উপমা দিয়ে এ ব্যাপারটী পরিষ্কাররূপে বোধগম্য করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন: বিশ্বপ্রকৃতি হলো বরফ-রূপ এবং আল্লাহ্‌ হলেন জল-রূপ। প্রকৃতির সত্যিকার নাম আল্লাহ্‌। বরফ বা জমাট জল একটী ধার করা আখ্যা মাত্র। অন্যত্র তিনি পানিকে বলেছেন: জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, চিন্তা ও ধারণার উৎস। আল্লাহ্‌ বিশ্ব-প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত (immanent) অথবা বাস্তব অস্তিত্বের মণ্ডলে সঞ্চরণ-মান—এ রকম ভুল ধারণা পোষণ করা থেকে উপরিউক্ত উপমাই তাঁকে বাঁচিয়ে দেয়। তিনি বলেন: পরিব্যাপ্তি অস্তিত্বের বৈলক্ষণ্যসূচক। আল্লাহ্‌

পরিব্যাপ্ত নন্; কেন না, তিনি নিজেই হলেন অস্তিত্ব-রূপ। চিরন্তন অস্তিত্ব হলো আল্লাহ্‌র 'অন্য সত্বা'; এ'টা সেই আলোক, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে দেখেন। কোনো একটা ধারণার উদ্ভাবক যেমন সেই ধারণার মধ্যে অস্তিত্বশীল, তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্ অস্তিত্বশীল। আল্লাহ্ ও মানুষের পার্থক্য বিচারে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র ধারণাবলী স্বতঃই বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু মানুষের ধারণাবলী তা হয় না। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে হেগেল্ ও নিজেকে সর্বেশ্বরবাদিত্বের অপবাদ থেকে বাঁচাবার জন্যে এ ধরণের যুক্তিতর্কই প্রয়োগ করতে পারতেন।

দয়াবৃত্তি (Mercy) দানবৃত্তি (Providence)-র সাথে নিকট সম্পর্কিত। আল্‌জি'লীর সংজ্ঞানুসারে, এতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, তার সবটাই অন্তর্ভুক্ত। এই নামের মাহাত্মেই বৃক্ষাবলী তাদের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ পায়। প্রকৃতি-দার্শনিকেরা অবশ্য এ কথাটা অন্য ভাবে বলবেন। তাঁরা বলতে পারেন যেঃ এ হলো প্রকৃতির এক ধরণের শক্তির ক্রিয়ার ফল। আল্‌জি'লী বলবেনঃ এ হলো দানবৃত্তির একটি অভিব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃতি-দার্শনিক যেমন এ শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানগম্যতা অস্বীকার করেন, আল্‌জি'লী তা করেন না। তিনি বলবেন, এর পেছনে কোনো রহস্য লুকিয়ে নেই; এ হলো পরম সত্বা নিজেই।

আল্লাহ্‌র মৌলিক নাম ও গুণাবলীর আলোচনা এখানে শেষ করে, আমরা এখন সব কিছুর পূর্বে কি অস্তিত্বশীল ছিল এবং তার প্রকৃতি কি এ প্রশ্নের বিবেচনায় আসবো। আলজি'লী বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্‌কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্‌র অবস্থিতি সম্বন্ধে। উত্তরে তিনি বলেন যে সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছিল 'আমা' বা অন্ধতায়। এই অন্ধত্ব বা আদি-অন্ধকারের প্রকৃতি সম্বন্ধেই আমরা এখন আলোচনা করবো। এই আলোচনা বিশেষভাবে কৌতুকাবহ এই কারণে যে আধুনিক পরিভাষায় এ কথাটির প্রতিশব্দ হবে 'পরম অচৈতন্য' (The Unconsciousness)। কি প্রখর ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি নিয়ে আলজি'লী আধুনিক জার্মানীর প্রাজ্ঞানিক মতবাদাবলীর পূর্বাভাষ দিয়ে গেছেন, এই একটি মাত্র শব্দে

তা আমাদের মনে স্পষ্টরূপে দেখা দেয়। তিনি বলেন, এই পরম অচৈতন্যই সর্ব সত্যের সার সত্য। এইই হলো অনবতরণশীল পরম আত্মা। এ আল্লাহ্, এবং সৃষ্টির গুণাবলী থেকে মুক্ত। এর কোনো নাম বা প্রকারের প্রয়োজন নেই; কেন না, এ হলো সম্পর্ক-মণ্ডলের অতীত। এ অন্য-নিরপেক্ষ একত্ব-রূপ থেকেও ভিন্ন; কেন না, পরম সত্তা দৃশ্যমানতার দিকে নেমে আসবার পথেই সে নামে ভূষিত হন। এ অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমরা যখন আল্লাহ্‌র অগ্রবর্তিতা এবং সৃষ্টির পরবর্তিতার বিষয় উত্থাপন করি, তখন আমাদের বক্তব্য থেকে কালের পূর্বাপরতা সূচিত হয় না; কারণ আল্লাহ্ আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো কালগত বিভেদ বা ব্যবধান থাকতে পারে না। কাল, স্থান ও কালের নিরবচ্ছিন্নতা—এ সবও সৃষ্ট। অতএব কি করে সৃষ্টির একটী অংশবিশেষ আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে? অতএব এ প্রসঙ্গে আমরা 'আগে' 'পরে' 'কোথায়' 'কোথা থেকে' ইত্যাদি যে সব কথা ব্যবহার করছি, সে সব বুঝবার বেলায় কাল বা স্থান সম্পর্ক আনা অবান্তর। প্রকৃত ব্যাপার মানুষের ধারণার অতীত; বাস্তব অস্তিত্বের কোনো পর্যায় এর প্রতি প্রযোজ্য নয়; কেন না, কা'ণ্ট্ (Kant)-এর কথায়:

The laws of phenomena cannot be spoken of as obtaining in the sphere of noumena.

—প্রত্যক্ষ অনুভূতির রাজ্যে প্রচলিত কানুনাদি নিয়ে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের দেশে চড়াও হ'তে যাওয়া অসঙ্গত।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে মানুষ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় তিনটী পর্যায়ে। প্রথম পর্যায় হলো নাম-মাহাত্ম্যের অনুধাবন। লেখক একে বলেছেন: নাম সমূহের আলোকায়ন। তিনি বলেন: আল্লাহ্, যখন কোনো মানুষকে তাঁর নামাবলীর আলোকে আলোকায়িত করেন, তখন সে সেই নামের তীব্র ঔজল্যে ভস্মীভূত হয়ে যায়, এবং যখন তুমি আল্লাহ্‌কে ডাক, তখন সেই মানুষটি সাড়া দেয়।' শোপেন্‌হাওয়ারের

ভাষায়, এই আলোকায়ন ক্রিয়ার ফল হলো ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিনাশ; এ কে দৈহিক মৃত্যু বলে মনে করলে ভুল করা হবে। কেন না, কপিলের কথায়, মানুষটী প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যাবার পরেও দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে থাকবে এবং 'চরকার মতো ঘুরতে থাকবে।' এ অবস্থাতেই ব্যক্তি সর্ববস্তুতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব দেখতে পায়, আর সে মনোভাব থেকে চিৎকার করে ওঠে: "সে ছিল আমি, আমি ছিলাম সে; আমাদেরকে আলাদা করবার মতো কোনো কিছু মধ্যে ছিল না।"[৪১]

আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বিতীয় পর্যায়কে তিনি বলেছেন গুণাবলীর আলোকায়ন। এই আলোকায়নের দ্বারা পরিপূর্ণ মানব আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সত্য প্রকৃতি নিজের গ্রহণক্ষমতার পরিমাপ অনুসারে লাভ করতে থাকেন। অন্য কথায়, এই আলোকায়ন মানুষকে তার ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ অনুসারে আলাদা আলাদাভাবে শ্রেণীভুক্ত করে। কোনো কোনো মানুষ আল্লাহ্‌র জীবনরূপ গুণ থেকে আলোক গ্রহণ করে বিশ্বপ্রকৃতির আত্মার সাথে মিশে যায়। এই আলোক লাভের ফলে মানুষ আকাশে উড়তে পারে, পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে বা বস্তুর ওজন বাড়াতে কমাতে পারে। (হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম অনেকবার এ রকম করেছেন।) এ ভাবে পরিপূর্ণ মানব আল্লাহ্‌র সবগুণ থেকেই আলোক গ্রহণ করেন, নাম ও গুণাগুণের মণ্ডল পার হয়ে যান এবং সর্বশেষে নিগূঢ় অস্তিত্ব বা পরম আত্মার খাস্ রাজ্যে উপনীত হন।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে পরম-আত্মা যখন তাঁর অনন্য-নির্ভরতা ত্যাগ করেন, তখন তাঁকেও তিন পর্যায়ে যাত্রা করতে হয়। এর প্রত্যেকটী পর্যায় হলো নিগূঢ় আত্মার সার্বজনীন রূপকে এক এক বিশেষ দিক্ দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলার আয়োজন। প্রত্যেকটীই দেখা দেয় এক একটী বিশিষ্ট মৌলিক নামের ছাপ নিয়ে—যে নামের মানবাত্মার উপর নিজ বিশিষ্ট আলোকায়ন ক্ষমতা রয়েছে। এখানেই আমাদের গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিক নীতিশাস্ত্র ব্যাখ্যা সমাপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় পৌঁছালে মানুষ

পরিপূর্ণতা লাভ করলো, পরম-আত্মার সাথে নিজেকে মিশিয়ে নিলো; অথবা হেগেল্ যাকে বলেছেন 'The Absolute Philosophy (অন্য নিরপেক্ষ দর্শনজ্ঞান)'—তা তার আয়ত্ব হলো। "তিনি তখন পরিপূর্ণতার চরমে পৌঁছালেন, পূজার যোগ্য হলেন এবং বিশ্ব-জগত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।"[৪২] তিনিই সেই বিন্দু, যেখানে মানবত্ব আর ঈশ্বরত্ব এক হয়ে যায় এবং যেখান থেকে 'বিধাতা-মানব' জন্মলাভ করেন।

গ্রন্থকার আমাদের জানান্নি, কি ভাবে পরিপূর্ণ মানব এই চরমতম আদর্শে যেয়ে পৌঁছান। কিন্তু তিনি বলেন যে, প্রত্যেক পর্যায়ে এই পরিপূর্ণ মানবের এমন সব অভিজ্ঞতাবলী ঘটতে থাকে, যাতে তাঁর মনে সামান্যতম সন্দেহ বা উদ্বেগের অবশিষ্ট থাকতে পারে না। তিনি প্রকাশ করেন যে এই অভিজ্ঞতার হাতিয়ার হলো 'ক্বল্ব্' (হৃদয়)—যাকে সংজ্ঞা দান করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তিনি এই 'ক্বল্ব্'-এর একটী অতি রহস্যপূর্ণ নক্সা দিয়েছেন এবং এই বলে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এ হলো সেই চক্ষু যা নামাবলী, গুণাবলী ও পরম আত্মন্কে পর্যায়ক্রমে অবলোকন করে। এর অস্তিত্ব লাভ হয়েছে আত্মা ও মনের এক রহস্যময় সমাহারের ফলে এবং নিজ প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যেই এ হয়ে দাঁড়ায় অস্তিত্বের নিগূঢ় সত্যাবলী উপলব্ধির যন্ত্র-রূপ। 'হৃদয়' বা বেদান্তের কথায়, 'উচ্চতর জ্ঞানের উৎস'-থেকে যা ব্যক্ত হয়, তার সবকিছু আমরা নিজেদের থেকে আলাদাভাবে বা বিজাতীয়রূপে দেখি না। এই বিশিষ্ট দৃষ্টি-ক্ষমতার মারফত্ মানুষ যা দেখে, তা হলো তার নিজের সত্যিকার-রূপ, নিজের গভীর অস্তিত্বের পরিচিতি। এ দৃষ্টিশক্তির এ বৈশিষ্ট্যই তাকে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে পৃথক করেছে; কেন না, বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দেশ্য হলো সর্বদাই ব্যক্তিকে তার নিজের দিক্ থেকে উপলব্ধি করতে বাধা দেওয়া। কিন্তু এ-সম্প্রদায়ের সুফিদের মতে এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা স্থায়ী নয়। ম্যাথিউ আর্নল্ড্[৪৩] বলেন "আধ্যাত্মদৃষ্টির মুহূর্তগুলি আমাদের আজ্ঞাবহ হতে পারে না।" বিধাতা-মানব তিনি, যিনি আপন অস্তিত্বের রহস্য জেনেছেন, যিনি নিজেকে বিধাতা-মানব বলে চিনেছেন। কিন্তু যখন

লীর সমাহার, ঐশ্বরিক ব্যবস্থাপনা, নাম ও গুণাবলীর ছাপ এবং আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বস্তুরূপ।

(ঊ) শ্রুতির আগোচরকে শুনবার ক্ষমতা।

(ঋ) দৃষ্টির আগোচরকে দেখবার ক্ষমতা।

(৯) রূপ প্রকৃতিতে যাকে সবচেয়ে কম রূপময় মনে হয় (প্রতিফলিত রূপ), নিজ সত্তিকার অস্তিত্বে তা-ই হলো প্রকৃত রূপ। 'কু' বা মন্দ হলো আপেক্ষিক মাত্র; তার প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। পাপ হলো একটি আপেক্ষিক পঙ্গুতা মাত্র।

(এ) মহিমা বা রূপের প্রগাঢ়তা।

(ঐ) পরিপূর্ণতা—যা আল্লাহ্‌র তুলনাহীন মহিমার নির্যাস,—যা মানবীয় জ্ঞানের অতীত, অতএব অসীম ও অপার।

পাদটিকাবলী

(১) "আমাদের কাছে সংবাদ এসে পৌঁচেছে যে ভ্যানেরিয়ন পরাজিত হয়েছেন, এখন তিনি স্যাপর-এর হাতে বন্দী। এদিকে ক্রাঙ্ক, অ্যালেমান্নি, গথ্‌ এবং পারসীক আক্রমনাশঙ্কাও আমাদের অধোগত রোমীয় সাম্রাজ্যের উপর পালাক্রমে বিভীষিকা বিস্তার করে চলেছে।" —Plotinus to Flaccus—Vaughan-এর Half-hours with Mystics-গ্রন্থে উদ্ধৃত; ৬৩ পৃষ্ঠা।

(২) নিও প্লেটনিস্‌ম্‌-এর মধ্যে প্রাথমিক যুগে যে ভাবোন্মাদনার বীজ ছিল, পরেকার চিন্তানেতারা ক্রমশঃ তাকে পশ্চাৎ ভূমিতে রেখে তাঁদের মতবাদকে চিন্তার উচ্চতর মার্গে এগিয়ে আনেন। তাতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখদুঃখ চিন্তা থেকে এ দর্শন পদ্ধতি ক্রমশঃ সরে পড়তে থাকে। হুইট্যাকার (Whittaker) বলেন ঃ এ দর্শনের পরবর্তী শিক্ষকদের কাছে এর রহস্যাশ্রয়ী ভাবোন্মাদনার দিক্‌টা সহজলভ্য নয় বলে মনে হলো এবং ক্রমশঃ কঠিনতর মনে হতে লাগলো। শেষতক্‌ তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন যে পৃথিবীপৃষ্ঠে তা একেবারেই অলভ্য। —Neo-Platonism, ১০১ পৃষ্ঠা।

(৩) সূরা ২, ১৪৬। (৪) ২ঃ২। (৫) ৫১ঃ২০—২১। (৬) ৫ঃ ১৫। (৭) ২৪ঃ৩৫। (৮) ৪২ঃ৯। (৯) ১৭ঃ৮৭। (১০) ৮৮ঃ ২০। (১১) ১৬ঃ৯২।

(১২) ল্যাসেন (Lassen)-এর উল্লেখ করে ওয়েবার (Weber) বলেন "আল্ বিরূনী একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পতঞ্জলির গ্রন্থ আরবীতে আনুবাদ করেন। সাংখ্যসূত্রের অনুবাদও তিনি করে ছিলেন বলে বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য এ সব পুস্তকের তথ্যাবলী আমরা এ সূত্রে যা পাচ্ছি, তা মৌলিক সংস্কৃত থেকে পাওয়া তথ্যাবলীর সাথে মিশ্ খায় না।"—History of Indian Literature, ২৩৯ পৃষ্ঠা।

(১৩) J. R. A. S. April, 1906-সংখ্যায় মিঃ নিকল্সন্ সূফিবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা সংগ্রহ করেছেন।

(১৪) মস্নভীয়ে জালালুদ্দীন রূমী, বাহ্রুল উল্ম-এর ভাষ্যসহ। লখ্নৌ (ভারত), ১৮৭৭, ৭ পৃষ্ঠা।

(১৫) বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে Geiger বলেন "আমরা জানি যে অ্যালেকযাণ্ডারের পরবর্তী যুগে পূর্ব ইরানে বৌদ্ধ ধর্ম সবিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তবরিস্তান পর্যন্ত এ ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি, এ নিশ্চিত যে ব্যাক্ট্রিয়ায় পর্যন্ত বৌদ্ধ শ্রমণেরা ধর্মপ্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন। এ অবস্থা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়ে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিরাজিত ছিল। এ সময়ে ইসলাম ধর্মের প্রসার কাবুল ও ব্যাক্ট্রিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের গতিরোধ করে। যরথুস্ত্রীয় কিম্বদন্তী যে আকারে আমরা দকীকীর মারফত পেয়েছি, তার সূত্রপাত এ যুগেই হয়েছিল বলে আমাদের মনে করতে হবে।"

—Civilisation of Eastern Iranians, Vol. II, ১৭০ পৃষ্ঠা।

(১৬) নসফীর মকাসিদ্ই আক্সা, fol. 8b. (১৭) ঐ, fol. 10b.

(১৮) ঐ, fol. 23b. (১৯) ঐ, fol. 3b. (২০) ঐ, fol. 15 b.

(২১) Whittaker কৃত Neo-Platonism, ৫৮ পৃষ্ঠা। (২২) ঐ, ৫৭ পৃষ্ঠা।

(২৩) দবিস্তান, ৮ম অধ্যায়।

(২৪) Erdmann, Vol. I, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

(২৫) আল্ইশ্রাকীর হিক্মতুল ইশ্রাক-এর আল্হারাভী-কৃত ভাষ্য ঃ শর্হে আন্ওয়ারিয়াহ্, fol. 10 a. (২৬) ঐ, fol. 11b. (২৭) ঐ, fol. 34. (২৮) ঐ, fol. 57b. (২৯) ঐ, fol. 60b. (৩০) ঐ, fol. ৯২ b. (৩১) ঐ, fol. 82. (৩২) ঐ, fol. 87b. (৩৩) ঐ, fol. 81b.

(৩৪) মক্সদ্ই আক্সা, fol, 21a. (৩৫) ঐ, ঐ।

(৩৬) ইন্সানুল কা'মিল, ১ম খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা। (৩৭) ঐ, ২২ পৃষ্ঠা।

(৩৮) ঐ, ২য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

(৩৯) Matheson কৃত Aids to the Study of German Theology, ৪৩ পৃষ্ঠা।

(৪০) এ ধারণাকে বেদান্তের 'প্রকাশমান ব্রহ্ম'র ধারণার অতি কাছাকাছি মনে হবে। বেদান্তের ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত স্রষ্টা বা প্রজাপতি হলেন পরমসত্বা বা নিরাধার ব্রহ্মার তৃতীয় পদক্ষেপ। আল্জি'লী শঙ্কর ও বদরায়নের ন্যায়, গুণবান ও নির্গুণ—এ দু'রকম ব্রহ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন বলে মনে হয়। তাঁর মতে, সৃষ্টিপর্যায় হলো নির্মল চেতনারূপের মূলতঃ নীচে নেমে আসার ফল। এখানে তিনি অন্যনিরপেক্ষ রূপে 'অসৎ', আর প্রকাশমান, তথা সীমায়িতরূপে 'সৎ'। এই অনাপেক্ষিক একত্ববাদের স্বীকৃতিসত্বেও তাঁকে আবার রামানুজের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। মনে হয়, তিনি ব্যক্তি-আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং শঙ্করের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলতে চান যে—এমন কি, উচ্চতর জ্ঞান লাভের পরেও ঈশ্বর স্বীকৃতি এবং ঈশ্বরের পূজার প্রয়োজন লোপ পায় না।

(৪১) ইন্সানুল কা'মিল্, প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা। (৪২) ঐ, ঐ, ৪৮ পৃষ্ঠা।

(৪৩) "We cannot kindle when we will
The fire which in the heart resides."

[যে অগ্নি হৃদয়-কন্দরে বাস করে,
তাকে জ্বালানো আমাদের ইচ্ছাধীন নয়।]

(৪৪) ইন্সানুল্ কা'মিল, ১ম খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

— — —

(129)

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরবর্তী ইরানীয় চিন্তাধারা

ইরানের পরবর্তী দুর্ধর্ষ তাতার শাসকদের স্বাধীন চিন্তা চর্চার প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দেবার মতো অবস্থা ছিল না। ফলে এ যুগে ইরানের চিন্তা বিকাশে স্বাভাবতঃই বিঘ্ন ঘটে। স্থফিবাদ ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল; অতএব তা পূরাতন ধর্মীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকের সামঞ্জস্য সাধন ও কিছু কিছু নোতুন চিন্তাভাবনায় আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু খাঁটি দর্শন শাস্ত্র তাতারদের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়েছিল। এমন কি, ইসলামী কানুন শাস্ত্রের বিকাশেও বাধা পড়েছিল; যেহেতু হানফী ফিকাহ্ই তাঁদের ধারণায় ছিল মানবীয় চিন্তাশক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ এবং এর পরে আরও চুলচেরা বিবেচনা তাঁদের মস্তিষ্কের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রবীন ও ঐতিহ্যবান চিন্তানেতারা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে আর একত্র সমাবিষ্ট রাখতে পারলেন না; অনেকে অন্য কোথাও উন্নততর অবস্থার সাক্ষাৎ লাভের আশায় মাতৃভূমি ত্যাগ করলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাই দস্তর ইস্পাহানী, হীর বদ্, মুনীর, কামরান প্রমুখ ইরানীয় আরস্তু-পন্থীরা ভারতে ভ্রমণরত অবস্থায় দিন যাপন করছেন। এখানে সম্রাট আকবর নিজের এবং নিজ সভাসদদের (এঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ইরানীয়) জন্যে একটী নবধর্মের অন্বেষণে যোরো'ষ্ট্রীয় ধর্ম নিয়ে গভীর গবেষণা আরব্ধ করেছিলেন। যা হোক, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইরানে কোনো প্রখ্যাত দার্শনিকের অভ্যুদয় দেখা যায় না। এ সময়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মোল্লা সদ্‌রা শিরাযী শক্তিশালী যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ দর্শন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে, সর্ববস্তুই হলো সত্য; কিন্তু সত্য এ সব বস্তুর মধ্যে নেই। প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে বিষয়ী এবং বিষয়-এর একত্বের উপলব্ধিতে। দ্য গোবিনো (De Gobineau) মনে করেন যে সদ্‌রার দর্শন হলো ইব্‌নে সীনার মতবাদের

পুনঃ প্রবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি অবশ্য এ সত্য ভুলে গেছেন যে ইরানীয় বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সর্বত্র যে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রতি একটা প্রবণতা কাজ করে চলেছে, মোল্লা সদ্‌রার বিষয়-বিষয়ী একত্ববাদ তার শেষ পরিণতি মাত্র। বিশেষতঃ সদ্‌রার দর্শনই পরে প্রাথমিক বা'বীয় প্রজ্ঞানের উৎসরূপে কাজ করেছে।

কিন্তু প্লেটনিস্‌ম্‌ বা আফলাতুন-পন্থী মতবাদের দিকে প্রগতি সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয় মোল্লা হাদী সব্‌য্‌ওয়ারীর চিন্তাধারায়। তাঁর সাধনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে মনে করেন ইরানের শ্রেষ্ঠতম আধুনিক চিন্তানেতারূপে। ইরানের অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিন্তাধারার নমুনা হিসেবে আমি এই শ্রেষ্ঠ ভাবুকের মতবাদের কিছু কিছু তাঁর নিজদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ 'আস্‌রারুল হিকম্‌' থেকে উদ্ধৃত করছি। তাঁর দর্শনচিন্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ইসলাম-পরবর্তী ইরানীয় ভাবধারার সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত তিনটি মৌলিক ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ; যথা ঃ—

(১) সত্যের অনাপেক্ষিক একত্বের ধারণা—যাকে 'আলোক' বলে বিবৃত করা হয়েছে।

(২) উদ্বর্তনবাদের ধারণা—যা যোরো'ষ্টারের মানবাত্মার নিয়তি সম্পর্কীয় মতবাদে অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে এবং পরে ইরানীয় নিও-প্লেটনীয় পন্থীদের ও সুফীদের দ্বারা অনেকখানি প্রসার ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

(৩) পরম-সত্য ও অ-সত্যের মধ্যে একটি মধ্যস্থের ধারণা।

ইরানীয় মনন কি করে ধীরে ধীরে নিও-প্লেটনীয়পন্থীদের নির্গমনবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, সে এক বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার। শুধু তা নয় ; এ ভাবে আত্মমুক্তি সাধন করে তা বিশুদ্ধতর আফলাতুনীয় দর্শনের ধারণাবলী আহরণ করতে থাকে। অন্যদিকে স্পেনের আরব মুসলিম দার্শনিকেরা একই নিষ্কাসন পদ্ধতি অবলম্বন করে, একই নিও-প্লেটনিস্‌ম মাধ্যমের হাত ধরে বিশুদ্ধতর আরস্থ দর্শনে উত্তীর্ণ হন। এ থেকে দু'জাতির প্রবণতার বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা যায়। ল্যুইস্‌ (Lewes) তাঁর Biographical

History of Philosophy-গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে আরবরা ঔৎসুক্যের সাথে আরস্ত দর্শন অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন শুধুমাত্র এই কারণে যে আফলাতুনকে তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল না ; কিন্তু আমার মনে হয়ে যে আরব প্রতিভা হলো পুরোপুরিভাবে ব্যবহারিক মনোভাবাপন্ন। অতএব আফলাতুন-দর্শনকে তার সত্যিকাররূপে তাঁদের সামনে উপস্থাপিত করা হলেও, আরবদের রুচির সাথে তা খাপ খেতো না। আমার বিশ্বাস, গ্রীকদর্শনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে শুধুমাত্র নিও-প্লেটনিস্‌মকেই সামগ্রিকভাবে মুসলিম জগতের ভাবুকদের কাছে পৌঁছানো হয়েছিল ; তবুও ধীরস্থির সমালোচনা মূলক গবেষণার পথে আরবরা প্লটিনাস থেকে আরম্ভ পর্যন্ত এবং ইরানীরা আফলাতুন পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন। এটা মোল্লা হাদীর দর্শনে বিশেষভাবে প্রকট। তিনি নির্গমনতত্ত্বকে স্বীকার না করে সোজাসুজি আফলাতুনের সাথে সৎ-এর ধারণায় এসে পড়েন। অন্য একটা বিষয়ও তাঁর সাধনায় লক্ষ্যণীয় ; তা এই যে, যে দেশে পদার্থবিদ্যা বিকাশ লাভ করেনি বা অধীত হয় না, সে দেশে দার্শনিক কল্পনা শেষতক ধর্মের আওতায় ঢাকা পড়তে বাধ্য। এর প্রকৃষ্ট উপমা স্বরূপ তাঁর দর্শন চর্চার পরিণতি অনুধাবন করা যায়। 'নিগূঢ় সত্বা'—যা প্রাজ্ঞানিক হেতুরূপ—অপর পক্ষে, বৈজ্ঞানিক হেতু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—যার অর্থ হলো পূর্ববর্তী অবস্থাবলীর সামগ্রিকরূপ—অন্য কোনো ধারণার অবর্তমানে ক্রমে ক্রমে তা ধর্মীয় বিবেচনায় হেতুরূপ 'আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত ইচ্ছা'-য় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এইই সম্ভবতঃ ইরানীয় দর্শনধারাবলীর শেষ পর্যন্ত ধর্মের মোহানায় আত্মনিমজ্জনের গভীরতর কারণ।

এখন আমরা মোল্লা হাদীর দর্শন পদ্ধতির আলোচনায় আসতে পারি। তাঁর শিক্ষা অনুসারে, যুক্তির দু'টি দিক রয়েছে ; যথা :—

(অ) তত্বমূলক—যার ক্ষেত্র হলো দর্শন ও গণিত ;

(আ) ব্যবহারিক—যার ক্ষেত্র হলো গার্হস্থ্য অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি।

খাঁটি দর্শন শাস্ত্রের বিচার্য হলো বস্তুজগতের আরম্ভ ও শেষ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং খুদী (অহং) সম্পর্কীয় তত্ত্বোপলব্ধি। এর সাথে আল্লাহ্‌র কানুনাদি সম্বন্ধে জ্ঞানও আসে। এ হলো ধর্মেরই অন্য নাম। বস্তুর আরম্ভের কথা বুঝতে হলে, বিশ্বজগতের বিভিন্ন দৃশ্যাবলীকে আমাদের সুতীব্র আলোকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এ রকম বিশ্লেষণের ফলে আমরা সাক্ষাৎ পাই তিনটী মৌলিক নীতির ঃ – [১]

(১) সৎ—বা আলোক

(২) ছায়া

(৩) অ-সৎ—অন্ধকার।

সৎ হলো অনন্য নির্ভর ও অপরিহার্য। কিন্তু ছায়া হলো আপেক্ষিক ও অনিয়ত। সৎ নিজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুসারেই মঙ্গলময়, এ যে মঙ্গলময়—এ নীতি স্বতঃসিদ্ধ। [২] সর্বপ্রকার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব যে পর্যন্ত সৎ কর্তৃক বাস্তবায়িত না হয়েছে, সে পর্যন্ত অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব—দু'রকম সম্ভাবনারই অধীন। এ দু'রকম সম্ভাবনাই পুরোপুরি সমান সমান; অতএব এখান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বের বাস্তব রূপদানকারী সৎ নিজে অনস্তিত্ব হতে পারে না; কেন না, অনস্তিত্ব অনস্তিত্বের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে অস্তিত্ব উৎপাদন করতে পারে না। [৩] মোল্লা হাদী তাঁর সৎ-এর কর্ম-কর্তারূপ ধারণায় আফলাতুনের বিশ্বজগতের স্থিতিশীলতা ধারণা সংশোধন করেছেন এবং আরস্তুর অনুসরণে সৎ-কে দেখছেন স্থিতিশীল উৎস এবং সর্ব গতিশীলতার লক্ষ্য হিসেবে। তিনি বলেন "বিশ্বজগতের সব জিনিষই পরিপূর্ণতা ভালবাসে। সকলেই তাদের শেষ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেঃ খনিজ জগত উদ্ভিদ জগতের দিকে, উদ্ভিদ জগত প্রাণী জগতের দিকে এবং প্রাণীজগত মনুষ্যত্বের দিকে। এবং দেখ, মানুষ মাতৃজঠরে কি রকম এ সব পর্যায়ের মধ্যদিয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।" [৪] যিনি গতির সঞ্চারক, তিনি গতির সঞ্চারক হিসেবে হয়তো গতির উৎস, অথবা গতির লক্ষ্য, অথবা দুইই। যা-ই হোন, তিনি নিজে হয়তো গতিশীল, না হয় স্থিতিশীল। সব গতিসঞ্চারক নিজেরাই গতিবিশিষ্ট—এ সূত্র গ্রহণ করলে অফুরন্ত

পশ্চাদ্ধাবন নীতি স্বীকার করে নিতে হবে এবং এ পশ্চাদ্ধাবন শেষ হবে স্থিতিশীল গতিসঞ্চারকে এসে পৌঁছালে। তা হলে, এইই হলো সর্বগতিশীলতার উৎস ও উদ্দেশ্য। তা-ছাড়া, সৎ হলেন একটী বিশুদ্ধ ঐক্য-রূপ ; কেন না, যদি সৎ-এর সংখ্যা একাধিক হতো, তবে একে অন্যের উপর সীমা আরোপ করতো। স্রষ্টা হিসেবেও সৎ-কে একাধিক মনে করা চলে না ; কেন না, স্রষ্টার সংখ্যা একাধিক হলে সৃষ্টজগতের সংখ্যাও একাধিক হতে হতো, এবং সৃষ্টজগত যেহেতু বৃত্তাকার, তখন এক বৃত্ত অন্য বৃত্তকে স্পর্শ করতো। এর অর্থ হলো শূন্য (Vacuum)-এর পরিব্যাপ্তি, যা অসম্ভব। [৫] অতএব পরম সত্বা হিসেবে সৎ হলেন এক ; আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বহু। তিনি জীবন, শক্তি, প্রেম। যদিও আমরা বলতে পারি না যে এ সব গুণ তাঁর অন্তর্নিহিত, তবুও এ সবই তিনি, তিনিই এ সব। এককত্ব একত্ব বুঝায় না ; এর গূঢ় অস্তিত্ব হলো 'সকল সম্পর্ক পরিহারক'। সূফী ও অন্যান্য দর্শন-পন্থীদের সাথে একমত না হয়ে মোল্লা হাদী বিশ্বাস করেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বহুত্বে বিশ্বাস এককত্বে বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় ; যেহেতু দৃশ্যমান বহু আসলে সৎ এর বিভিন্ন নাম ও গুণাবলীর বাহ্যিক প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এ সব গুণাবলী সৎ-এর নিগূঢ় অস্তিত্বরূপ জ্ঞানের বিভিন্ন দিক। অবশ্য, সৎ এর গুণাবলীর কথা বলা ভাব প্রকাশের সুবিধার্থে মাত্র ; কারণ "সৎ-কে সংজ্ঞাদান করবার মানে হলো তাঁর উপর সংখ্যার পর্যায় আরোপ করা"। এ হতে পারে না ; কেন না, এতে সম্পর্কাতীতকে সম্পর্কের আওতায় আনবার প্রয়াস রয়েছে। সর্ব বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগত সৎ বা পরম আলোকের বিভিন্ন নাম ও গুণাবলীর একটী ছায়া মাত্র। এ হলো সৎ-এর অভিব্যক্তি, আলোক-এর 'হও'-রূপ বাক্য বা নির্দেশ।[৬] দৃশ্যমান বহুত্ব হলো অন্ধকারের আলোকায়ন বা 'নাস্তি'র বাস্তবায়ন। জাগতিক বস্তুসমূহ বিভিন্ন ; কেন না, আমরা যেন সেগুলিকে দেখি ধারণারূপ বিভিন্ন বর্ণের কাচের মধ্যদিয়ে। এ প্রসঙ্গে হাদী কবি জামীর নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটী দৃঢ় সমর্থন সহকারে উল্লেখ করেছেন ঃ

> "ধারণাবলী হলো বিভিন্ন বর্ণের কাচ
> যাতে সত্যের সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়
> এবং নিজেকে প্রতিভাত করে
> লাল, হলদে ও নীলরূপ।" [৭]

এই সুন্দর কাব্যিক প্রকাশ অবশ্য আফলাতুনের ধারণা-তত্ত্বের প্রতিধ্বনি।

মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ ইব্‌নে সীনাকে অনুসরণ করেন; কিন্তু তাঁর আলোচনা স্পষ্টতর ও সুসমঞ্জস। তিনি আত্মাকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেন :—

- আত্মা
  - স্বর্গীয়
  - পার্থিব
    - মানবীয়
    - পাশবিক
    - উদ্ভিদ

উদ্ভিদ ক্ষমতাবলী :-
(১) আত্মরক্ষা
(২) আত্মোন্নয়ন
(৩) বংশবৃদ্ধি

পাশবিক আত্মার তিন ক্ষমতা :—
(১) বাহ্যেন্দ্রিয়াবলী } অনুভূতি
(২) আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়াবলী } অনুভূতি
(৩) গতিশীলতা, তন্মধ্যে
(অ) স্বেচ্ছামূলক গতি
(আ) অনিচ্ছামূলক গতি

বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহ হলো : স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ, শ্রুতি ও দৃষ্টি। শব্দ কানের বাইরে ঘটে। যাঁরা মনে করেন যে শব্দ কানের মধ্যে ঘটে, তাঁরা ভ্রান্ত; কেন না, শব্দ যদি কানের বাইরে না ঘটতো, তা হলে তার দিক্ ও দূরত্ব

নির্ণয় করা সম্ভব হতো না। শ্রুতি ও দৃষ্টি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ, এবং দৃষ্টি শ্রুতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ; কেন না—

(১) চক্ষু দূরবর্তী বস্তু দেখেতে পায়

(২) চক্ষুর উপলব্ধি হলো আলোকের সাহায্যে—যা সর্বগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

(৩) চক্ষুর নির্মাণকৌশল কর্ণের নির্মাণকৌশলের চেয়ে অধিক কারু-কার্যপূর্ণ ও নাযুক।

(৪) চক্ষু উপলব্ধি করে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহ ; কিন্তু কর্ণের উপলব্ধির বিষয় অনস্তিত্ব-সদৃশ।

আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়াবলী হলো ঃ—

(১) সাধারণ বুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান—যা মনের ফলক স্বরূপ। এ হলো মনের প্রধানমন্ত্রী সদৃশ। পাঁচটী গুপ্তচর (পঞ্চেন্দ্রিয়)-এর সাহায্যে এ বহির্বিশ্ব থেকে খবরাদি আহরণ করে। আমরা যখন বলি "এই শাদা জিনিষটী মিষ্টি," তখন শাদাত্ব ও মিষ্টিত্ব আমরা অনুভব করি চক্ষু ও স্বাদের সাহায্যে ; কিন্তু গুণ দুইটী যে এই একই বস্তুতে রয়েছে সে সিদ্ধান্তে আসে কাণ্ডজ্ঞান। একটী পানির ফোঁটা উপর থেকে পড়তে যে একটী রেখার সৃষ্টি করে, চক্ষুর বিচারে সেটী একটী ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমরা যে রেখাটী দেখি সেটী কি ? হাদী বলেন, এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে হলে এমন আর একটী ইন্দ্রিয়ের কল্পনা করা প্রয়োজন, যা পড়ন্ত ফোঁটাটীর লম্বা হয়ে একটী রেখায় পরিণত হবার দৃশ্য অবলোকন করে।

(২) কাণ্ডজ্ঞান সঞ্জাত অনুভূতিকে স্থায়ীত্বদায়ী বৃত্তি—অবশ্য এ হলো ছবিরূপ, স্মৃতির মতো ধারণা রূপ নয়। শাদাত্ব এবং মিষ্টিত্ব যে একই বস্তুতে রয়েছে—এ রায় পূর্ণতা লাভ করে এই বৃত্তির কাছে ; কেন না, এ বৃত্তি যদি উদ্দেশ্যটীর ছবি পোষণ না করতো, তবে কাণ্ডজ্ঞানের পক্ষে বিধেয়কে উপলব্ধি করা সম্ভব হতো না।

(৩) যে শক্তি বা বৃত্তি ব্যক্তিগত ধারণাকে উপলব্ধি করে। মেষদল নেকড়ে বাঘকে শত্রু মনে করে তার সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে যায়। কোনো

কোনো প্রাণীর এ ক্ষমতা নেই ; যেমন পতঙ্গদল প্রদীপের অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

(৪) স্মৃতি—ধারণাবলীর আশ্রয়স্থল।

(৫) ছবি ও ধারণাকে সংযুক্ত করে দেখবার ক্ষমতা—যেমন ডানাযুক্ত মানুষ কল্পনা। এই বৃত্তি যখন ধারণাবলীর ব্যক্তিগত উপলব্ধি-ক্ষমতার দ্বারা চালিত হয়, তখন তার নাম দেওয়া যায় 'কল্পনা'। যখন এ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, তখন তাকে বলা যায় প্রতীতি।

কিন্তু মানুষকে যে বৃত্তি অন্যান্য প্রাণীজগত থেকে বিশিষ্টতা দিয়েছে, সেটা হলো চৈতন্য। মানবসত্বার এ নির্যাস হলো একটা এককত্ব, একত্ব নয়। বিশ্বজনীনতাকে এ নিজেথেকে উপলব্ধি করে এবং বৈশিষ্ট্যকে দেখে বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে। এ হলো পরম-আলোকের ছায়ারূপ এবং পরম আলোকের মতোই এ বহুবিধ উপায়ে আত্মপ্রকাশ করে। বহুত্ব এর এককত্বের আয়ত্ব। চৈতন্য ও দেহের মধ্যে কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক নেই। চৈতন্য অপার্থিব ও স্থানাতীত ; অতএব এ পরিবর্তনের অতীত এবং দৃশ্যমান বহুত্বকে বিচার করবার ক্ষমতাসম্পন্ন। নিদ্রার সময় চৈতন্য 'আদর্শদেহ' অবলম্বন করে ; এ আদর্শদেহও অবশ্য বস্তুময় দেহের মতোই কার্যরত থাকে। জাগ্রত অবস্থায় এ সাধারণ বাস্তব দেহকেই ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চৈতন্যের জন্যে এ দুই দেহের একটীও অপরিহার্য নয়। সে ইচ্ছামতো তাদের ব্যবহার করে। হাদী আফলাতুনের আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ মতবাদ স্বীকার করেন নি ; বরং বিশদ যুক্তির সাহায্যে তিনি এ মতবাদের বিভিন্নদিক খণ্ডন করেছেন। তাঁর বিশ্বাস মতো, চৈতন্য অমর ; এর আদি-নিবাস পরম আলোকের কাছে এ ফিরে যায় ক্রমবিকাশ ও পরিপূর্ণতার পথে চলে। যুক্তি বিকাশের পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ ঃ—

(অ) তত্ত্বমূলক বা বিশুদ্ধ যুক্তি—

প্রথম ঃ অব্যক্ত যুক্তি

দ্বিতীয় ঃ স্বতঃসিদ্ধ সূত্রাবলীর ধারণা

তৃতীয় ঃ প্রকৃত যুক্তি
চতুর্থ ঃ বিশ্বজনীন প্রত্যয়াবলীর ধারণা।
(আ) ব্যবহারিক যুক্তি—
প্রথম ঃ বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা সাধন
দ্বিতীয় ঃ আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা সাধন
তৃতীয় ঃ নানারূপ অভ্যাস অবলম্বন
চতুর্থ ঃ আল্লাহ্‌র সাথে মিলন।

এ ভাবে চৈতন্য ক্রমশঃ জীবনের উচ্চতর পর্যায়াবলীর পথে অগ্রসর হয়ে শেষ লক্ষ্যে উপনীত হয়, অর্থাৎ নিজেকে পরম আলোকের বিশ্বজনীনতায় বিলুপ্ত করে দিয়ে তাঁর সাথে চিরন্তন অস্তিত্বের অংশিদার হয়। "নিজে অস্তিত্বহীন, অথচ চিরন্তন বন্ধুর অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল; একই সাথে 'আছি' এবং 'নেই'—কী অপরূপ ব্যাপার!" কিন্তু চৈতন্যের কি এ পথ অবলম্বন করা বা না করার স্বাধীনতা আছে? মু'তাযিলাপন্থীরা মানুষকে মন্দের স্বাধীন স্রষ্টা বলে স্বীকার করে নেবার জন্যে হাদীর কাছে তিরস্কৃত হয়েছেন। তাঁদেরকে তিনি বলেছেন 'প্রচ্ছন্ন দ্বিত্ববাদ'-সমর্থক। তিনি বলেন যে প্রত্যেকটী বস্তুর দুই দিক্ আছে ঃ উজ্জ্বল দিক্ আর অন্ধকার দিক্। বস্তুসমূহ আলোক ও অন্ধকারের সমাহার। সব উৎকর্ষ উজ্জ্বলতর দিক্ থেকে আসে, আর সব অপকর্ষ আসে অন্ধকার দিক্ থেকে। অতএব মানুষ একাধারে মুক্ত ও সীমায়িত।

কিন্তু ইরানীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন প্রবাহ আবার সমন্বয় লাভ করে এ-কালের সুপ্রসিদ্ধ ইরানীয় ধর্মীয় আন্দোলন বা'বী বা বাহায়ী মতবাদের মারফত্। এ আন্দোলন মির্যা আলী মুহম্মদ বা'ব শিরাযী (জন্ম ঃ ১৮২০ খৃষ্টাব্দ)-র দ্বারা একটী শিয়াহ্ সাম্প্রদায়িক মতবাদরূপে আরম্ভ হয়। গোঁড়া আনুষ্ঠানিক ধর্মপন্থীদের অত্যাচার উৎপীড়ন যত বাড়তে থাকে, এ মতবাদও ততই ইসলামী নীতি থেকে স্খলিত হতে থাকে। এই অতীব তত্ত্বৈশ্বর্যমণ্ডিত সম্প্রদায়ের দর্শন চিন্তার মূলে রয়েছে শয়্খীপন্থী শিয়াহ্ মতবাদ—যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সদ্‌রার

দর্শনের পরমোৎসাহী ছাত্র শয়্খ আহমদ; তিনি মোল্লা সদ্‌রার দর্শনের ব্যাখ্যামূলক কয়েকটি ভাষ্য পুস্তকও লিখেছেন। সাধারণ শিয়াহ্‌দের সাথে এঁদের মৌলিক মতভেদ হলো এই যে সাধারণ শিয়াহ্ সম্প্রদায় তাঁদের দ্বাদশ ধর্মনেতা বা ইমাম-এর আবির্ভাবের জন্যে অত্যন্ত ঔসুক্যের সাথে অপেক্ষমান, কিন্তু এই অনুপস্থিত ইমাম এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো মধ্যস্থকে অপরিহার্য মনে করেন না। কিন্তু বা'বী সম্প্রদায় মনে করেন যে অনুপস্থিত ইমামের সাথে সম্প্রদায়ের যোগাযোগ রাখবার জন্যে একজন মধ্যস্থের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতিতে বিশ্বাস ধর্মবিশ্বাসের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শয়্খ্ আহমদ নিজেকে তেমন একজন মধ্যস্থ বলে ঘোষণা করেছিলেন। হাজী কাযিম্ হলেন এঁদের দ্বিতীয় মধ্যস্থ। তাঁর মৃত্যুর পর শয়্খী সম্প্রদায় যখন অতি ব্যতিব্যস্ততার সাথে নোতুন মধ্যস্থের বহিঃপ্রকাশের অপেক্ষা করছিলেন, তখন মির্যা আলী মুহম্মদ বা'ব নিজেকে সেই প্রত্যাশিত মধ্যস্থ বলে ঘোষণা করলেন এবং শয়্খীদের অনেকে তাঁকে স্বীকার করে নিলেন। তিনি কারবালায় হাজী কাযিমের বক্তৃতায় যোগদান করতেন বলে জানা যায়।

এই নবীন ইরানীয় ঋষি প্রচার করলেন যে, সত্য এমন একটি মৌলিক সত্বা যা বস্তু ও গুণের পার্থক্য সূচিত করে না। তিনি বলেন, আদিম সত্বার প্রথম বদান্যতাময় প্রকাশ বা আত্মবিস্তৃতি হলো অস্তিত্ব। 'অস্তিত্ব' হলো 'জ্ঞাত'; 'জ্ঞাত' হলো 'জ্ঞানের সার'; 'জ্ঞান' হলো 'ইচ্ছা' এবং 'ইচ্ছা' হলো 'প্রেম'। এ ভাবে মোল্লা সদ্‌রার 'জ্ঞাত ও জ্ঞানধারীর একত্ব'-মতবাদ থেকে তিনি সৎ এর ইচ্ছা এবং প্রেমরূপ নিজস্ব ধারণা গড়ে তোলেন। এই সৎ এর নিগূঢ় সত্বারূপ আদিম প্রেমই তাঁর মতে বিশ্ব-জগতের বহিঃপ্রকাশের হেতু এবং পরম-প্রেমের আত্মবিস্তৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর কাছে 'সৃষ্টি'-শব্দের অর্থ 'কিছু না' থেকে সৃষ্টি নয়; কেন না, শয়্খীদের মতে 'স্রষ্টা'-শব্দটী অনন্য সাধারণভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি প্রযোজ্য নয়। ক্বুর্‌আনীয় বাক্য আল্লাহ্‌ই 'সকল স্রষ্টার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম'[৮]-থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আল্লাহ্‌র মতো আরও আত্ম-

বিকাশশীল জীবাত্মা রয়েছেন।

আলী মুহম্মদ বা'ব-এর প্রাণদণ্ডের পর বাহাউল্লাহ্-নামক তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বা'ব-এর শিষ্যেরা তখন সমবেতভাবে 'প্রথম সংঘশক্তি' (The First Unity)-বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। বা'ব নবতর ধর্মদর্শনের উদ্ভাবক অনুপস্থিত ইমামের আত্ম প্রকাশ সম্বন্ধেও ভবিষ্যদবাণী করে গিয়েছিলেন। এখন বাহাউল্লাহ্ নিজেকে সেই অনুপস্থিত ইমামরূপে ঘোষণা করলেন। তিনি গুরুর মতবাদকে মরমীয়া দর্শনের আক্ষরিকতা থেকে মুক্ত করে পূর্ণতর ও বলিষ্ঠতর রূপ দিলেন। পরম-সত্য তাঁর মতে একজন ব্যক্তির মধ্যে নিহত নয়। এ একটি চিরন্তন জীবিত গূঢ় অস্তিত্ব, যার উপর আমরা সত্য ও প্রেম-গুণ আরোপ করে থাকি শুধুমাত্র এই কারণে যে এর চেয়ে মহত্তর গুণ আমাদের ধারণার অতীত। এই জীবন্ত পরম অস্তিত্ব বিশ্বপ্রকৃতিতে নিজেকে প্রকাশমান করেন তার মধ্যে চেতনার অণুকণিকা বা কেন্দ্রাবলী সৃষ্টির জন্যে। ডক্টর ম্যাক্‌ট্যাগার্ট (Dr. Mctaggart) বলতে পারেন: এ হলো হেগেলীয় অনন্য-নির্ভর অস্তিত্বের আর একধাপ নিদিষ্টতা অবলম্বন। এ সব অশ্রেণী নিবদ্ধ সরল চেতনা কেন্দ্রের প্রত্যেকটীতে স্বয়ং পরম আলোকের এক একটী ছটা লুক্কায়িত রয়েছে। আত্মার পরিপূর্ণতা হলো, ব্যক্তিত্বের আশ্রয়রূপ বস্তুর সংস্পর্শে এসে, ক্রমপর্যায়ে নিজের আবেগ ও বুদ্ধিধর্মী সম্ভাবনাসমূহের রূপায়ন এবং এ ভাবে নিজের গভীরতর সত্বা—যা চেতনার সাথে একত্রিত হবার ফলে গা-ঢাকা-দেওয়া চিরন্তন প্রেমের একটী ছটা বিশেষ—তা কে আবিষ্কার করা। মানুষের নিগূঢ় সত্বা তা হলে যুক্তি বা চেতনা নয়। সর্বপ্রকার মহৎ ও নিঃসার্থ কর্ম-প্রেরণার উৎসরূপ এই পরম প্রেমের আলোক-রশ্মিই সত্যিকার ভাবে মানুষের উপাদান। মোল্লা সদ্‌রার 'কল্পনায় অদেহী সত্বা'-সংক্রান্ত মতবাদের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। মোল্লা সদ্‌রার মতে, উর্দ্ধতন পর্যায়ে কল্পনার চেয়ে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত যুক্তি অমরত্বের একটী অপরিহার্য সর্ত নয়। জীবনের সর্বপ্রকার অভিব্যক্তিতে একটী মরণাতীত আধ্যাত্মিক অংশ রয়েছে—তা হলো চিরন্তন প্রেমের একটী আলোকচ্ছটা। এর আত্ম-চেতনা বা যুক্তি-

বুদ্ধির সাথে কোনো অচ্ছেদ্য বন্ধন নেই এবং দেহের মৃত্যুর পরেও এ জীবন্ত থাকে। অতএব মুক্তি—যা বুদ্ধের মতে হলো: আসক্তিকে বিনাশ করে মনের কণিকাসমূহকে উপবাসে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত করা—বাহাউল্লাহ্‌র মতে তা হলো, চেতনা-কণিকাবলীর মধ্যেই গোপন প্রেমের মূলউৎসকে আবিষ্কার করা।[৯] অবশ্য দু'জনেই এ বিষয়ে একমত যে মৃত্যুর পর মানুষের চিন্তা ও চরিত্র কতকগুলি অনুরূপ শক্তির আওতায় আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করতে থাকে এবং যে আবিষ্কৃতি (বাহাউল্লাহ্‌র মতে) বা বিনাশ (বুদ্ধের মতে) তার চরম উদ্দেশ্য, সে পথে এগিয়ে যাবার জন্যে সে একটী দৈহিক সহযোগীর সাথে মিলনের সুযোগ খোঁজে। বাহাউল্লাহ্‌র মতে প্রেমের ধারণা ইচ্ছাশক্তির ধারণার চেয়ে উচ্চতর। শপেন্‌হাওয়ার সত্যকে দেখেছেন ইচ্ছাশক্তির নিজের প্রকৃতিতে চিরন্তনরূপে অবস্থিতিশীল একটী পাপাত্মক প্রবণতার ফলে বাস্তবায়ন-বন্ধনে ধরা পড়া একটী রূপ হিসেবে। প্রেম বা ইচ্ছা—দু'জনেরই মতে—জীবনের প্রতিটী অণুকণিকায় অবস্থিত। কিন্তু সেখানে তার উপস্থিতির কারণ—একজনের মতে হলো: আত্ম-প্রসারণের উল্লাস, আর অন্যের মতে হলো: ব্যাখ্যার অতীত পাপ-প্রবণতা। কিন্তু শপেন্‌হাওয়ার কতকগুলি বৈষয়িক যুক্তি পরম্পরা দাঁড় করিয়ে আদিম ইচ্ছাশক্তির বাস্তবায়নের কারণ দর্শিয়েছেন; অন্যক্ষেত্রে, আমি যতখানি জানতে পেরেছি তাতে মনে হয়, কোন্ নীতি অবলম্বনে চিরন্তন প্রেমের বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মপ্রকাশ সম্ভবায়িত হলো, বাহাউল্লাহ্‌ তার ব্যাখ্যা দিয়ে যান নি।

পাদটীকাবলী

(১) আস্‌রুল হিকম, ৬ পৃষ্ঠা। (২) ঐ, ৮ পৃষ্ঠা। (৩) ঐ, ৮ পৃষ্ঠা। (৪) ঐ, ১০ পৃষ্ঠা। (৫) ঐ, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা। (৬) ঐ, ১৫১ পৃষ্ঠা। (৭) ঐ, ৬ পৃষ্ঠা।

(৮) সূরা ২৩ঃ বাক্য ১৪।

(৯) Phelp's Abbas Effendi, Chapter: Philosophy and Psychology দ্রষ্টব্য।

———

উপসংহার

এখন আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটী সারাংশ দাঁড় করতে পারি। আমরা দেখেছি যে ইরানীয় মননকে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের দ্বিত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে—একটি প্রাক্ ইসলামী ম্যাজীয় দ্বিত্ববাদ, অপটি ইসলাম-পরবর্তী গ্রীক্ দ্বিত্ববাদ, যদিও বস্তুর বৈচিত্র্যময় প্রকাশরূপ মৌলিক সমস্যা আসলে একই রয়েছে। প্রাক্ ইসলামী ইরানীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ভাবে বিষয়-নিবদ্ধ; অতএব তাঁদের চিন্তানেতারা একথা পরিষ্কাররূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে আদিম নীতিরূপকে গতিপ্রবণ বলে স্বীকার করতে হবে। যোরো'-ষ্টারের কাছে দুইটী প্রাথমিক চৈতন্যই 'কর্মশীল'; মানীর মতে আলোকের নীতি নিষ্ক্রিয়, কিন্তু অন্ধকারের নীতি আক্রমণাত্মক। কিন্তু তাঁদের বিশ্ব-জগত সৃষ্টির উপাদানাবলীর বিশ্লেষণ হাস্যাস্পদভাবে অকিঞ্চিৎকর। স্থিতি-শীলতার দিক্ থেকে বিশ্বজগত সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অতিমাত্রায় ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং তাঁদের ব্যাখ্যাত পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত দুইটি দুর্বলতা রয়ে গেছে ঃ—

(১) উলঙ্গ দ্বিত্ববাদ

(২) বিশ্লেষণের অভাব।

প্রথমটী ইসলামের আলাকে শোধরানো হয়। দ্বিতীয়টী শোধরায় গ্রীক দর্শন প্রয়োগে। অবশ্য ইসলামের অভ্যুদয় ও গ্রীক্ দর্শনচর্চা অদ্বৈতবাদের প্রতি দেশজ প্রবণতাকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু অপর পক্ষে এই দুই শক্তি প্রাথমিক চিন্তানেতাদের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ বিষয়ানুগ দৃষ্টিভঙ্গি পরি-বর্তন করে ইরানীয় চিন্তাক্ষেত্রে ঝিমন্ত প্রত্যক্-দৃষ্টিকে সজাগ করে তোলে—যা পরিণতিতে কতিপয় সুফী সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চূড়ান্ত সর্বেশ্বরবাদকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে পৌঁছায়। আল্ ফারাবী বস্তুকে চৈতন্যের একটী অপেক্ষাকৃত বিশৃঙ্খল অভিব্যক্তি রূপে দাঁড় করিয়ে আল্লাহ্ ও বস্তুর মধ্যেকার এই দ্বিত্ববাদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করেন। আশ্ আরীয়রা

একে একেবারেই অস্বীকার করে পরিপূর্ণ আদর্শবাদকে আঁকড়ে ধরেন। আরম্ভ-পন্থীরা তাঁদের Prima Materia-তত্ত্বকে চালিয়ে যাবার প্রয়াস পান। সুফীরা মনে করেন যে বস্তুময় বিশ্বজগত একটী ভ্রম বা মায়া মাত্র; অথবা আল্লাহ্‌র আত্মোপলব্ধির জন্যে একটী প্রয়োজনীয় 'অন্য সত্বা' মাত্র। এ কথা অবশ্য বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে আশ্‌আরীয় আদর্শবাদের আলোকে ইরানীয় মনন আল্লাহ্‌-ও-বস্তু সংক্রান্ত বিদেশী দ্বিত্ববাদ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং নবতর দার্শনিক চিন্তার সমর্থন লাভ করে আলোক ও অন্ধকার সংক্রান্ত পুরাতন দ্বিত্ববাদে ফিরে যায়। শয়খুল ইশরাক প্রাক্‌ইস্‌লামীয় ইরানীয় দার্শনিকদের বিষয় নিবিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাবুকদের প্রত্যক্‌ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সমন্বয়ের পথে নিয়ে আসেন এবং যোরো'ষ্ট্রীয় দ্বিত্ববাদকে অনেকখানি উৎকৃষ্টতর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আকারে প্রকাশ করেন। তাঁর পদ্ধতি বিষয়-গত ও বিষয়ী-গত—উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এ সব অদ্বৈতবাদ মূলক চিন্তাধারাই ওয়াহিদ মাহমুদের বহুত্ববাদের দ্বারা প্রতিহত হয়। তিনি বলেন যে সত্য এক নয়—বহু প্রাথমিক জীবন কণিকার সমাহার। এ সব জীবন কণিকা নানাবিধ উপায়ে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে এক আকার থেকে উন্নততর অন্য আকার গ্রহণের পথে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু ওয়াহিদ মাহমুদের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অত্যন্ত স্বল্পজীবী। পরবর্তী সুফী সম্প্রদায় এবং খাঁটী দর্শন পন্থীরাও ধীরে ধীরে নিও-প্লেটনীয় নির্গমনবাদকে রূপান্তরিত করে বা নাকচ করে এগুতে থাকেন। পরবর্তী চিন্তানেতাদের—বিশেষ করে, মোল্লা হাদীর—দর্শনসূত্রে আমরা দেখতে পাই, নিও-প্লেটনিস্‌ম ক্রমশঃ খাঁটি প্লেটনিস্‌ম্‌ বা আফলাতুনের নিজের ব্যাখ্যাত পথে ফিরে আসছে। কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্তা প্রগতি ও স্বাপ্নিক মরমীয়াবাদ বা'বীয় দর্শনের সমক্ষে এসে প্রবল ধাক্কা খেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়। এই নব দর্শন সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন উপেক্ষা করে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানে পরমোৎসাহে লেগে যায়। এ ভাবে বস্তুর কঠোর সত্যতার প্রতি মানব চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে

এ সম্প্রদায়ের ভাবুকেরা কৃতকার্যতা লাভ করেন। এঁরা চরিত্রে অত্যন্ত বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রবণ, তথা উদগ্র দেশপ্রীতি বিমুখ হওয়া সত্ত্বেও ইরানীয় মনের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেন। বা'বীয়দের এই মরমীয়াবাদ-বিমুখ প্রকৃতি ও বাস্তবধর্মী প্রচারণাই সম্ভবতঃ আধুনিক ইরানের রাজ-নৈতিক সংস্কার প্রগতির একটী গৌণ কারণ।

পরিভাষা সংকেত (Glossary)

A

Absolute—পরম, অবিমিশ্র, অনাপেক্ষিক, অনন্য নির্ভর, স্বয়ং-সম্পূর্ণ

Absolute (The)—স্বয়ম্ভু

Absorption—আত্মস্থকরণ

Abstract—বস্তু-নিরপেক্ষ, অমূর্ত

Accident—অনুসঙ্গ

Accidental—নৈমিত্তিক

Aggressive—আক্রমণাত্মক

Agnostic—অজ্ঞেয়তাবাদী

Anthropomorphic—আল্লাহ্‌তে মানবীয় প্রকৃতি আরোপকারী

Aristotalian—আরস্তপন্থী

Aristotle—আরস্ত

Atom—পরমাণু, অণুকণিকা

Atomic objectification—অণুকণিকার বাস্তবায়ন

Atomism—পরমানুবাদ

Attribute—গুণ, বিশেষণ

Averroes—আবু রুশ্‌দ্‌

Avicenna—ইব্‌নে সীনা

Axiom—স্বতঃসিদ্ধ

B

Barbar—বর্বর

C

Category—শ্রেণী পর্যায়

Causation (Law of) - কার্যকারণবাদ

Combination—সংগঠন

Conception—প্রতীতি, ধারণা

Concrete—বস্তুবাচক, মূর্ত, বাস্তব

Contingence—উদ্ভব

Contnigent—অনিয়ত, সাময়িক

Cosmic cosciousness—বিশ্বচেতনা

Cosmology—সৃষ্টিতত্ব

D

Determinateness—সীমাসীনতা

Dialectic—যুক্তিসহ

Discursive—যুক্তিমূলক

Dis-integration—বিখণ্ডন

Divine Revelation—ওয়াহি, ঈশ্বরানুদেশ

Dualism—দ্বিত্ববাদ

Dynamic—গতিপ্রবণ

E

Emanation...নির্গমন

Emotion . আবেগ, হৃদয়াবেগ

Empirical . পর্যবেক্ষণমূলক, পরীক্ষামূলক

Entity...অস্তিত্ব

Essence...প্রকৃতি, নির্যাস, নিগূঢ়সত্বা

Eternal Reality...সনাতন সত্য, চিরন্তন সত্য
Ethics...নীতিশাস্ত্র
Ever-incarnating...অনন্তকাল ধরে নব নব জন্মে বিকাশমান
Evolution...উদ্ভব, উদ্বর্তন, ক্রমবিকাশ

F

Father (ঈশ্বরার্থে)...পরম পিতা
Feeling ..অনুভূতি
First Intellect...প্রথম চিৎ-শক্তি
Formula...সূত্র, ব্যবস্থাপত্র
Function...প্রতিফলিত রূপ

G

Gnostic...জ্ঞানবাদী, খৃষ্টীয় জ্ঞানপন্থী যাজক
Gnosticism...জ্ঞানবাদ
God ঈশ্বর, আল্লাহ্

H

Heresy...পাষণ্ডমত
Heretic...প্রচলিত ধর্মাচরণ-বিরোধী
Heterogeneity...বিজাতীয়ত্ব, বিসাদৃশ্য
Homogeneity...স্বজাতীয়ত্ব, সম-জতীয়ত্ব
Humanism...মানবতাবাদ

I

Idea...ধারণা
Idealism...আদর্শবাদ

Illumination...প্রভা, ঔজ্জ্বল্য, আলোকায়ন

Imagination...কল্পনা

Immanent...পরিব্যাপ্ত

Immaterial...নিরবয়ব, অজড়

Immediate...স্বতঃসাব্যস্থ

Impersonal...অব্যক্তিক

Inductive...আগমশাস্ত্রীয়

Infinite Time...অনন্তকাল

Intellection...বুদ্ধিক্রিয়া

Intuitive...স্বভাবজাত, স্বতঃ অনুভূত

M

Material...জড়রূপ

Metaphysics . প্রজ্ঞানশাস্ত্র

Metampsychosis...জীবাত্মার দেহান্তর গ্রহণ, পুনর্জন্ম

Monadism...এককত্ববাদ

Monism...অদ্বৈতবাদ

Monotheism . একেশ্বরবাদ, তৌহিদ

Multiplicity...বহুত্ব

Mysticism...মরমীয়াবাদ

N

Negation . বিলুপ্তি

Negative ..নাস্তিবাচক

Neo-Platonic ..নিও-প্লেটনীয়

Neo-platonism...নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌

Non-entity...অনস্তিত্ব

Not-Light . অনালোক

Stoicism...প্রবল নীতিনিষ্ঠা ও সংসারের প্রতি নিস্পৃহতা
Subject...উদ্দেশ্য
Subjective . বিষয়ীগত, প্রত্যক্
Subjectivity...স্বানুভব দৃষ্টিভঙ্গি
Sub-stratum ..উপ-স্তর
Super-intellectual ..অতি-প্রাজ্ঞিক

T

Temporal...বৈষয়িক
Theistic . আস্তিক্যবাদী
Thought.. মনন্
Transcendent.. ইন্দ্রিয়াতীত
Tutelary Spirit...আধ্যাত্মিক অভিভাবক, অধিদেবতা

U

Ultimate Principle ..আদিকারণ, চরম নীতিরূপ
Ultimat (The)...পরমতম
Universality.. বিশ্বজনীনতা
Universal Reason...বিশ্বকারণ
Universe..বিশ্বজগত, বিশ্বপ্রকৃতি, মহাবিশ্ব
Unity.. এককত্ব

V

Vacuum...শূন্য

পরিশিষ্ট

নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌

জোসেফ্‌ বি বার্জেস্‌

প্রতিকবাদ আশ্রিত (Pagan) ধর্মীয় মনোভঙ্গীর চরমতম দার্শনিক প্রকাশ ঘটে নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌ অবলম্বন করে। এই দর্শন পদ্ধতির সহায়তায় গ্রীক দর্শনের প্রবক্তারা খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব প্রসারের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দিকে এবং পর পর শতাব্দী ব্যাপী ঈশ্বর এবং বিশ্বজগত সৃষ্টি সংক্রান্ত চিরকালীন অমীমাংসিত দার্শনিক প্রশ্নাবলী আবার নোতুন করে দেখা দেয় ; অতএব এ নিয়ে তৎকালীন দার্শনিকদেরকেও আবার নোতুনভাবে বাদানুবাদে লিপ্ত হতে হয়। 'ঈশ্বরের অনুদেশমাত্রে বিশ্ব-জগত সৃষ্টি'—এই খৃষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বের মুকাবিলায় যে সব সর্বেশ্বরবাদমূলক মতবাদের সৃষ্টি হয়, নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌ অবশ্যই সে সবের মধ্যে বিশিষ্ট ও অত্যধিক প্রভাবশালী। এ মতবাদের উদ্ভাবক প্লটিনাস্‌ ছিলেন একাধারে প্লেটোর দর্শন পদ্ধতি ও প্রাচ্য জগতের মরমী মতবাদাবলীতে পারদর্শী। তিনি ছিলেন মিশরের লাইকোপোলিস্‌ শহরের অধিবাসী। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে অ্যালেকযান্দ্রিয়ায় তিনি পড়াশুনা করেন। এ সময়ে এ নগরী ছিল প্রাচ্য ও গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মিলনস্থল। এখানেই তাঁদের পারস্পরিক পরিচিতি ও বোঝাপড়ার দরুন স্বভাবতঃই দুই দর্শন পদ্ধতির মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়। প্লটিনাস্‌-এর কার্যক্রমে প্লেটোর দর্শন এবং প্রাচ্য মরমীয়াবাদের মধ্যে এমনই একটি মিলন-সেতু রচনার প্রয়াস বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট।

প্লটিনাস্‌ বিদ্যার্জন করেন অ্যালেকযান্দ্রিয়ায়, বিদ্যা দান করেন রোম-এ। ২৪৪ খৃষ্টাব্দের দিকে শেষোক্ত নগরীতে পদার্পণের সাথে সাথেই এখানকার

অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অনেক ভক্ত জুটে যায়। এমন কি, অন্যান্যের সাথে সাথে সম্রাট গ্যালিয়েনুস্ ও সম্রাজ্ঞী স্যালোনিনা পর্যন্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর প্রভাব এত বেশী বিস্তার লাভ করে যে, গুরু প্লেটোর 'আদর্শ রাষ্ট্র' (Ideal State) বাস্তবায়িত করতে যেয়ে তিনি রোম এর নিকটে প্লেটোনোপলিস্ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠার কাজে প্রায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। তৎকালীন রোমক বিশ্বের যাঁরা খৃষ্টধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এ ধর্মের বিনাশ আকাঙ্ক্ষা করতেন, প্লটিনাস্ তাঁদের মধ্যমণি হয়ে পড়লেন। অবশ্য তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হবার আগে নিও-প্লেটনিস্ম্ মতবাদ লিখিত আকার লাভ করে নি। তারপর ৫৪টি পুস্তিকার মারফত এ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং পরে Porphyry of Tyre-কর্তৃক প্রত্যেক নয় নয়টি পুস্তিকা এক এক ভল্যুম-এ গ্রথিত হয়ে ছয়টি পুস্তকে সংকলিত হয়।

প্লটিনাস্-এর ধর্মীয় দর্শন পরিপূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়াতীত ভিত্তি নির্ভর। ঈশ্বর হলেন এমন এক বস্তুরূপ (Substance) যা সব জিনিসের পূর্ব থেকে অবস্থিতিশীল এবং যা অনন্যনির্ভর। তিনি বাক্যে বর্ণনার অতীত; কেন না, যে কোনো বর্ণনাই তাঁতে সীমা আরোপ করবে। রূপ, পূর্ণতা, বুদ্ধিবৃত্তি, সততা ইত্যাদি যে কোনো তুলনাসূচক গুণই মানুষের সীমায়িত ধারণা-প্রসূত। ঈশ্বরের নিগূঢ় অস্তিত্ব ব্যাখ্যায় এ সব কথা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। যে কোনো বিশেষণই তাঁর উপর সীমা আরোপ না করে পারে না; তাঁকে একটি সর্বতোভাবে অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে বুঝে নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

বিশ্বজগতকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি বলে মনে করা চলবে না। এর উদ্ভব তাঁর অনুদেশের ফলে নয়। এ হলো তাঁর পবিত্র সত্তার এক প্রকার রহস্যাবৃত ও জ্ঞানাতীত আত্মপ্লাবনের ফল বা তাঁর নিজেরই নির্গমন স্বরূপ। এ হলো ঈশ্বরের নিজেকে প্রকাশ করবার নৈসর্গিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এ তাঁর নিগূঢ় সত্তার বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকলেও, এ প্রক্রিয়াদ্বারা তাঁর থেকে তাঁর সৃষ্টি ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে; এমন কি, কোনো কোনো মৌলিক সত্তা নিজ

পূর্ণতা বা বাস্তবতা হারিয়ে ফেলছে। প্রথম নির্গমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্গমনে পর্যবসিত হচ্ছে এবং এ ভাবে আদি সত্তা হারাতে হারাতে ক্রমশঃ একেবারেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এই শেষতম পরিণতি বা অনস্তিত্ব পৌনঃপুনিক নির্গমন সূত্রে ঈশ্বরেরই সাথে সম্পর্কিত। এদের সমগ্রত্বে ঈশ্বরের বিরাজ ; কিন্তু এদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন পরিমাপে ঈশ্বরের নিকট ও দূর। এই নির্গমন প্রক্রিয়াকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যায়। যথা :—

(অ) বিশুদ্ধ চিন্তা বা বুদ্ধির পর্যায়,
(আ) আত্মা, এবং
(ই) বস্তু।

ঈশ্বরত্বের প্রথম উপ্‌চানোর ফল হলো ধারণাবলী (Ideas))। এ ক্ষেত্রে ধারণার তাৎপর্য প্লেটোর (Ideas)-এর অনুরূপ। কিন্তু ঈশ্বর এখানে হলেন ধারণার অগ্রেই অস্তিত্বশীল এবং ধারণার হেতু (cause) স্বরূপ। প্লটিনাস্‌ এ ক্ষেত্রে প্লেটোকে ছাড়িয়ে যেয়ে বলেছেন যে, ধারণারও প্রকার ভেদ আছে, যেমন : বিশেষ ধারণা এবং সাধারন বা শ্রেণীভুক্ত ধারণা। বিশ্বজগতে যতগুলি আলাদা আলাদা অস্তিত্ব (entity) রয়েছে, ঈশ্বরের বুদ্ধিবৃত্তি ততগুলিই ধারণার সমাহার। কেন এবং কি করে এ প্রথম পর্যায়ের অভ্যুদয় ঘটলো, এ গভীর রহস্য প্লটিনাস্‌ খোলাসা করবার চেষ্টা করেন নি। কথাচ্ছলে বলা চলে যে, প্রথম নির্গমন ঈশ্বরের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ থেকে আলাদা হবার প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু তবুও তা তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তা থেকে বিচ্যুত নয়। এর মধ্যেও প্রেরণা, তথা উপ্‌চে পড়বার প্রবণতা রয়েছে এবং এই গতিধর্মিতার ফলই দ্বিতীয় পর্যায়রূপ আত্মা (soul)।

ধারণাবলী (Ideas) র নিজেদেরকে বাস্তবায়নের প্রবণতার ফলই হলো ঈশ্বরের দ্বিতীয় নির্গমন পর্যায়-রূপ আত্মা। বুদ্ধিবৃত্তি (intelligence)

যেমন ঈশ্বর সদৃশ, অথচ ঈশ্বরের তুলনায় অপকৃষ্ট, তেমনই আত্মাও বুদ্ধিবৃত্তির সদৃশ, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে অপকৃষ্ট। আত্মা যখন তার জন্মদাতা ধারণাবলীর দিকে তাকায় এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করে, তখন তার মধ্যে সৃষ্টিস্পৃহা জাগ্রত হয়। নিম্নতর পর্যায় অধিকরী বস্তুজগত এই সৃষ্টিস্পৃহার ফল। আত্মা হলো তার নীচেকার বস্তু-জগত এবং উপরেকার ধারণা-জগতের মাঝামাঝিতে অবস্থিত। প্লাটিনাস্-এর কথায় আত্মা যখন ধারণাবলীর কল্পনায় আত্মনিয়োগ করে, তখন তা হলো 'বিশ্বআত্মা' (world soul) ; আর যখন সে বস্তু জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাতে আকার দেবার প্রয়াস পায়, তখন তার নাম প্রকৃতি (Nature)। মানব-আত্মা হলো বিশ্ব আত্মার অংশ ; সে জন্যে ধারণাময় জগতের প্রতি তার যে আকুল আবেগ, তা তার প্রকৃতিরই পরিচায়ক। এ প্রবণতার আসল রূপ বুদ্ধিবৃত্তিক। এর উদ্দেশ্য হলো : এক এক পা করে পিছিয়ে পড়ে শেষতক্ নিজের মূল উৎসে প্রত্যাবর্তন। এর মধ্যে বস্তুর উন্নয়নেরও একটি ইচ্ছা বিকাশ লাভ করে। সে করণে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই সে কোনো দেহে নিজেকে বন্দী করে নেয়। এখানে সে আবার দুইটি বিপরীত শক্তির আওতায় এসে পড়ে। একটি হলো শারীরিক ক্রিয়াদির প্রয়োজনবোধ, আর অন্যটি নির্মল চিন্তার স্বাধীনতা-স্পৃহা।

আত্মার সৃজনী ক্ষমতা কার্যকরী করতে হলে মাধ্যম-স্বরূপ বস্তুর প্রয়োজন অপরিহার্য। তা অবশ্য এমন বস্তু হবে যা এখনও অবয়ব বা বাস্তবতা অর্জন করেনি। কিন্তু যেহেতু এ ধরণের 'বস্তু' অলভ্য, অতএব আত্মাকে তৃতীয় পর্যায়ের নির্গমন স্বরূপ বস্তু (Matter) সৃষ্টি করে নিতে হয়। এ ভাবে সৃষ্ট বস্তু বর্ণনা বা ব্যাখ্যায়নের অতীত। কেন না, তার কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণ নেই। এ হলো সম্পূর্ণরূপে অবয়বহীন—একাধারে অনস্তিত্ব, শূন্যতা ও অ-কর্মক্ষমতার সমহার। কথায় একে প্রকাশ

করতে গেলে এর উপর গুণ এবং বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে হয়—যা এর নেই। অতএব এই অবয়ব-ও-পরিসরহীন নিও-প্লেটনীয় বস্তুকে আমরা এক প্রকার অবাস্তব দেহ-কল্প (immaterial corporeality) বলে মনে করতে বাধ্য। ডিমোক্রিটাস বর্ণিত শক্ত, সুনির্দিষ্ট বস্তু থেকে এর পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। বরঞ্চ প্লেটো যখন Timeus রচনা করেন, তখন তাঁর মনে বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, এ অনেকখানি সে ধরণের।

বাস্তব দেহের অন্তর্নিহিত নীতিরূপ হয়েও এ এক প্রকার অবাস্তব উপস্তর, নিজে অ-দেহী থেকেও সর্ববস্তুতে অবয়বদানকারী। এই তৃতীয় নির্গমন রূপ উপস্তরের উপরই আত্মা নিজ ধারণাবলী (Ideas) মুদ্রিত করে, যার ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সৃষ্টি হয়। এই নিও-প্লেটনীয় 'বস্তু'র দৌলতেই জগত জীবনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার আবির্ভাব, এবং সাথে সাথে বিভিন্নরূপ সীমায়ন। দেহাবলী বা যে কোনো পদার্থ একাধারে আকার ও বস্তুর অধিকারী, একই সাথে বাস্তব ও অবাস্তব। পদার্থাবলীর অবয়ব বা পরিসর এই আদর্শবস্তু থেকেই লভ্য হয়; কিন্তু তাদের নিগূঢ় বা সত্য অস্তিত্ব ধারণা-রূপ (Ideas)। দৃশ্যমান জগতের সর্বপ্রকার সৌন্দর্য, সততা, নিয়মানুগতা ও উৎকর্ষ আসে বিশ্ব-আত্মা থেকে এবং সর্ব প্রকার অসৎ, কদর্যতা, হীনতা ইত্যাদি আসে বস্তুর অকর্মন্যতা ও অবাস্তবতা থেকে।

পদার্থ বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে সত্যের সন্ধান করে থাকে। এ পন্থা ভুল। দৃশ্যমান জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে, বুদ্ধিবৃত্তির জগতকে অন্তরঙ্গ ভাবে বুঝবার চেষ্টা করে, তার সাথে একাত্ম হয়ে তবেই বিশ্ব-প্রকৃতির অকৃত্রিম সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। বিশ্বরহস্যের প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যের ধরা ছোঁয়ার অতীত।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের স্থান কোথায়? মানুষ হলো আত্মা ও দেহের মিলন-মোহনারূপ। মানুষের জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে আত্মা নিজ আবাস-ভূমি ছেড়ে এসে তার দেহে স্থান গ্রহণ করে। এর পর তার দু'টি মাত্র

পথ রয়েছে। হয়ত আত্মা দেহের পরিচালনাভার গ্রহণ করে, না হয় দেহ-বস্তু আত্মাকে অধিকার করে বসে। প্রথম ক্ষেত্রে আত্মা নিজের পূর্বেকার আবাস ভূমির দিকে দেহকে আকর্ষণ করে উন্নততর জীবন যাপনে অভ্যস্ত করতে চেষ্টিত থাকে; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, দেহ আত্মাকে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার পথে চালিত করে নেয়। প্রথম ক্ষেত্রে, আত্মা নিজ আবাস থেকে যে যে পর্যায়ক্রমে অবরোহণ করেছিল, সে সে পর্যায়ে পশ্চাদ্ধাবন করে বিশ্ব-আত্মার সাথে এবং শেষ পর্যন্ত পবিত্র চিৎবৃত্তি (divine intelligence) ও ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবার প্রয়াস পায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আত্মা বস্তু-বন্ধনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থায় সে বারবার দেহ থেকে দেহান্তরে আশ্রয় নিয়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে নিজেকে ক্রমশঃ মুক্ত করে তোলে। জীবনের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের পরম সৌন্দর্য ও পরম-সৎ-এর মধ্যে নিমজ্জন। এ জীবনের প্রবণতা পুরোপুরিভাবে ভিন্ন জগতমুখী। এর মুক্তি আসবে পার্থিব জগত এবং এখানকার ক্রিয়া-কলাপ ও আশা আকঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে—ত্যাগ করে। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, এই নিও-প্লেটনীয় মরমীয়াবাদের জন্ম হয়েছে প্লটিনাস-এর উপর প্রাচ্য-দর্শনের প্রভাবের ফলে; অতএব প্রকৃত বিচারে একে একটি নিছক পাশ্চাত্য দর্শন পদ্ধতি বলে মনে করা চলে না।

মানবদেহে অবস্থানকালে, বস্তুর অ-সৎ উপাদানাবলীর সাথে পরিচিতির ফলে তাকে পরিত্যাগ করবার আকঙ্ক্ষা থেকে আত্মা নিজ উৎকর্ষ সাধন করে। তা ছাড়া, বস্তুকে আকার ও অবয়ব দানের ক্ষমতা থেকেও তার গভীর সম্ভাব লাভ হয়। যা হোক, এ পর্যায়ে সর্বসময়েই আত্মা নিজ প্রকৃতিগুণে যে আলাদা অবস্থান করে, তার প্রমাণ হলো দেহ ও আত্মার প্রবৃত্তির মধ্যে সদা বর্তমান বিরোধ ভাব। আত্মা এ ভাবে অনবরতঃ বস্তুর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নিজেকে কলুষ-মুক্ত করতে থাকে। এইই হলো জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিণতি।

আত্মার নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য হলো তার বুদ্ধিবৃত্তি। জ্ঞানস্পৃহা জীবনের যোগ্য অবলম্বন; কিন্তু তাকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলা চলে না। ঈশ্বরের সাথে পরমানন্দময় মিলন (ecstatic union)-এর সংক্ষিপ্ততম এবং দ্রুততম পন্থা হলো দর্শন (philosophy)। জ্ঞানী-ব্যক্তি দৈহিক আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করে চিৎ-বৃত্তির উন্নয়নে যত্নবান হবেন; কেন না, তা করে আত্মা নিজেকে বস্তু-বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমাত্মার চিন্তায় নিমজ্জিত হতে পারে। এ পথে চরমোৎকর্ষের ফলে আত্মা তার পার্থিব হাতিয়ার যুক্তিকে ক্রমশঃ বাদ দিয়ে চলতে পারে এবং অনুভূতির পথে এগিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের পরম রূপ-ও-সত্যলোকে অবগাহন করতে পারে। মরলোকবাসীর জন্যে এ পবিত্র পরম-অভিজ্ঞতা অত্যন্ত দুর্লভ। এ অভিজ্ঞতা যিনি সঞ্চয় করেছেন, সার্থক তাঁর জীবন। প্লটিনাস্ নিজেও তাঁর জীবনকালে মাত্র কয়েকবারই এই বিমল আনন্দ লাভ করবার কথা বলেছেন।

প্লটিনাস এর দৃঢ় বিশ্বাস যে, পার্থিব অদর্শ কিছুতেই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হতে পারে না। কিন্তু তবুও এ কথা ভাবলে চলবে না যে, পার্থিব জীবন ও জগতকে তিনি পুরোপুরিভাবে অসৎ বা অমর্যাদাকর মনে করতেন। সামগ্রিক দৃষ্টিতে শেষতক্ জাগতিক পদার্থাদির পরিমাণ ঐশ্বরিক নির্গমনের পরিমাণের সমান সমানই দাঁড়ায়। অতএব সামগ্রিকভাবে তার উপর ঐশ্বরিক প্রকৃতিরই ছাপ পড়েছে। কিন্তু ঈশ্বর থেকে নির্গমিত হয়ে অবশেষে অপকৃষ্ট নাস্তি রূপ বস্তুতে পৌঁছাতে সৎ, সৌন্দর্য ও ক্ষমতাবলীকে অবরোহণের বহু বহু ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে। যতক্ষণ এরা বাস্তব, ততক্ষণ এরা অত্যুৎকৃষ্ট। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র ঈশ্বরের পরম সৌন্দর্যের ছটা বস্তুর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিমাণে বিকাশ লাভ করে চলেছে। এই রূপ, এই সত্যকেই শিল্পীরা খুঁজে বেড়ায়। প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের এই পরম রূপই কান্তি বিজ্ঞান (aesthetics) এর ভিত্তিভূমি। দার্শনিক ও শিল্পী প্রধানতঃ এই একই পথে জীবন মন উৎসর্গ করে ঐশীরূপের আভাস পেয়ে থাকেন।

বলা হয়েছে যে, নিও-প্লেটনিস্‌ম্‌-ই প্যাগান চিন্তাসূত্র অবলম্বনে ধর্মীয় সান্ত্বনা লাভের শেষ প্রচেষ্টা। ঐতিহাসিক দলীলাত-এর চেয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরই এ দর্শন পদ্ধতি অধিকতর নির্ভরশীল। খৃষ্টধর্মের কাছে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়েও সমসাময়িক চিন্তাধারার উপর এর প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। মধ্যযুগে মরমীয়াবাদের পুনরুদ্ভবই তার প্রমাণ। এমন কি, খোদ্‌ খৃষ্টীয় দর্শনের উপরও এর প্রভাব উল্লেখযোগ্যরূপে দেখা দেয়। প্লটিনাস্‌ ও তাঁর শিষ্য পার্‌ফাইরীর পর এ চিন্তাধারা বেশ কিছুটা পরিবর্তিত রূপ নেয়। বিশেষ করে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে কত পর্যায় ব্যবধান এবং তা কি কি প্রকার—এ সব নিয়ে বহুতর তর্কের সৃষ্টি হয়। এ সব ব্যাপারে সীরিয়াবাসী জ্যাম্ব্‌লিকাস (৩৩০ খৃষ্টাব্দ) বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তারপর কিছুকাল নিস্তেজ থেকে এ মতবাদ আবার জ্যাম্ব্‌লিকাস শিষ্যদের দ্বারা প্রসার লাভ করতে থাকলে সম্রাট জুষ্টিনিয়ান ৫২৯ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য পৌত্তলিকতাবাদী প্রতিষ্ঠানাদির সাথে এ-রও সমাধি রচনা করে দেন।

——

শব্দ সূচী

অ

অজ্ঞেয়বাদ···৬৯
অদ্বৈতবাদ··· ১৯, ৭৭, ৯০, ১৩০, ১৪২
অনুপস্থিত ঈমাম···১৩৮
অবতারবাদ···৪৩
অবাস্তব দেহকল্প···১৫৫
অ্যান্টিওকাস ··· ৭৯
অস্তিত্ব চক্র···১০০

আ

আকবর (সম্রাট) ···১২৯
আগম শাস্ত্র ·· ৭১
আর্ডম্যান ··৭, ৯১,
আত্মার পুনর্জন্ম···৩২, ১০৯
আদর্শ দেহ···১৩৬.
আদাদুদ্দৌলা ··২১
'আন্‌কা'···১১২
আনুশির্‌ওয়ান···৯, ১১
'আফ্‌রাদ' ··৯০
আফলাতুন (প্লেটো, প্লাতো) · গ, ৫, ১৪ ২০, ৯৩, ১`০, ১৩০ ও পর পর পৃষ্ঠা, ১৫২, ১৫৩
আবদুল জব্বার (কাষী)···৯১
আবদুল্লাহ্‌, আল্‌মায়মূন···৪৩
আব্বাস (শাহ)···৯৩
আবু রুশ্‌দ্‌ ···২০
আবুল আব্বাস···৩৩
আবুল কাসিম···৯১
আবুল কাসিম বল্‌খী ৪০, ৪১
আবুল বরকাত ···৯১
আবুল মাআলী···৯১
আবুল হাশিম···৩৭
আবুল হুযায়েল···৩৭, ৩৮
'আমা'···১২০
'আমর'···৪৬
আমীন (আর্‌ রশীদ)···৭৬
আর্যভট্ট···৬৩
আর্‌রাযী (ঈমাম ফখরুদ্দীন)···২১, ৫০, ৫৪, ৬৬, ৭২, ৯১, ৯২,
আরস্তু (অ্যারিষ্টটল)···খ, গ, ১৮, ২০, ৪২, ৬৪, ৭০, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ১০৬, ১০৯, ১৩০ ও পর পর পৃষ্ঠা
আর্নল্ড (ম্যাথিউ)···১২৩
আর্য ব্রাহ্মণ হিন্দু দর্শন···ক, খ
আল্‌ আত্তার (শয়্‌খ্‌ ফরীদুদ্দীন, বসরী) ···৩৯
আল্‌ আমিদা ···৯১

157/(2)

আল্ আশ্আরী (হাসান) ও আশ্-আরীয়াবাদ…৩৮, ৪১ ও পর পর পৃষ্ঠা, ৪৮ ও পর পর পৃষ্ঠা, ৯১, ৯২, ৯৮ ১৪১, ১৪২
আল্ইশরাকী (শয়খ শাহাবুদ্দীন সুহ্-রাওয়ার্দী, শয়খুল ইশ্রাক মক্তুল) …৫৪, ৫৮, ১০১, ১৪২,
আল্ কাতিবী (নাযিমুদ্দীন) …৬৪, ৭১ ও পর পর পৃষ্ঠা
আল্ কিন্দী…২১
আল্ বুশায়রী…৭৭, ৮৫
আল্ গাযালী…৫৪ ও পর পর পৃষ্ঠা, ৯১, ৯২
আল্ জাহিয্…৩৮, ৪১, ৪৯
আল্ জি'লী…১১১ ও পর পর পৃষ্ঠা, ১২৪, ১২৮
আল্ জুবায়রী …৪৮
আল্ ফারাবী…প্রঃ কঃ, ২০, ২১ ৩৮, ৯২, ১৪১
আল্ বিরূনী…৫৯, ৬৩
আল্মলেক আয্যাহের…৯২
আহ্‌মদ…৩৮
আহ্‌য়া ময্দা…৩

ই

ইখ্ওয়ানুস সফা—৪২
ইন্সানে কমিল…১১৩, ১১৪
ইপ্তোরিয়ান সাইরাস…১৬
ইবনুল আরবী (শয়্খ্ মহীউদ্দীন)… প্রঃ কঃ, খ, ১১১, ১২৫
ইব্নে আস্রাস…৪১
ইব্নে উসমান (শয়্খ্ মুহম্মদ) …৩৮
ইব্নে জওযী…৫৬
ইব্নে তাহির…৩৩
ইব্নে মস্কাওয়াইহ্ (আবুল আলা মুহম্মদ ইব্নে মুহম্মদ ইব্নে ইয়াকুব) …প্রঃ কঃ, ২০, ২১, ২৪ ও পর পর পৃষ্ঠা, ৩৪
ইব্নে সীনা … প্রঃ কঃ, ২০, ২৯ ও পর পর পৃষ্ঠা ৮৫, ৯২, ১০৩, ১২৯, ১৩৪
ইব্নে হাইসাম … ৫৯, ৬৩
ইব্নে হাযম … ৪, ৩৯, ৬১
ইমাম, ইমামত … ৪৩, ৪৪, ৪৬
ইস্পাহানী (আবুল মামুন) … ৩৩
ইস্মাইলিয়া, ইস্মাইলিয়াবাদ … ৪২ ও পর পর পৃষ্ঠা, ৯২
ইয়ায্ (কাযী) … ৫৬

ও

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ … ৭৭
ওয়াসিল ইব্নে আ'তা … ৩৬, ৫৯
ওয়াহিদ মাহ্‌মুদ … ৮৯, ৯০, ১৪২
ওয়েবার … ১২৭

ক

কপিল ··· ক, ৯, ১২২
কা'ণ্ট্ ··· ক, ৫৩, ১১৫, ১২১
কান্তি বিজ্ঞান ··· ১৫৭
কিউমর্সিয়া ··· ৪
কুত্বুদ্দীন ··· ৫০
কুণ্ডলিনী ··· ৮৩
ক্রেমার (ফন্) ··· ৭৪, ৮৪
কোঁতে ··· ৪২
ক্বদ্রিয়াহ্ ··· ৬০
'ক্বল্ব্' ··· ১২৩
ক্লড্ ··· ৮৭
কামরান ··· ১২৯

খ

'খল্ক্' ··· ৪৬
খুদী (অহং) ··· ১৩২
খৈয়াম (ওমর) ·· ৮৯
খোরাসানের মুখোসধারী পয়গম্বর···৭৬
খৃষ্ট (যিশু, ঈসা আলয়হিস্ সালাম)
··· ৩৮, ১২২

গ

গাইগার ··· ২, ১২৭
গ্যালিয়েনুস (সম্রাট) ··· ১৫২
গ্ল্যাডিশ্ ··· ১৩
গ্রীকদর্শন, গ্রীক দ্বিত্ববাদ ··· ৫৯, ১৪১
গ্রীন ··· ১৩, ১৪
'গ্নোষ্টিক্' ··· ১৭

জ

জামী (কবি) ··· ১৩৩
জেকোবী ··· ৪২, ৭৭
জোসেফ আল্ বশীর ··· ৩৭
জ্যাক্সন ··· ১২
জ্যাম্লিকাস্ ··· ১৫৮
জুষ্টিনিয়ান (সম্রাট) ··· ১১, ১৫৮

ট

টমাস্ এ্যাকুইনাস্ ··· ১৭

ড

ডায়োজিনিস্ ··· ১১
ডিঙ্গ্ আন্ সিচ্ ··· ৪৩, ১১৫, ১১৬
ডিমোক্রিটাস্ ··· ১৫৫
ডেকার্ট্স্ ··· ৫৪, ৬২
ডোযী ··· ৭৪

ত

তাই কেইহ্ ··· ১৭
তূসী ··· ৫০

থ

থেলিস্ ··· ২

দ

দস্তুর ইস্পাহানী ··· ১২১
দ্য গোবিনো ···১ ২৯

দ্ব মেইস্তার ··· ৪৩
দ্রুজ্ অহরিমন ··· ৩, ৪, ৪৭
দ্বিত্ববাদ ··· ৯১, ১১০

ন

নকশ্বন্দী সম্প্রদায় ··· ৮৩
নসফী ··· ৮৬, ৮৭. ১১০
নায্যাম ··· ৩৮, ৪০, ৫৯, ৯১
নিও প্লেটনিস্ম্ ...প্রঃ কঃ, খ, ১১, ১৮, ১৯, ২৫, ৩৩, ৩৪, ৭৮, ৭৯, ৮৫ ও পর পর পৃষ্ঠা, ১০৯, ১৩০, ১৩১, ১৪২, ১৫১ ও পর পর পৃষ্ঠা
নিকল্সন ··· ৭৫
নির্গমনবাদ ··· ৮৫
নির্বান ··· ৭, ৮১

প

পবিত্র চিৎবৃত্তি ··· ১৫১
পরিপূর্ণ মানব ··· ১২৩, ১২৪
পার্ফাইরী অভ্ টায়র ··· ১৫২, ১৫৮
পিথাগোরাস্   ১৩, ৪৩
'পীদ-ই-বযর্গী' ··· ৯
পীরো ··· ৭৯
পোপ ··· ৪৩, ৪৫
প্রকাশমান ব্রহ্মা ··· ১২৮
প্রজাপতি ··· ১২৮
প্রথম সংঘশক্তি ··· ১২৯
'প্রাইমা ম্যাটেরিয়া' ··· ১৪২
প্লটিনাস্ ··· ২০, ৭৮, ৭৯, ১৩১, ১৫১ ও পর পর পৃষ্ঠা

ফ

'ফনা' ··· ৮১
ফয্ল্ ·· ৩৮
ফাতেমীয় খিলাফত্ ··· ৪৩
ফিক্‌টে ·· ৪২, ১১৪
ফেরেশ্তা ··· ৯৬, ১০৬
ফ্ল্যাকাস্ ··· ৭৮

ব

বর্জার ··· ৫৫
বদরায়ন ··· ১২৮
বল্খী (ইব্রাহিম আদ্হম) ··· ৮৪
বল্খী (শকীক) ··· ৮৪
বা'কিলানী ··· ৫১
বার্ক্লী ··· ৫২, ৫৩, ১০৬, ১১৪
বার্থোলোমিউ (সেইন্ট্) ··· ৪৫
বার্দেসানেস্ ··· ১৭
বাবক্ (মযদকীয় নেতা) ··· ৭৬
বা'ব (মির্যা আলী মুহম্মদ, শিরাযী), বা'বীয়বাদ ও সম্প্রদায় ··· ৪৯, ১৩০, ১৩৭ ও পর পর পৃষ্ঠা
বাহ্মন ইয়ার ··· ৩৩
বাহাউল্লাহ্ ও বাহায়ী মতবাদ ··· খ, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০
বিধাতা মানব ··· ১২৩

বিভান ··· ১৬,
বিশর ইব্‌নুল্‌ মু'তামির ··· ৩৯
বিশ্বআত্মা ও প্রকৃতি ··· ১৫৪
বিস্তামী (বায়েযিদ) ·· ৮৬
বুখারী (মুহম্মদ ইব্‌নে মুবারক) ··· ৬১
বুদ্ধ ··· খ, ১৪০
বুশ্‌শার ইব্‌নে বুর্‌দ্‌ ··· ৭৬
বেদান্ত ··· ৯, ৭৪, ৮০ ও পর পর পৃষ্ঠা, ১১৮, ১২৩, ১৩৮
বেশান্ত (অ্যানি) ··· ১৫
বোসাঙ্কেট্‌ ··· ৯৪
বোয়ের (ডঃ) ··· ৩৪
ব্রাউন ··· ৬০, ৭৫
ব্রাড্‌লী ··· ১৩, ১৪

ভ

ভ'গ্যান্‌ ··· ১২৬

ম

মন্‌সুর (হাল্লাজ্‌) ··· ৮৬
মযদক ··· ৭, ১০, ১১
মরিয়ম ··· ৪৮
মার্ক্‌স্‌ (Merx) ··· ৭৫
মাজ্‌দজিলী ··· ৯২
মা'তুরিদী (আবুল মন্‌সুর), মা'তুরিদিয়াহ্‌ ··· ৫০
মানী, মানীয়বাদ ··· ৭ ও পর পর পৃষ্ঠা, ১৬, ৩৬, ৪৩, ৪৭, ৫৯, ১১০, ১৪১
মামুন (আর্‌ রশীদ) ··· ৭৬, ৭৭
মাক্বফ কর্‌খী ··· ৮৫
মালেকী মযহাব ··· ৭৭
মা'সুমী ··· ৩৩
মায়া, মায়াবাদ ··· ৯
ম্যাক্‌ট্যাগার্ট (ডঃ) ·· ১৩৯
ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ ··· ৪৪
ম্যাজী, ম্যাজিবাদ, ম্যাজীয় দ্বিত্ববাদ ··· ২, ৩, ৪, ১৪১
মিথ্‌ ··· ৬
মিল্‌ (ল'রেন্স্‌) ··· ১৩
মুআত্তর ... ৩৭
মু'তাযিলা, মু'তাযিলাবাদ ··· ৩৬ ও পর্‌পর পৃষ্ঠা, ৪৮ ও পর পর পৃষ্ঠা, ৫৩, ৫৬, ৫৯ ৬৪, ৭৭, ১৩৭
মুনীর ··· ১২৯
মোক্ষ ··· ৭ ৮
মোল্লা সদ্‌রা শিরাযী ··· ১২৯, ১৩০, ১৩৭ ও পর পর পৃষ্ঠা
মোল্লা হাদী সব্‌য্‌ওয়ারী ··· ১৩০ ও পর পর পৃষ্ঠা

য

'যওক' ··· ৯০, ১০৬
যর্‌ওয়ানী, যর্‌ওয়ানিয়াহ্‌ ··· ৪, ১০
যিন্দিক ··· ৩, ৪, ৭৬
যুন্নূন ··· ৪২

যোগ ··· ১৫
যোরো'ষ্টার (যরথুস্ত্র) ১ ও পর পর পৃষ্ঠা, ৩৩, ৪৬, ৪৭, ৮৫, ১৩০, ১৪১, ১৪২

র

রাবেয়া (বসরী) ··· ৮৪
রামানুজ ··· ১২৮
রূমী (জালালুদ্দীন, মওলানা) ··· প্রঃ কঃ, ৮০, ৮৬, ৮৭

ল

লক্ ··· ৬৯
লাইব্‌নিয্ ··· ৯, ৯০, ১০৮
লা'সাল ··· ১৩
ল্যামোনেইস্ ··· ৭৬
ল্যাসেন ··· ১২৭
ল্যুইস্ ··· ১৩০
লোট্‌যে ··· ৫৩, ৫৫, ৬২

শ

শপেন্‌হাওয়ার ··· খ, ৪, ৫, ৯, ১২১, ১৪০
শঙ্কর ··· ১২৮
শয়্‌খ্ আহ্‌মদ ··· ১৩৮
শয়্‌খীপন্থী শিয়াহ্‌বাদ ··· ১৩৭, ১৩৮
শাফেয়ী ময্‌হাব ··· ৭৭
শাহারিস্তানী ··· ৪, ৪৭, ৫৪
'শিদ্-ও-তার' ··· ১০
শিব্‌লী (মওলানা) ··· ২৬, ৩৪, ৫৬
শিয়াহ্, শিয়াবাদ ··· ৩৪, ৬০
শূয়্‌বিয়াহ্, বাদানুবাদ ··· ৭৬
শ্লেগেল ··· ৪৩
শ্লেয়ারমেকার — ৪২, ৭৭, ১১৭

স

সল্‌জার — ৫৫
সলন — ২
সর্বেশ্বরবাদ — ১১, ৩৮, ৪২, ৫৫, ৭৬, ৮৫ ৮৬, ১০৯, ১১০, ১২০
সংশয়বাদ — ৪১, ৪২, ৪৭, ৫৪, ৭৭, ৭৯, ৯২, ১০৭
সাইয়িদ শরীফ (মীর) — ৮৫
সামানীয় — ১১
সারাখ্‌সী — ২১
সালাহুদ্দীন (সুলতান) — ৯২, ৯৩
সায়রাফী (আবু সঈদ) — ৯১
সিন্দবাহ্ — ৭৬
সিম্‌প্লিসিয়াস্ — ১১
স্পিটা — ৩৬, ৪৯
স্পিনোযা — ৯০
সূফীবাদ (মরমীয়াবাদ) — ১৪, ১৫, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৭, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৭৪ ও পর পর পৃষ্ঠা, ১০৯, ১১০, ১২৯ ও পর পর পৃষ্ঠা ১৪১, ১৪২
সেক্সটাস্ এম্‌পিরিকাস্ - ৭৯
সৈয়দ আহমদ (স্যর্)—৬৩
সেমিতীয় দর্শন—খ
সোর্‌লী - ১৩

স্যালোমিনা (সম্রাজ্ঞী)—১৫২
স্টোয়ী, স্টোয়ীয়বাদ—৭৯

হ

'হরকত'—৮৩
হাউগ - ৩
হাজ্জী কাযিম—১৩৮
হানাফী ফিক্কাহ্—১২৯
হানাফী মযহাব—৭৭
হাফিয (কবি)—৯০
হাম্বলী মযহাব - ৭৭
হার্বার্ট—৯০
হার্নাক—১৬
হারুন (আর্ রশীদ)—৭৬
হাসান আল্ বসরী—৩৬
হ্যামিল্টন ৬৭
হিউম—৫৪
হীর বূদ—১২৯
হুইট্যাকার—৯, ১২৬
হুরুফী—৪৭, ৪৮
হুসায়নী (মুল্লাহ্ মুহম্মদ হাশিম) ৬৬,৬৭
হেগেল্—খ, ৮, ৮৭, ১১৩, ১১৫, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১৪২
হেতুবাদ—৭১
হেরক্লিটাস—১৩

য়

'য়িন্ ও ইয়াং'—১৭

জ্ঞ

জ্ঞানতত্ত্ব—৫১, ৫২, ৬৯, ৯৮
জ্ঞানবাদ (খৃষ্টীয়)—৮০

LIBRARY
Book No 852

00000852